কম্পোজিট হেরিটেজ (বিমিশ্র ঐতিহ্য)

(শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা চর্চার সহায়ক উপকরণ)

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (হ্যান্ডবুক)

(প্রশিক্ষণ সহায়ক এবং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারের জন্য)

ইন্‌স্টিটিউট ফর সোস্যাল ডেমোক্রেসী (আইএসডি)

কম্পোজিট হেরিটেজ (বিমিশ্র ঐতিহ্য)

(শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা চর্চার সহায়ক উপকরণ)

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (হ্যান্ডবুক)

(প্রশিক্ষণ সহায়ক এবং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারের জন্য)

খুরশীদ আনোয়ার

কম্পোজিট হেরিটেজ (বিমিশ্র ঐতিহ্য)

(শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা চর্চার সহায়ক উপকরণ)
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (হ্যান্ডবুক)

(প্রশিক্ষণ সহায়ক এবং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারের জন্য)

লেখক ঃ
খুরশীদ আনোয়ার

সম্পাদনা ও প্রকাশ ঃ
শ্রুতি চতুর্ভেদী, উৎপলা সুকলা, নিলাম রাওয়াত, ববিতা নেগী, চঞ্চল গাড়িয়া, সুরেন্দ্র রাওয়াত ও গৌতম গোপ।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (হ্যান্ডবুক) পূণঃ পর্যালোচনা কমিটি ঃ
উৎপলা সুকলা, সুরেন্দ্র রাওয়াত ও গৌতম গোপ।

অনুবাদক ঃ
ড: আর. কে. সারিন ও ববিতা নেগী।

খুরশীদ আনোয়ার
আইএসডি।

প্রথম সংস্করণ : ২০০৭ খ্রীস্টাব্দ।
পূণঃ সংস্করণ : ২০১৯ খ্রীস্টাব্দ।

প্রকাশক ঃ
ইন্‌স্টিটিউট ফর সোস্যাল ডেমোক্রেসী (আইএসডি)
ফ্ল্যাট নম্বর- ১১০, নামবেরদার হাউজ,
৬২-এ, লক্ষ্মী মার্কেট, মুনিরকা, নয়া দিল্লী- ১১০০৬৭, ইন্ডিয়া।
ফোন: ০৯১-১১-২৬৭৭৯০৪, ফ্যাক্স : ০৯১-১১-২৬৭৭৯০৪
ইমেইল- notowar.isd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.isd.net.in

প্রচ্ছদ নক্‌শা ও শোভাবর্ধন:
সুরেন্দ্র রাওয়াত ও গৌতম গোপ।

বাংলায় অনুবাদ:
কালীপদ সরকার, মং সানু চৌধুরী, ড: হ্যারল্ড সৌগত বাড়ই, হ্নিওলা মং, শফিকুল ইসলাম ও মনিকা মান্নান।

কৃতজ্ঞতা ঃ
- এ্যাঞ্জেলা কোনিং, ডঃ রিচার্ড দেবদাস, ড: উল্‌ফগ্যাং হেইনরিচ, এডা কিরলিস, ফয়সাল অনুরাগ, হাগেন বার্নডিট, কল্যানী মেনন সেন, মুহাম্মদ আজাহার, পি.কে বসন্ত, শলিল মিশ্র।
- ব্রেড ফর দ্যা ওয়ার্লড- প্রোটেস্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (ফিডেরাল রিপাবলিক অফ জার্মানী)।

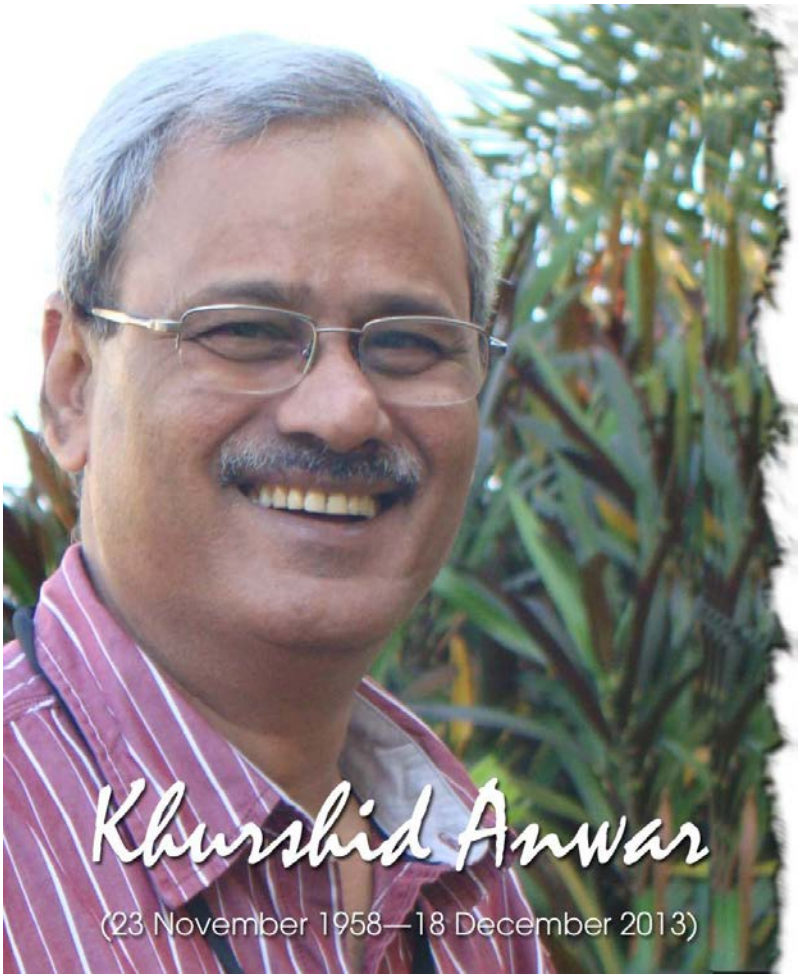

‘‘কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ’তে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।”
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১.	• প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রসঙ্গে	৭
২.	• ভূমিকা	৯
৩.	• সুপ্রিয় বন্ধুগণ	১০
৪.	• পাঠ্য উপকরণ ১- সমন্বয়বাদ ও বহুত্ব বা বহুজাতীয়তা (Syncretism and Plurality)	১১
৫.	পরিশিষ্ট- ১ অনুশীলন ও সহায়কদের জন্য নোট	১৩
৬.	অনুশীলন ১- প্রথম ধাপ: উদ্বোধন ও প্রারম্ভিক আলোচনা	১৪
৭.	অনুশীলন ১- দ্বিতীয় ধাপ: অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক পরিচিতি	১৫
৮.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা	১৬
৯.	অনুশীলন- ২ : "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে চিন্তাশীল মতবাদ বা ধারণা	১৮
১০.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা:	১৯
১১.	o পাঠ্য উপকরণ ১: "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" কি? কীভাবে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" তৈরী হয়?	২০
১২.	**অনুশীলন- ৩: "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যের"** গঠন	২৩
১৩.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা:	২৪
১৪.	o পাঠ্য উপকরণ ১ : মধ্যযুগ পূর্ব সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য (Sycretic Traditions Prior to Medieval Times)	২৫
১৫.	o পাঠ্য উপকরণ -২ মধ্যযুগের দক্ষিণ এশিয়ায় সমন্বয়বাদী পরম্পরা বা ঐতিহ্য	২৮
১৬.	**অনুশীলন - ৪ : বিভিন্ন ধরনের "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যের" অনুসন্ধান (সৃজনশীল কাজ)**	৩৪
১৭.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা:	৩৫
১৮.	o পাঠ্য উপকরণ ১: মেলা ও উৎসবসমূহ	৩৬
১৯.	o পাঠ্য উপকরণ ২: বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালা	৪৩
২০.	o পাঠ্য উপকরণ ৩: লোকচিত্র প্রথা	৪৫
২১.	o পাঠ্য উপকরণ ৪: লোক সঙ্গীত বা গীতবাদ্য	৪৭
২২.	o পাঠ্য উপকরণ ৫: কণ্ঠ সঙ্গীত	৪৯
২৩.	o পাঠ্য উপকরণ ৭: সিনেমা	৫৩
২৪.	**অনুশীলন- ৫: দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রেক্ষাপট**	৫৬
২৫.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা:	৫৭
২৬.	**অনুশীলন- ৬: "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যের" নেতীবাচক ভূমিকা।**	৫৯
২৭.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা:	৬০
২৮.	o পাঠ্য উপকরণ: ১ রাজকিশোর আমার প্রিয় বন্ধু	৬১
২৯.	o পাঠ্য উপকরণ: ২ অতিথি	৬৩
৩০.	o পাঠ্য উপকরণ: ৩ ঠাকুরের কূপ	৬৯
৩১.	o পাঠ্য উপকরণ: ৪ সদগতি	৭১
৩২.	**অনুশীলন- ৭ : আমি ও আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব।**	৭৭
৩৩.	• গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার (রিফ্লেকশন) জন্য গাইড লাইন	৭৮
৩৪.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা	৮৭
৩৫.	**অনুশীলন ৮: "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যের" কার্যকারিতা।**	৮৩
৩৬.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা:	৮৪
৩৭.	• উদাহরণ:	৮৫
৩৮.	**অনুশীলন- ৯ : "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যের" ঝুঁকি বা অভিঘাতসমূহ।**	৮৮
৩৯.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা:	৮৯

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা
৪০.	o পাঠ্য উপকরণ: ১: বাংলাদেশে বিশ্বায়নের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাতসমূহ: "পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ" ।	৯১
৪১.	o পাঠ্য উপকরণ: ২ : চাকরীর বুনিয়াদ ভঙ্গ	৯৩
৪২.	o পাঠ্য উপকরণ: ৩ : কোথা থেকে জুতা আনা হয়?	৯৬
৪৩.	o পাঠ্য উপকরণ: ৪ : রাবণ রামায়ণ আবৃতি করেন	৯৮
৪৪.	o পাঠ্য উপকরণ: ৫ : জল একটা বড় চ্যালেঞ্জ।	১০০
৪৫.	o পাঠ্য উপকরণ: ৬ : তৃতীয় বিশ্বের চলমান আধুনিকিকরণ প্রক্রিয়া এবং একটি গণমুখী বিকল্প উন্নয়ন ভাবনা	১০২
৪৬.	o পাঠ্য উপকরণ: ৭ : শান্তি□ বিঘ্নিত হওয়ার পেছনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ পলাশী যুদ্ধের পর।	১০৬
৪৭.	o পাঠ্য উপকরণ: ৮ : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস	১০৮
৪৮.	**অনুশীলন- ১০: "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" এর ব্যবহার কৌশল**	১১১
৪৯.	• সহায়কদের জন্য নোট বা দিক নির্দেশনা	১১৬
৫০.	**পরিশিষ্ট- ২ এক নজরে কিছু দৃশ্যপট**	১১৯
৫১.	• এক নজরে কিছু দৃশ্যপট	
৫২.	**পরিশিষ্ট- ৩**	১২৮
৫৩.	• সংযোজিত বিষয়	
৫৪.	o পাঠ্য উপকরণ ১ : দ্রাবীড়ীয় সংমিশ্রিত উত্তরাধিকার।	১২৯
৫৫.	o পাঠ্য উপকরণ ২ : ফাটল ধরা অঞ্চলে বিমিশ্র ঐতিহ্য	১৩৩
৫৬.	o পাঠ্য উপকরণ ৩ : একটি উপমহাদেশীয় ইতিহাস রচনার পথে	১৩৬
৫৭.	দ্যা ইন্‌স্টিটিউট ফর সোস্যাল ডেমোক্রেসী (আইএসডি)	১৩৯

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রসঙ্গে

সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া প্রথাগতভাবে নানা ধরণের সহিংস দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে পরিপূর্ণ একটি অঞ্চল। কেউ এমন কোন দ্বন্দ্ব সংঘাতের ধরণ খুঁজে পাবে না, যা এই অঞ্চলে নেই। কিন্তু খুবই উদ্বেগজনক যে, দক্ষিণ এশিয়ার কোন অংশেই জনগণের সার্বজনীন টেকসই কোন আন্দোলনের ক্ষেত্র এবং ঐক্য তৈরী হয়নি। আমাদের হয়তো কিছু আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রয়েছে, তবে তা মূলতঃ যুদ্ধ বিরোধী, নিউক্লিয়ার বিরোধী এবং যে কোন ধরণের অস্ত্রের বিপেক্ষে। কিন্তু সমাজের সাম্প্রদায়িকতামূলক সংঘাত, শ্রেণী বৈষম্যের কারণে দ্বন্দ্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে আমরা কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াশীলভাবে সাড়া দেই। এর ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রচারাভিযান তা খুবই নগণ্য। সময়ের পথপরিক্রমায় ধর্মীয় মৌলবাদ এবং কট্টরপন্থীরা সমাজে তাদের কালোথাবা বিস্তার করে চলেছে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলে সামাজিক সহিংস দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেই আছে। সমাজকে এরূপ সংঘাতপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত করে সক্রিয় করে তোলার এখনই সময়। সমাজের সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এবং জঘন্ন দ্বন্দ্ব সংঘাত নির্মূল করার জন্য আন্দোলনের রাজপথ আমাদের। সকল প্রকার দ্বন্দ্ব সংঘাতের অগ্নিশিখা যদি আমরা নিস্প্রভ করতে পারি তবে সাম্প্রদায়িকাতার কালো ক্ষেত্রগুলোও ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য। অন্যদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের কর্মসূচিসমূহ অন্যদের দ্বারা স্বীকৃত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। আমরা জনগণের সার্বজনীন টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন এবং প্রচারাভিযানের উদ্যোগ খুবই কম গ্রহন করি। কিন্তু সর্বপরি আমরা যদি শান্তির সপক্ষে এমন কোন আন্দোলনের সূচনা করতে পারি যা আত্মপ্রত্যয়ী ও নিবেদিত সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে মেধাভিত্তিক বিতর্কঝড় ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়।

বাস্তবিকপক্ষে আমাদের প্রথমে দরকার শোষণ ও বৈষম্যের বিরূদ্ধে সেইসব জনগণকে সচেতন এবং শিক্ষিত করা যারা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সচেতন ও আত্মপ্রত্যয়ী নয়। তাদেরকেও সচেতন করতে হবে, যারা সমাজে দুর্বল এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাস করছে এবং যারা দ্বন্দ্ব সংঘাতকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদেরও আরও শিক্ষিত এবং সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরও সক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে যারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সার্বজনীন ধ্যান-ধারণা এবং শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা চর্চার বাহক হয়ে তাদের সময় ও শক্তি ব্যায় করছে। বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ও পদ্ধতি দিয়ে তাদের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তারা তাদের কাজকে ফলপ্রসূভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মেরী বি. আন্ডারসন তার সর্বজনবিদিত "ডু নো হার্ম" কর্মযজ্ঞে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক সমাজেই শান্তির জন্য স্থানীয় সক্ষমতা সন্নিবেশিত রয়েছে। তিনি এদের পাঁচটি শেণীতে ভাগ করে নাম দিয়েছেন ১. নিয়ম-নীতি, ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, ২. মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজ, ৩. সাধারণ মূল্যবোধ এবং সুযোগ সুবিধাসমূহ, ৪. সকলের জন্য সাধারণ ও অংশীদারিত্বমূলক অভিজ্ঞতাসমূহ এবং ৫. সার্বজনীন প্রতীক, সংকেত ও উৎসবসমূহ। এগুলোকে তিনি সমাজে শান্তির সপক্ষে সংযোগকারী উৎপাদক (কানেক্টর) হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি যুদ্ধ বা অশান্তির জন্য দায়ী সক্ষমতাসমূহকেও পাঁচটি শেণীতে বিভক্ত করেছেন, যা সমাজে বিভেদকারী (ডিভাইডার) হিসেবে ভূমিকা পালন করে। যথা- ১. বৈষম্যমূলক নিয়ম-নীতি, ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, ২. নেতিবাচক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজ, ৩. বৈষম্যমূলক মূল্যবোধ এবং সুযোগ সুবিধাসমূহ, ৪. বিভিন্ন এবং পক্ষপাতমূলক অভিজ্ঞতাসমূহ এবং ৫. সার্বজনীন নয় এমন প্রতীক, সংকেত ও উৎসবসমূহ।

মেরী বি. আন্ডারসন সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সংযোগকারী উৎপাদকসমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং বিভেদকারী উৎপাদকসমূহকে সংকোচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা সহজেই সমাজে শান্তির জন্য সংযোগকারী উৎপাদকসমূহের (কানেক্টর) নানারকম ধরণ চিহ্নিত করতে পারি, যেগুলোকে "কম্পোজিট হেরিটেজ" চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সম্প্রীতির উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা চর্চায় অনেকেই ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন উপকরণ বা টুলস্ এবং তাদের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছেন। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বা হ্যান্ড বুকটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সম্প্রীতির উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা চর্চায় জনগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন ও তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ সাধনে যথোপযুক্ত উপকরণ বা টুলস্ এবং প্রক্রিয়া পদ্ধতি সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বা হ্যান্ড বুকটি মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রশিক্ষণের সেসন পরিচালনার অনুশীলন এবং প্রশিক্ষক বা সহায়কদের ফলপ্রসূভাবে সেসন পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই অংশে প্রত্যেকটি সেসন অনুশীলনের উদ্দেশ্যসমূহ, বিভিন্ন ধাপ, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং সেসন পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সময় বিভাজন সন্নিবেশিত হয়েছে। সেসনসমূহের বিভিন্ন অনুশীলনে সহায়কগণ/ প্রশিক্ষকগণ কি করবেন এবং কি করতে পারবেন না তারও দিকনির্দেশনা পরিষ্কারভাবে দেয়া হয়েছে। সেসন পরিচালনার জন্য এতে যথেষ্ট পরিমান উদাহরনেরও যোগান দেয়া হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বা হ্যান্ড বুকটির দ্বিতীয় ভাগে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" চিন্তাধারার নানাবিধ ধরণ এবং এর অন্তর্নিহিত মতবাদের উপর পাঠ্য উপকরণ, সাহিত্য রচনা ইত্যাদি দেয়া হয়েছে। এই পাঠ্য উপকরণগুলি প্রশিক্ষণ সহায়ক এবং অংশগ্রহণকারীদেও প্রভূত উপকারে আসবে বলে আমরা মনে করি। এখানে কিছু পাঠ্য উপকরণ বা আর্টিকেল রয়েছে, যা প্রশিক্ষণের সেসনসমূহ অনুশীলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পকৃত। এগুলো প্রশিক্ষণ সহায়কগণ "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" বিষয়ে প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার সেসন পরিচালনার পূর্বে পাঠ করলে বেশ উপকৃত হবেন। উপকরণগুলোর কিছু সেসন পরিচালনার শেষে ফটোকপি করে অতিরিক্ত যোগান হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের দেয়া যেতে পারে। বাকী পাঠ্য উপকরণগুলো অংশগ্রহণকারীদের কর্মশালা বা প্রশিক্ষণ শেষে বিতরণ করা যেতে পারে। কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা যদি সব পাঠ্য উপকরণ প্রত্যেক সেসনের পরেই পেতে চায় তবে তা "আত্ম উপলব্ধি" নামক সেসনের পরে বিতরণ করলে ভাল।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বা হ্যান্ড বুকটির শেষ ভাগে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু অতিরিক্ত বা ঐচ্ছিক অনুশীলন রয়েছে যা অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা অনুসারে তাদের ধারণা আরও পরিচ্ছন্ন করার জন্য অনুশীলন করা যেতে পারে। যদিও এটি নির্ভর করবে কর্মশালা বা প্রশিক্ষনের সময়সূচি বিণ্যাশের পর্যাপ্ততার উপর। সাধারণতঃ "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" বিষয়ে কর্মশালার সময়সীমা হবে ছয়টি পূর্ণ দিবস।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বা হ্যান্ড বুকটি ব্যবহারের পূর্বে প্রশিক্ষণ সহায়ক বা প্রশিক্ষকদের প্রতি শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সম্প্রীতির উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা চর্চার উপর "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রইলো।

খুরশীদ আনোয়ার
নয়া দিল্লী
এপ্রিল ২০০৭।

ভূমিকা

১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারত ও ভারতে বিভিন্ন ধরনের সমাজকর্মের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় ঘটেছিল, তখন সক্রিয়কর্মীদের (activists) প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর এবং সমাজ পরিবর্তনের উন্নয়নে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা শেখার বা জানার যে পরিসর তৈরি করছেন তার উপর উচ্চ গুরুত্বারোপের বিষয়টি আমার মনে রেখাপাত করেছিল। সম্ভবত সমন্বিত ঐতিহ্যের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা ও সমাজবিজ্ঞানে এটাকে নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হওয়ার পূর্বেই দক্ষিণ এশিয়ার সক্রিয়কর্মীরা সমাজ বিশ্লেষণের যে কাজটি আন্তঃসম্প্রদায়গত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুরু করেছিলেন সেটার মূল, যে ঐতিহাসিক বাস্তবতা দক্ষিণ এশিয়ার ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও উপনিবেশ-উত্তর অসমাপ্ত জাতি নির্মাণ পরিকল্পনার রূপ দিয়েছে, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সম্প্রদায়গুলো যে পরস্পর থেকে ভিন্ন সেটা ধর্মীয়, লিঙ্গীয়, জাতিভেদ সম্পর্কিত জাতিতাত্ত্বিক পরিচিতিইনির্ধারণ করে দিয়েছে। এই সম্প্রদায়গুলোর সম্পদেভাগ বসাতে, এদের জনগণ, শ্রম ও বাজারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেও প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক কাঠামোর সুযোগ নিয়ে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় থাকতে রাজনীতি ও অর্থনীতির স্বার্থান্বেষী মহল ক্রমাগতভাবে এই পরিচিতিকে ব্যবহার করেছে।

পরিচিতি ও রাজনীতির মুখোমুখি হওয়াটা দক্ষিণ এশিয়ায় তাই নতুন কিছু নয়। তবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের আলোচনা বা বিতর্কই সাম্প্রতিককালে এটার রূপ বা আদলকে নির্ধারণ করে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণেসারা পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক পুঁজির যে ক্রমবর্ধিত ক্ষমতা তা এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও দৃশ্যমান পরিবর্তন নিয়ে আসে। মুনাফা অর্জন করা ও এই মুনাফাকে মুষ্ঠিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রিভূত করার কাজটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিতে ও তাদেরকে বিভাজিত করতে তাদের ক্ষতিসাধন প্রয়োজন।দেখা যায় যে, জনগণের পরিচিতিকে ব্যবহার করে 'ভাগ করা ও শাসন করা'র কাজটি চালিয়ে নিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য যে যুদ্ধতা এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জগতের প্রতীক।

একদলকে ছেড়ে অন্য দলের সঙ্গে নিশ্চিভাবেই একাত্মবোধ অনুভব করা এই ধারার বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় ও জাতিতাত্বিকভাবে পরিচ্ছন্ন বা পবিত্র একটি জাতিরাষ্ট্রের অলীক স্বপ্নকে তুষ্ট করতে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে।যে জটিল এবং প্রায়ক্ষেত্রেই যে সমন্বয়বাদী ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিশ্বাসের ব্যাপক বিস্তৃতি দক্ষিণ এশিয়ায় রয়েছে, সেগুলো আসলে ক্ষমতার খেলা থেকে মুক্ত বা নিরাপদ রয়েছে ঃ এই ক্ষমতার খেলা হয় খুবই স্থানীয় এবং এর আওতা খুবই সীমিত কিংবা এগুলো পরিচিতির সীমারেখাকে অস্পষ্ট করেছে বা তাকে ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং, এগুলো 'ভাগ কর ও শাসন কর'-এর মতো রাজনৈতিক পরিকল্পনার জন্য উপযোগী নয়। বরং শান্তি ও রাজনৈতিক বোঝাপড়া সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এগুলোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে যারা হেরে গেছে তাদের আবেগকে ব্যবহার করে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এক্টরদের বিরুদ্ধে তাদেরকে না দাঁড় করিয়েবরং অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহিংস অবস্থানে রেখে তাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে কেবলমাত্র খন্ডতাবাদীর (reductionist) ব্যবহৃত ''অন্যদের" বিপরীতে ''আমাদের" এই ধারণা সাহায্য করছে।

এই ম্যানুয়ালে যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে, তা সমাজকে খন্ডিত করার পরিবর্তে সমন্বিত ঐতিহ্যের উপরেই বেশি মনোনিবেশ করেছে। নির্ধারিত পরিচিতির আওতার বাইরে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণকে কী ভাবে একত্রিত করা যায় তা অনুসন্ধানের কাজটি ISD বেছে নিয়েছে। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অনুষ্ঠিত বেশ কিছু কর্মশালায় প্রাপ্ত জ্ঞানগর্ভ চিন্তাভাবনা এই ম্যানুয়ালে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই অঞ্চলে মানুষদের প্রতিদিন কাছাকাছি আসার ফলে নিজেদের পরিচিতির গন্ডি অতিক্রম করে যে সব লোকজঐতিহ্য, ভাষা, কবিতা, থিয়েটার, নৃত্য, উৎসব, কৃষিকর্ম, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির মতো সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে এই কর্মশালার মাধ্যমে সেগুলোরই উদ্ঘাটন হচ্ছে।

সমন্বিত ঐতিহ্য শক্তিশালী হওয়ার ফলে তা সংঘাতের সংবেদনশীল বিশ্লেষণ ও তার কাজে অবদান রাখছে কারণ এটি যা কিছু বিভাজন সৃষ্টি করছে তার চাইতেও যা কিছু সংযোগকারী তার উপর গুরুত্বারোপ করে সহিংসতা ও সংঘাতকে প্রশমিত করে।

নতুন এই ম্যানুয়ালটি অন্তর্ভূক্তিমূলক, বহুত্ববাদী ও সমবেত দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া বহির্ভূত অঞ্চলকে নিয়ে উৎসব উদযাপন করা ও তাকে শক্তিশালী করার কাজকে সামনের দিকে অগ্রসরমান করে চলেছে। সমন্বিত বোঝাপরার কাজটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুরু হয়ে পরবর্তীতে জনগণের কাছে স্থানান্তরিত হয়। ক্ষমতার খেলার বলি না হয়ে কোনও ব্যক্তির পক্ষে নিজের পরিচিতির উপর গভীর মনোনিবেশ করাটাই সম্ভবত সমাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। এই ম্যানুয়ালটি আমাদের এই অভিযাত্রায় সাহায্য করবে। আসুন আমরা দক্ষিণ এশিয়ার সমন্বিত ঐতিহ্যকে নিয়ে উৎসব উদযাপনসহ আমাদের জীবনকে উপভোগ করতে থাকি।

এডা কার্লিস
ব্রেড ফর দি ওয়ার্ল্ড
বার্লিন, ৯.৮.২০১৯

সুপ্রিয় বন্ধুগণ,

এই হান্ডবুক বা ম্যানুয়ালটি গত ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তখন থেকে দীর্ঘ এই সময়কালে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" প্রশিক্ষণের ধরণে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং এর বিভিন্ন প্রায়গিক দিক সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে শান্তি, সামাজিক সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা চর্চার কাজ ভারতের উত্তর অংশে হিন্দি ভাষা-ভাষি অঞ্চলে শুরু করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই উদ্যোগ দক্ষিণ ভারত, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। একই সময়ে এই প্রক্রিয়া ও উদ্যোগকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য আলাদাভাবে দল গঠন করে তাদের "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" বিষয়ে সক্ষমতার বিকাশ সাধন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" বিষয়ে প্রশিক্ষণ/কর্মশালাসমূহ গ্রাম, শহরের পশ্চাৎপদ অঞ্চল, স্কুল এবং কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর তখন থেকেই "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" বিষয়ক প্রশিক্ষণটি সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশিক্ষকদের কাজের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল ডেমোক্রেসী (আইএসডি)" এর কর্মীগণ তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং মাঠপর্যায়ের প্রশিক্ষকদের ফিড-ব্যাকের উপর ভিত্তি করে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এর প্রথম প্রকাশিত ম্যানুয়ালটির মৌলিক ধারণা বা মতবাদ অক্ষুন্ন রেখে এর ভিতরের কিছু অংশে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এর মূল হ্যান্ডবুক/ম্যানুয়ালটি তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল।এই তিনটি অংশ সম্মুন্নত রেখে এর ভিতরে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ম্যানুয়ালটির প্রথম অংশে সেশন অনুশীলন ও সহায়কদের দিক নির্দেশনার সাথে বেশ কিছু পাঠ্য উপকরণ এবং অন্যান্য সহায়ক উপকরণ সংযোজন করা হয়েছে। সহায়কগণ সেশন পরিচালনার সময় সময়ের পর্যাপ্ততা, সুযোগ এবং অংশগ্রহণকারী দলের প্রয়োজনের ভিত্তিতে উপকরণগুলো ব্যাবহার করতে পারেন।

ম্যানুয়ালটির দ্বিতীয় অংশে সার্বজনীন উৎসবসমূহ, সকলের পছন্দনীয় পোশাক-আশাক, বয়নশিল্প, স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ এবং মানুষের কিছু জীবনযাত্রার ধরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দেয়া হয়েছে, যা সহায়কদের প্রশিক্ষণ পরিচালনায় নিশ্চয়ই সহায়ক হবে।

ম্যানুয়ালের তৃতীয় অংশে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কিত এবং দক্ষিন এশিয়ার প্রচলিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছু সাহিত্যরচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারী ও অন্যান্য পাঠকদের "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে বৃহত্তর পরিসরে বোধগম্য এবং আত্মস্থ করতে সহায়ক হবে। এই অংশটি নিবিড়ভাবে পাঠ ও আত্মস্থ করে তা অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিনিময় করতে প্রশিক্ষণ সহায়কের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল।

পরিশেষে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে চাই যে, এই ম্যানুয়ালটিতে শান্তি, সামাজিক সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতা চর্চার অতি সামান্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা শেষ কথা নয়। আমাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা এটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি। বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নে এই অংশে সংযোজিত পাঠ্য উপকরণসমূহ এবং তথ্যবহুল অন্যান্য সহায়ক উপকরণসমূহ ব্যাবহারে সংকোচবোধের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আপনাদের অভিজ্ঞতাসমুহ আমাদের সাথে সহভাগ করতে অনুরোধ করছি।

ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল ডেমোক্রেসী (আইএসডি) টীম।

পাঠ্য উপকরণ ১- সমন্বয়বাদ ও বহুত্ব বা বহুজাতীয়তা
(Syncretism and Plurality)

দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক ঐতিহ্যের দু'টি মৌলিক উপাদান - Syncretism বা বিভিন্ন ধর্ম কিংবা চিন্তার মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়াশ অর্থাৎ সমন্বয়বাদ (Syn-মিলিতভাবে, cretein বা বিশ্বাস করা) এবং বহুত্ববাদ সমার্থক কিংবা পরস্পর বিনিময়যোগ্য নয়। অর্থাৎ একটি অপরটির পরিবর্তক নয়। এ সব সমাজ বহুত্ববাদী না হলেও সেগুলোর পক্ষে সমন্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য ধারন করা সম্ভব বা নিশ্চিতরূপেই এরকম একটা ধারণা করা যায় ও vice versa (অর্থাৎ এ সব সমাজ বহুত্ববাদী হলেও সেগুলোর পক্ষে সমন্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য ধারন করা সম্ভব নয় বা নিশ্চিতভাবেই এরকম ধারণা করা যায়না)। দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক কাঠামোতে নিহিত ঐতিহ্যের যে শক্তি সেগুলো হলো বহুমাত্রিক ও সমন্বয়বাদী। বহুত্ববাদিতা বলতে ধর্ম ও ভাষার মাধ্যমে স্পষ্টব্যক্ত ঐতিহ্যের বহুত্ব কিংবা বহুজাতীয়তাকে বোঝানো হচ্ছে।

এ বহুত্ববাদিতা সমন্বয়বাদী এ অর্থে যে, এগুলোর মধ্যে কিছু এজমালি/যৌথ উপাদান রয়েছে যেমন, একটি বৃত্তের উপর অপরটি যেমন আপতিত হয়ে একে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; প্রান্তে বা কিনারায় এসে একে অপরের সাথে মিশে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুন্ন রাখে। আবার এ বহুত্ববাদ অন্তর্নিহিতভাবে সমন্বয়বাদী ও যৌগ এমনটা নয়। এটা ভারতের (অবিভক্ত) একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। ভারতের এ অনন্যসাধারণতাই বিগত শতাব্দী থেকেই পশ্চিমা বিদ্বজ্জনদেরকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। ১৯শ শতাব্দীর শেষে ও ২০শ শতাব্দীর শুরুতে বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র ভারতীয় বহুত্ববাদে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন এবং এ সব ঐতিহ্যের পরস্পরসংযুক্ততাকে উপেক্ষা করে ভারতকে একটি বিচ্ছিন্ন সমাজ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা কেবলমাত্র সামাজিক কাঠামোর উপরের অংশকে দেখেছেন যেখান থেকে উপ-মহাদেশের বহুত্ববাদ দৃশ্যমান হয়, কিন্তু এর যে পরস্পরসংযুক্ততা রয়েছে সেটা দৃশ্যমান নয়।

ব্যাপারটি এমনও নয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বহুত্ববাদী ছিল অথচ অন্য কোন কোনটা সমন্বয়বাদী। দক্ষিণ এশিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে এ দু'টি বৈশিষ্ট্যকেই সমন্বিতভাবে ধারন করে, দু'টি দৃষ্টান্ত থেকেই তা প্রতিপাদিত হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, দক্ষিণ এশিয়া বহু ধর্মের আবাসভূমি। স্বদেশজাত ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যসমূহ চলমান থাকলেও জরথুস্ত্রধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের মতো ধর্মগুলো বিভিন্ন সমুদ্রপাড় অতিক্রম করে এদেশে এসেছে। অনেকে জেনে বিস্মিত হবেন যে, খ্রিস্টধর্মের শিকড় ইউরোপে প্রোথিত হবার আগে দক্ষিণ এশিয়াতে তার আগমন ঘটেছিল। এর সঙ্গে মধ্যযুগে ইসলাম ও শিখধর্ম এসে যুক্ত হলো। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসব (জৈনধর্মের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া) ঐতিহ্য অক্ষত থেকেছে এবং তাদের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। People of India Survey অনুসারে সকল প্রধান ভারতীয় ধর্মের মধ্যে বর্ণপ্রথা বা জাতিভেদ প্রথা রয়েছে। হিন্দুধর্মে প্রায় ৩০০০ জাতিগোষ্ঠী, ইসলাম ধর্মে প্রায় ৫০০টি এবং শিখ ও খ্রিস্টানধর্মে রয়েছে প্রায় ১৫০টি জাতিগোষ্ঠী। তাই হিন্দুদের একটি প্রথা হিসেবে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটেনি, বরং একটি দক্ষিণ এশিয় প্রথা হিসেবেই এটারআবির্ভাবঘটেছে। এটা এককভাবে দক্ষিণ এশিয় ইসলামকে ধ্রুপদী বা প্রাচীন আরবীয় ইসলাম থেকে আলাদা করেছে। এ ইসলাম যতটা না আরবীয়, তার চাইতে বেশি ভারতীয়। তথাপি, এটি মূলগতভাবে ইসলামই রয়ে গেছে।

ভাষা হলো অপর একটি ক্ষেত্র যেখানে সমন্বয়বাদ ও বহুত্বের সংযুক্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অগ্রসারির একজন ভাষাবিদ জর্জ গ্রীয়ার্সন কর্তৃক ১৯শ শতাব্দীর শেষে ও ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরিচালিত জরিপের ফলাফল সমৃদ্ধ গ্রন্থ Linguistic Survey of India অনুসারে ভারতীয়রা অন্তত ১৭৯টি ভাষায় কথা বলে যাতে ৫৪৪টি উপ-ভাষা রয়েছে। এর ফলে ভারত প্রকৃত অর্থে একটি বহুভাষী সমাজে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এটাও আবার স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এসব ভাষা ও উপ-ভাষা ৪টি ভাষা পরিবার যথা, ইন্দো-আর্য, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রিক ও সিনো-তিব্বতীয় ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাছাড়াও, প্রধান ভারতীয় ভাষাসমূহের অধিকাংশই এ জাতীয় ভাষা পরিবার থেকে উদ্ভূত এবং এদের পম্পরের মধ্যে সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের হিস্যা রয়েছে। তৎসত্ত্বেও, এখানে ভাষাগুলো একত্রে মিশে যায়নি। এমন কি আজকের এ সময়েও এটা বলা ভুল হবে যে, এখানে কেবল একটি ভারতীয় ভাষা রয়েছে।

গত দু'দশক ধরে এ ঐতিহ্যটির উপরেই সুপরিকল্পিত আক্রমণ ঘটে চলেছে। যে সব প্রতিষ্ঠান ভারতের যৌগ-উত্তরাধিকারের উপাদানগুলোকে লালন করে আসছেএ আক্রমণ সেই সব প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল ও পরিণামে ধ্বংস করার মানসে পরিচালিত হচ্ছে। এ কারণে গুজরাটের ২৬৮টিরও বেশি সুফিদের পবিত্র পীঠস্থানকে কলুষিত করা হয়েছে। এ উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ ও লালনের জন্য প্রথমত এর

মর্মবাণীকে ধারন করা জরুরি এবং এটি করার সর্বোত্তম উপায় হলো Rubric-এর ভাষা বা নির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত বয়ান ব্যবহার করা (অর্থাৎ কোন গ্রন্থ বা পৃষ্ঠায় সবচেয়ে ভাল বা আকর্ষণীয় অংশকে গুরুত্ব দিয়ে দেখানোর জন্য রং করে বা দাগ দিয়ে দেখানো বা বইটির পৃষ্ঠায় একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সম্বলিত শিরোনামকে রং করে বা দাগ দিয়ে দেখানো) যেমন, সুফি ও ভক্তিমূলক ঐতিহ্য; ললিতকলা; স্থাপত্য; সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন; মুক্তি সংগ্রাম ইত্যাদি।

যে কোন কিছুর চাইতে ভাষা ও সাহিত্যেরজগৎ যৌগ-সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে। ১২শ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্য দেশের অধিকাংশ এলাকায় ক্রমাগত ও অবিচ্ছিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। জাতীয়তা ও ধর্মের ভিত্তিতে এ সাহিত্যকে চিহ্নিত করা একেবারেই অসম্ভব না হলেও কঠিন ছিল। সংস্কৃত ও পার্সী ভাষায় রচিত ধ্রুপদী সাহিত্য ও অবশিষ্ট সাহিত্যের মধ্যেই কেবল পার্থক্য করা যেতে পারে। হিন্দভী ঐতিহ্যের একেবারেই গোড়ার দিকের এবং বিশিষ্ট একজন কবি আমীর খসরু (১২৫৪-১৩২৩ খ্রিঃ) পার্সী ও হিন্দভী/হিন্দুয়ী (১১শ-১২শ শতাব্দী থেকে পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত হিন্দুস্থানে যে একগুচ্ছ ভাষা/উপভাষায় কথা বলা হয় সে ভাষার নাম) ভাষায় লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি হিদভী/হিন্দুয়ী ভাষায় সৃষ্ট তাঁর সাহিত্যের জন্য গর্ব অনুভব করতেন। তিনি তাঁর পার্সী ভাষী শ্রোতৃমন্ডলীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি কবিতার চরণে বলেন ঃ Chaman tooti-e-Hindam, ar rasi pursi; Ze man Hindui purs, ta ngz goyam অর্থাৎ আমি যদি ছোট্ট গোলাপ পাখি হই, যদি তুমি কথা বলতে চাও আমার সাথে, তাহলে হিন্দুয়ীতে কথা বলো যেন আমি তোমাকে সুন্দর সুন্দর জিনিস সম্পর্কে তোমাকে বলতে পারি। ১২শ -১৩শ শতাব্দীর সাধক বাবা গোরখনাথ বেশ নিরাসক্তভাবে নিজের বর্ণনা দিয়েছিলেন এ ভাবে ঃ utpati Hindu jarna jogi akal pari Musalman (অর্থাৎ আমি জন্মেছি হিন্দু হিসেবে, চেহারা আমার যোগীর, প্রজ্ঞা মুসলমানের)।অন্যান্য অনেকের মধ্যে মীর জলিল, রাশখান, আবদুল ওয়াহিদ বেলগ্রামী প্রমুখ বেলগ্রাম অঞ্চলের (হারদই-এর কাছে উত্তর প্রদেশের একটি অংশ) অনেক কবি অনেক কাব্য রচনা করেছেন যেগুলোতে কোন ধর্মীয় ছাপ ছিলনা। তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছেন ঃ Pemi Hindu turk mein, Hari rang rahyo sammay; Deval aur maseet mein, deep ek hi bhay অর্থাৎ আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই এবং গভীরভাবে আমি আমার ঈশ্বরে নিমজ্জিত বা মগ্ন; মন্দির ও মসজিদের জন্য কেবল একটি প্রদীপই যথোচিত। সেগুলো শুধু তাঁর মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে থাকেনি।

এই ধরনের অনেক উদাহরণ সহজেই দেওয়া যেতে পারে। এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাধারণভাবে কবীরের সাথে অভিন্ন ধারা হিসেবে যে সব যৌগ সাহিত্যের ঐতিহ্য রয়েছেকবীর নিশ্চিতরূপেই এ ঐতিহ্যের উচ্চতর দিক এবং সুক্ষ অভিব্যক্তিরও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু এটা ছিল ১২শ থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত বহুল প্রচলিত বা জন-আদৃত সাহিত্যের সাধারণ নমুনা।অনুরূপভাবে, ভাষার ক্ষেত্রেও অনেক বাগভঙ্গি/বাচনভঙ্গি বা কথা বলার ধরন একে অপরের সীমানাকে অধিক্রমণ করেছিল এবং প্রায়ই একটি ভাষা পরিবারকে বিভিন্ন নামে (হিন্দি, হিন্দুয়ী, হিন্দভী, দেহলভী, জবান-ই-হিন্দস্তান, দাখানী, ভাখা, জবান-ই-উর্দ্দু-ই-মুয়াল্লা, জবান-ই-উর্দ্দু, এবং শুধুই উর্দ্দু) অভিহিত করা হয়েছিল। ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে হিন্দি ও উর্দ্দুর স্বতন্ত্র ইতিহাস খোঁজাটা বোকামি হবে এ কারণে যে এগুলোর কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিলনা। ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতে একটি বারোয়ারি বা সাধারণ ভাষা ভান্ডার থেকেই হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি। তাদের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য, যা আজকের দিনে মনে করা হয়, সেটা সাধারণ ভাষিক বিবর্তনের অংশ নয়, বরং এটা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। (যেমন, হিন্দি কিংবা উর্দ্দু কোন ভাষাতে আমীর খসরু লিখেছেন?)কলা, স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে এ ধরনের যৌগ-লক্ষণসমূহের সমতুল বা সদৃশাকার বিকাশ-পথের রেখা টানা যেতে পারে।

সাম্প্রতিককালে আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ফলে আমাদের সমন্বয়বাদী ও বহুজাতিক ঐতিহ্যসমূহ উজ্জীবিত হয়েছে। উপমহাদেশের আন্দোলনগুলো বৃহত্তর অর্থে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামেরও বেশি কিছুরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। একটা সময় যখন আধুনিকায়নের কারণে সৃষ্ট সমজাতীয়তার ধাক্কায় ভারতের বহুত্ব বা বহুজাতিকতাহুমকির মুখে পড়েছিল, তখন আমাদের আন্দোলনগুলো সামাজিক উত্তরাধিকারের সংরক্ষণে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ উত্তরাধিকার থেকেই জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামো নির্মিতহয়েছে। তাই জাতীয় ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে প্রচলিত কর্মপ্রেরণা তার স্বার্থে আমাদের বহুত্ব বা বহুজাতীয়তা ও সমন্বয়পন্থার মধ্যে নিহিত ঐতিহ্যের মূল্যগুলোকে বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এভাবে আমাদের পরম্পরাগত ভান্ডারকে পরিত্যাগ না করে আমরা রাজনৈতিক আধুনিকতায় উঠে আসতে পারি (এবং বিদেশি শাসকের মোকাবিলা করতে পারি)। আমাদের পরম্পরাগত সম্পদের আকারে খুব একটা মূল্য না দিয়েও আমাদের সমাজ আধুনিকতার প্রথম পর্যায়ে প্রবেশ করতে পেরেছে। আমরা যদি এতদূর পর্যন্ত আমাদের সমন্বয়পন্থা ও বহুত্ব বা বহুজাতীয়তাকে সংরক্ষণ করতে পেরেছি, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সে জন্যে সাধুবাদ, আমাদের সুবিধামতো ব্যবহার করতে পেরেছি, তাহলে আমরা এ সম্পদকে এখন ধ্বংস হতে দিতে পারিনা।

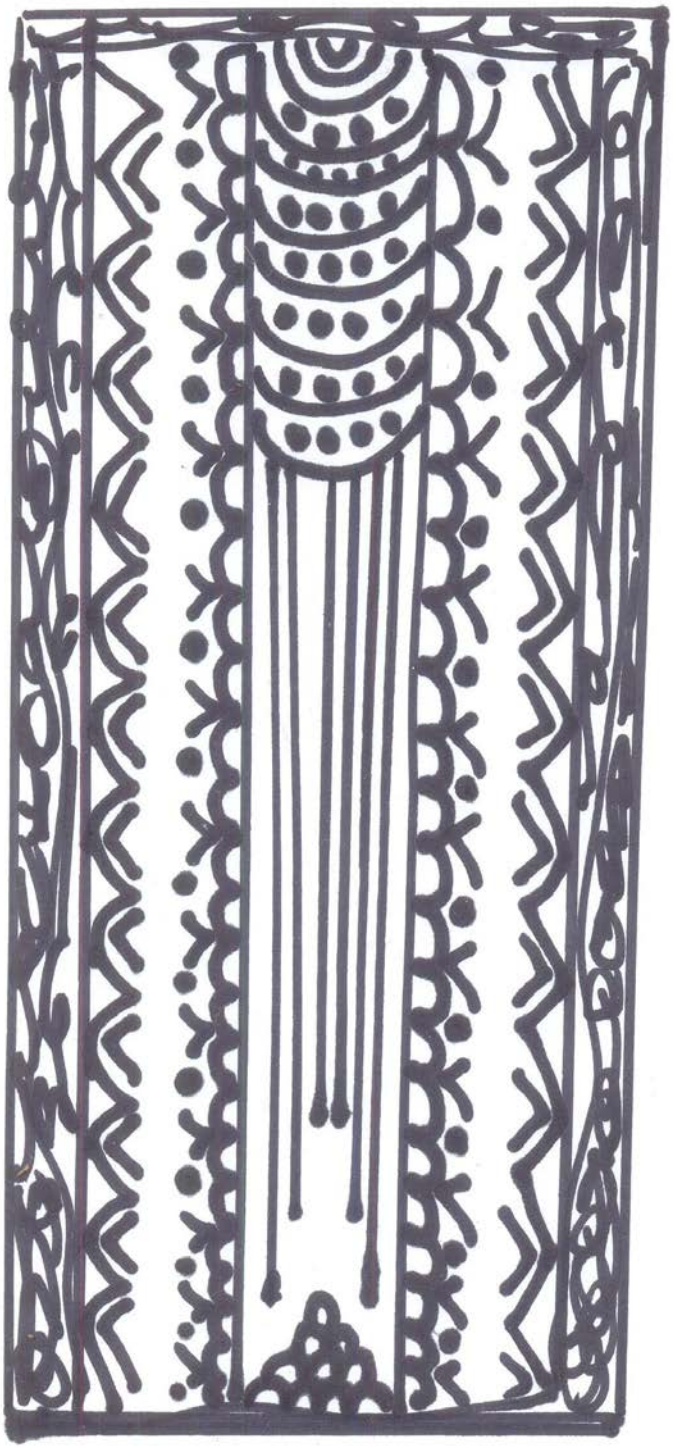

পরিশিষ্ট- ১
অনুশীলন ও সহায়কদের জন্য নোট

অনুশীলন ১- প্রথম ধাপ:
উদ্বোধন ও প্রারম্ভিক আলোচনা

উদ্দেশ্য: পারস্পরিক পরিচিতি এবং অংশগ্রহণকারীগণ যাতে সাচ্ছন্দ অনুভব করে এমন উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা। (সেশনটি দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে)

শুরুতে অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন না। কেননা, প্রারম্ভিক সংলাপের আবহ কিছুটা আনুষ্ঠানিক হয় বলে সকলে কম বেশি চাপে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে সহায়কের কিছু কার্যক্রম অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কার্যক্রম:

- সহায়ক বা ফ্যাসিলিটেটর অংশগ্রহণকারীদের হল রুমের চারপাশে হেঁটে আসার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। এই সময় অংশগ্রহণকারীগণ একে অপরকে স্বাগত জানাবেন বা কথা বিনিময় করবেন আর সামনে হাঁটতে থাকবেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে কুশল বিনিময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই কাজটি চলতে পারে। সহায়কও এই কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
- কক্ষে/হলের প্রতিটি কর্ণারে বিভিন্ন ধরনের চিত্রকর্ম, রং ইত্যাদি লাগানোর পর অংশগ্রহণকারীদের চিত্রকর্ম, রং এর পাশে দাঁড়িয়ে দলগতভাবে ছবির সবচেয়ে বেশি ভাল লাগার বিষয়গুলো আলোচনার পাশাপাশি নিজেদের শহরের বিশেষত্ব, সেখানকার আবহাওয়া, নিজেদের শহর ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিতে পারেন।
- ধীর লয়ে গান বা মিউজিক যখন বাজবে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের তখন রুমে হাঁটতে বলবেন। বাজনা যখন থামবে তখন সহায়ক যে কোন একটি নাম্বার যেমন ৩,৪ বলতে পারেন, তখন অংশগ্রহণকারীগণ সহায়কের বলা নম্বরের সংখ্যা অনুসারে দল তৈরি করবেন। অংশগ্রহণকারীরা দলে ভাগ হয়ে গেলে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মধ্যে পরিচিতির পাশাপাশি কোথা থেকে এসেছেন তা জানার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিবেশ সহজ করার জন্য সহায়ক অন্য যে কোন কার্যক্রম/ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

রঙিন চার্ট/ আঁকা চিত্রকর্ম, ল্যাপটপ, স্পীকার, গানের সিডি।

সময়:

২০ থেকে ৩০ মিনিট।

অনুশীলন ১ - দ্বিতীয় ধাপ: অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক পরিচিতি।

উদ্দেশ্য: পারস্পরিক পরিচিতি এবং অংশগ্রহণকারীগণ যাতে সাচ্ছন্দ অনুভব করে এমন উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা।

প্রথম ধাপের কার্যক্রমের পর আমরা আশা করতে পারি যে, পারস্পরিক পরিচিতির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য অংশগ্রহণকারীগণ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন ।

প্রক্রিয়া:

নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হতে পারে।

- আপনার নাম
- আপনার পেশা
- আপনার কাজের ক্ষেত্র
- আপনার আগ্রহ/ শখ
- কর্মশালা থেকে আপনার প্রত্যাশা

এছাড়াও সময়ের প্রয়োজনে আপনি আরো কিছু বিষয় যোগ করতে পারেন:

- আপনার স্বপ্ন
- আপনি কি করতে চান
- আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সময়
- আপনার এলাকার কোন বিখ্যাত জিনিস
- আপনার কোন বন্ধুর সম্পর্কে মজার কোন তথ্য

সহায়কের জন্য পরামর্শ:

এই সেশনটি বিভিন্ন দলে নানা অবস্থায় পরিচালিত হতে পারে। ফলে প্রয়োজনভেদে প্রশ্নেরও পরিবর্তন হতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

চার্ট, মার্কার, স্কেচ পেন, টেপ।

সময়:

১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

সহায়কদের জন্য নোটঃ

এটি প্রায় পরিলক্ষিত হয় যে, অনেক সময় কর্মশালা, সেমিনার, কনফারেন্স, ট্রেনিং কর্মসূচীগুলোতে পরিচয় পর্ব খুব সাদামাটাভাবে করা হয়ে থাকে। সাধারণত অংশগ্রহণকারীগণের নাম, কাজের ধরন জানার পরেই, পরবর্তী সেশন শুরু করি । কেননা আমরা অনেকেই পরিচিতি পর্বকে সেই অর্থে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। অনেক ক্ষেত্রে আমরা বুঝতেই পারি না কেন আমরা পরিচিতি পর্ব পরিচালনা করি।

প্রকৃতপক্ষে, পরিচিতি পর্ব চলাকালে শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারীগণের নাম ও তাদের কাজের ধরণ জানাটাই যথেষ্ট নয়। অংশগ্রহণকারীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন সেটাই বেশী গুরুত্বপূণ। পরিচিতি পর্বে অংশগ্রহণকারী দল কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এসেছেন তা দেখাও অতীব প্রয়োজন।

কাজটি তখনই সম্ভব হবে যখন অংশগ্রহণকারীগণ একে অপরকে চিনবে, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস করবে, একে অপরের উদ্দেশ্য জানবে এবং একে অপরকে সম্মান করবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচিতি পর্বটাই একমাত্র পথ। পরিচিতি পর্বটা যতই বিস্তৃত হবে ততই অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভাববিনিময়ের কাজটি ততই সহজ হবে। ফলে যে প্রশ্নগুলো প্রত্যেককে আলোড়িত করে, সেই প্রশ্নের দ্রুত সমাধান হবে এবং লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া আরও দ্রুততর হবে।

নোটসমূহ ঃ

উদ্দেশ্য:
অংশগ্রহণকারীগণকে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

অনুশীলন - ২
"কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে ধারণা

প্রক্রিয়া:

- প্রশিক্ষণ সহায়ক শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরী করবেন।
- সহায়ক অনুশীলনের বিভিন্ন ধাপসমূহ এবং সেসনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করবেন।
- "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব ধারণা কি তা সহায়ক প্রত্যেককে খাতায় লিখতে বলবেন। এর জন্য তিনি ১৫ মিনিট সময় দেবেন।
- সবার লেখা শেষ হলে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে ৪ বা ৫টি দলে বিভক্ত করবেন। এই দল গঠন ১,২,৩..৫ সংখ্যা গণনার মাধ্যমে হতে পারে। আবার অন্য কোন প্রক্রিয়াও হতে পারে।
- দলে তিনি সবাইকে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণা এক এক করে বিনিময় করতে বলবেন। এসময় সবাই "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে সবার ধারণা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এরপর তিনি সবার ধারণা একত্রিত বা সমন্বয় করে দলীয়ভাবে একটি ধারণা তৈরী করতে বলবেন। এসময় সহায়ক প্রত্যেক দলে ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম সরবরাহ করবেন। দলীয় আলোচনার জন্য ৩০ মিনিট সময় দেয়া হবে।
- সহায়ক "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে ছোট দলের সমন্বিত ধারণা ফ্লিপচার্টে লিখতে বলবেন।
- এরপর সহায়ক ছোট দলের সমন্বিত ধারণা বড় দলে উপস্থাপন করতে বলবেন।

সহায়কের প্রতি পরামর্শ:

সহায়ক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন যে, এই সেশনের উদ্দেশ্য শুধু "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" কে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা নয়, তা তিনি ব্যাখ্যা করবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

- ফ্লিপ চার্ট, মার্কার কলম, পেন্সিল, মাস্কিং টেপ, ইত্যাদি।

সময় :

২ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

সহায়কদের জন্য নোটঃ

যে কোন প্রশিক্ষণ কর্মশালার জন্যই এই দুইটি অনুশীলনীই সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে পরবর্তীতে কি কি আলোচনা আসবে তা নির্ধারিত হয়। এই অনুশীলন প্রক্রিয়া কর্মশালার বিষয়বস্তু যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তার প্রক্রিয়াকে সাহায্য কিংবা ব্যাহত করতে পারে। তাই প্রশিক্ষণ সহায়কদেরকে বয়স্কদের শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মূলনীতি সর্বদাই শ্রদ্ধাসহকারে মনে রাখতে হবে (কারণ এই ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা সাধারণত সবাই বয়স্ক থাকে)। এই অনুশীলনে প্রশিক্ষণ সহায়কগণ অংশগ্রহণকারীদের মনে এই অনুভূতি জাগাবেন যে, তারাই কেবলমাত্র "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এর ধারণা সংজ্ঞায়িত করবেন, সহায়কগণ নয়।

প্রশিক্ষণ সহায়কগণ শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে এই অনুশীলনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন। "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এমন কোন সাধারণ বিষয় নয়, যা অংশগ্রহণকারীদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় প্রতিনিয়তই প্রতিফলিত হয়। আমরা যখনই "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" শব্দ উচ্চারণ করি, তখন ঐতিহাসিক কোন সুদৃশ্য স্থাপনার কথাই প্রথমে মনে আসে, যা আমরা আমাদের স্কুলের পাঠ্যবই থেকে শিখেছি। আবার কোন কোন অংশগ্রহণকারী ঐতিহাসিক কোন পবিত্র স্থানের কথাও মনে করতে পারে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা খুব সহজেই এই ধারণা সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারবে- এটা মাত্রতিরিক্ত প্রত্যাশাই হবে। তাই প্রশিক্ষণ সহায়কদের কিছুটা ভিন্ন পথে এবং ভিন্ন কৌশলে আলোচনা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে ধারণা লিখতে বলা এর গভীরে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট নয়। এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ সহায়কদের নানাভাবে অভিব্যক্তি ব্যাক্ত করতে হবে, অংশগ্রহণকারীদের মনে প্রশ্ন জাগাতে হবে, যেমন- আমরা কীভাবে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" কে কীভাবে দেখি? আমরা যখন "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" নিয়ে ভাবি বা "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" শব্দ দু'টি বলি তখন আমাদের মনে তাৎক্ষণিকভাবে কি কি বিষয় সম্পর্কে ধারণার উদয় হয়? "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে আমাদের ধারণা কী? আমরা কীভাবে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য"কে সংজ্ঞায়িত করতে পারি, ইত্যাদি?

"কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশের বাইরেও প্রশিক্ষক সহায়কগণ বিস্তারিতভাবে না গিয়ে বিভিন্ন সার্বজনীন উদাহরণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বোঝার জন্য বিভিন্ন সাহায্যপূর্ণ ইঙ্গিত বা আভাস দিতে পারেন। উদাহরণগুলি সাধারণ হতে হবে, নির্দিষ্ট হলে অংশগ্রহণকারীরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়তে পারে। কারণ অংশগ্রহণকারীরা ঐসব উদাহরণ গ্রহন করতে পারে এবং তারা সেগুলোর মধ্যেই তারা নিবিষ্ট থাকবে। সহায়কদের বিষয়টি বারবার বোঝাতে হবে যে, এরূপ উদাহরণ "কম্পোজিট হেরিটেজ বা সমন্বিত ঐতিহ্যের" অনেকগুলো দিকের মধ্যে একটি দিক মাত্র। এই উদাহরণগুলো প্রত্যেকের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

"কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য"-এর অর্থ হলো কীভাবে জনগণ এক অপরের সাথে মিলিত হয়, যোগাযোগ রাখে, কীভাবে একে অপরের সাথে আচার-ব্যবহার করে, কীভাবে তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করে। আমাদের গ্রামীন জীবন-যাত্রার ধরণ "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য"-এর জীবন্ত উদাহরণ। আমাদের ভাষা, কৃষ্টি, রীতি-নীতি, খাদ্যাভাস ইত্যাদির মধ্যেই "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য"-এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে এবং এর ভিত্তিতেই আমরা আমাদের অতীত সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে ভবিষ্যতের যোগসূত্র রচনা করি। আর এগুলোই হচ্ছে প্রচলিত রীতি, যেগুলো আমাদের বিশ্বাস ও ভাবনাকে প্রতিফলিত করে।

অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগতভাবে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা সমন্বিত ঐতিহ্য" সম্পর্কে ধারণা লেখার পর তারা ছোট দলে এ সম্পর্কে একটি সাধাররণ ধারণা তৈরী করবেন। "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে দলীয় ধরণার উপস্থাপন শেষে সহায়কগণ সব দলের ধারণার সমন্বয়ে একটি একত্রিত বা সমন্বিত ধারণা তৈরী করবেন। এসময় প্রয়োজনে সহায়কগণ অবশ্যই তাদের 'ইনপুট' দিয়ে তা সমৃদ্ধ করবেন।

নোট : "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা পাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ সহায়কদের জন্য লিখিত পাঠ্য উপকরণ পাঠ করা যেতে পারে। (পাঠ্য উপকরণ- ১, পৃষ্ঠা নম্বর ২১-২২)।

পাঠ্য উপকরণ ১: "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" কি? কীভাবে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" তৈরী হয়?

আপনারা ভেবে দেখবেন যে, আমরা যখনই অতীত এবং বর্তমান সময়ের (অদূর ইতিহাস এবং বর্তমান প্রেক্ষিত) প্রেক্ষিতে "সংস্কৃতি" নিয়ে আলোচনা করি তখন মাঝে মাঝেই উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ, যেমন- প্রথা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্যসমূহ, ইত্যাদি আমাদের মনে উঁকি দিয়ে যায়। আমাদের ভাবায় যে, এই সকল শব্দ বা বিষয়সমূহ আমাদের অন্তরে কী অর্থ বহন করে? "সংস্কৃতি" বলতে বাস্তবিক পক্ষে আমরা কী বুঝি? আমাদের "সংস্কৃতি" এবং "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এর মধ্যে সম্পর্ক কী? সকল সংস্কৃতিই কি সার্বজনীন, না-কি আমাদের অসার্বজনীন বা গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যও আছে? আমরা কীভাবে আমাদের সংস্কৃতিকে বংশানুক্রমিকভাবে বা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি?

ঐতিহ্য (যা আমরা বংশানুক্রমিকভাবে অর্জন করেছি) এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ (মর্যাদা, সম্পত্তি ও সম্পদ) এই দু'টি ধারা আমাদের মনে অতীত থেকে বর্তমানের মনে সংস্কৃতির ক্রমঃগতির ধারণার জন্ম দেয়। আমরা যখন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে কথা বলি তখন সাধারণত সংস্কৃতির ঐসব উপাদান বা বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবি যেগুলো সুদূর অতীত থেকে আমরা অনুশীলন করে আসছি বা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতির এসব উপাদানসমূহ আমাদের মর্যাদা, সম্পত্তি ও সম্পদ থেকেই উত্থিত। কোন সংস্কৃতির সার্বজনীনতা ঐ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য থেকেই আসে। বৈশিষ্ট্যের দিক বিবেচনায় কোন সংস্কৃতি সার্বজনীন হ'তে পারে আবার অসার্বজনীন বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিকও হ'তে পারে। অন্য কথায় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, কোন সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডই সার্বিকভাবে সার্বজনীন নয়। আবার কোন সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডই সার্বিকভাবে অসার্বজনীন বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক নয়। সকল সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্যেই কিছু কিছু বিষয় বা দিক রয়েছে যা সার্বজনীন (যা সমাজকে এবং সমাজের মানুষকে সংযুক্ত করে), আবার কিছু কিছু বিষয় বা দিক রয়েছে যা অসার্বজনীন বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক (যা সমাজকে এবং সমাজের মানুষকে বিভক্ত করে)।

সুতরাং সংস্কৃতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, আমাদের যা আছে তার সংমিশ্রনই হ'লো আমাদের সংস্কৃতি। যেমন- জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, আইন, রীতি-নীতি, বিভিন্ন সক্ষমতা এবং অভ্যাসসমূহ যা সমাজের সদস্য বা সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে অর্জন করে। সংস্কৃতির পূর্ণ ধারণা অনুধাবন বা বোঝার জন্য আরও তিনটি ধারা রয়েছে। প্রথমতঃ মানুষের জীবন-যাত্রা, যথা- খাদ্যাভাস, পোষাক-আশাক, উক্তি বা বাক্‌প্রণালী, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতির উৎপাদিত ফলাফল, যথা- শিল্পকলা, স্থাপত্যশিল্প, সংগিত শিল্প, নৃত্য শিল্প, সৌন্দর্য্যশাস্ত্র, ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ নৈতিক মূল্যবোধ, যথা- নৈতিকতা, আদর্শবাদ, ভাল-মন্দের ধারণা ও বিচার ক্ষমতা, প্রত্যাশা, অপ্রত্যাশা, ইত্যাদি। এই তিনটি ধারার সবই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সংমিশ্রিত অংশ, যাকে একত্রে সংস্কৃতি বলা যায়। আর এই তিনটি ধারার সবগুলো বিষয়ই সামাজিক জীবন প্রনালীর মধ্যে থাকা মানুষদের দ্বারা অনুশীলন করা সম্ভব। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোন একক ব্যক্তির পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সংস্কৃতি কোন ব্যক্তিগত বা একক বিষয় নয়। এটি সর্বদাই দলীয় এবং সামাজিকভাবে অনুশীলিত এবং দৃষ্টিগোচরের ব্যাপার। তাই যখন আমরা সার্বজনীন সংস্কৃতির কথা বলি, তখন অবশ্যই ঐ সংস্কৃতির ঔবশিষ্ট্যের মধ্যে সার্বজনীনতার সকল গুণাবলী ও মান নিহীত থাকে।

ভারতের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মহীস্তপে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" অদ্বিতীয় এবং পারিপার্শ্বিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। এই "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আমাদেও হাতে এসে পোঁছেছে।

এই ঐতিহ্যসমূহকে "ক্ষমতার মূল্যবোধ" এবং "মানবিক মূল্যবোধ" উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখা যেতে পারে। অন্য কথায় বলা যায় যে, ভারতের ইতিহাসে ঐতিহ্যসমূহ সৃষ্টি ও সংরক্ষণে শোষক শ্রেণী এবং সাধারণ জনগণ উভয়েরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এসব ঐতিহ্যসমূহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যপট হ'লো- সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার বৈশিষ্ট্য এবং বহুত্ববাদিতা।

নোট : এই পাঠ্য উপকরণটি "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" গঠনের প্রেক্ষাপট বিষয়ক অনুশীলনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

নোটসমূহ ঃ

অনুশীলন- ৩
“কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য” -এর গঠন

উদ্দেশ্য:
অংশগ্রহণকারীগণ বিমিশ্র ঐতিহ্যের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

প্রক্রিয়া:

- অংশগ্রহণকারীদেরকে পূর্বের অনুশীলনীগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন।
- বিমিশ্র ঐতিহ্যের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের পরিস্কার ধারণা লাভের জন্য সহায়ক প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে বিশদ আলোচনার সুয়োগ সৃষ্টি করবেন। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সহায়ক প্রয়োজনে ভিজ্যুয়াল মাধ্যম, তথ্য নির্ভর ছবিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠ্য উপকরণ দেয়ার মাধ্যমে আলোচনাকে আরো প্রাণবন্ত ও আনন্দময় করে তোলার চেষ্টা করতে পারেন।
- এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে ৪ বা ৫টি দলে বিভক্ত করবেন। এই দল গঠন ১,২,৩..৫ সংখ্যা গণনার মাধ্যমে হতে পারে। আবার অন্য কোন প্রক্রিয়াও হতে পারে।
- দলে তিনি সবাইকে বিমিশ্র ঐতিহ্যের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণা এক এক করে বিনিময় করতে বলবেন। এসময় সবাই বিমিশ্র ঐতিহ্যের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবার ধারণা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এরপর তিনি সবার ধারণা একত্রিত বা সমন্বয় করে দলীয়ভাবে একটি ধারণা তৈরী করতে বলবেন। এসময় সহায়ক প্রত্যেক দলে ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম সরবরাহ করবেন। দলীয় আলোচনার জন্য ১ ঘন্টা সময় দেয়া হবে।
- সহায়ক বিমিশ্র ঐতিহ্যের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছোট দলের সমন্বিত ধারণা ফ্লিপচার্টে লিখতে বলবেন।
- এরপর সহায়ক ছোট দলের সমন্বিত ধারণা বড় দলে উপস্থাপন করতে বলবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:
চার্ট, মার্কার, স্টিচ পেন, টেপ, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, প্রজেক্টর, পাঠ্য উপকরণ।

সময়:
২ ঘন্টা।

সহায়কদের জন্য নোটঃ

যেহেতু এই অনুশীলনীটি কোন সাধারণ বিষয় নয় তাই যে কোন দলের জন্য এটি কঠিন হবে। এটি জটিল বিধায় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও বিতর্ক আছে। অংশগ্রহণকারীরা ইস্যুটি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হবেন, ফলে অনুশীলনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা আপনার কাছে একাধিকবার ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। এটি ভাববার অবকাশ নেই যে, তারা প্রশ্নটি বুঝতে পারছে না বলে প্রশ্ন করছেন। অনেক অংশগ্রহণকারী উত্তর খোঁজার বদলে সমস্যা দিয়েই শুরু করতে চাইবেন, কারন তারা উত্তরের কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। এখানে সহায়ককে অবশ্যই কিছু ইনপুট দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে পূর্বের অনুশীলনী থেকে কোন উদাহরণ নিয়ে তা কিভাবে সমন্বিত সংস্কৃতি হিসেবে রূপলাভ করলো তা ব্যাখ্যা করতে পারেন। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিমিশ্র ঐতিহ্য গঠিত হয় দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে, যথা- স্বত:স্ফূর্ত এবং সুচিন্তিতভাবে। মানুষ তার নির্দিষ্ট এলাকায় বা অঞ্চলে একত্রে বসবাস করতে গিয়ে প্রয়োজনে দৈনন্দিন যোগাযোগ, নানা কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এক ধরণের জীবন পদ্ধতি গড়ে তোলে যা সকলের মাঝে এক ও অভিন্নতা বোধ তৈরী করে, যা সার্বজনীন। বিমিশ্র সংস্কৃতি যেমন - এক গুচ্ছ রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, জীবন প্রণালী, একই ধরণের বিশ্বাস কিংবা সম্মিলিত জ্ঞান - যাকে খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু উপলব্ধি করা যায়। বিমিশ্র সংস্কৃতি ভৌগলিক এলাকা, সেখানকার আবহাওয়া, ঋতু, খাদ্যশস্য, শিল্প- সাহিত্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে। এসব উপাদানগুলোর সমন্বয়ে নির্দিষ্ট সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যে গড়ে উঠে, যেগুলো থেকে নানা ধরনের লোকশিল্প, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, ইভেন্ট এবং উৎসব বিকশিত হয়। এসবের উপর ভিত্তি করেই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য এক একটি সার্বজনীন ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। বিমিশ্র ঐতিহ্যকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যার একটি কাঠামোবদ্ধ নয়, অন্যটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠে। এরপরেই আসে মানুষের নিজস্ব কিছু সৃজনশীলতা। ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা নানা ঐতিহ্যেগুলোতে তারা নতুন মাত্রা যোগ করে, পাশাপাশি নতুন কোন ঐতিহ্য গঠনে ভূমিকা রাখে।

এই অনুশীলনীটি পরবর্তী ৫টি অনুশীলনীর ভিত্তি ও রেফারেন্স বা তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করবে, তাই এই অনুশীলনীটি সম্ভবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলীয় কাজের সময় সহায়ককে আলোচনায় প্রচুর সহায়তা দিতে হতে পারে। সহায়ককে অংশগ্রহণকারীদের বোঝার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট কিছু উদাহরণ মাথায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, একই উদাহরণ যাতে বিভিন্ন দলে বারবার না আসে। এতে দল তৈরীর ন্যায় বিমিশ্র ঐতিহ্য তৈরীতেও অনেক উপায় খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। তারপরও অংশগ্রহণকরীদের কাছ থেকে সহায়ককে বিস্ময়কর কিছু আশা করা ঠিক হবে না। সহায়ককে মনে রাখতে হবে যে, অংশগ্রহণকারীগণ হয়তো এই বিষয়ে প্রথমবারের মতো আলোচনা করছেন।

নোট ১.
বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত জানতে সহায়কের জন্য সংযুক্ত পাঠ্য উপকরণ ১ এবং ২ (পৃষ্টা ২৬ -৩৩) পড়া যেতে পারে।

নোট ২.
ফিল্ম- Urdu Hai Jiska Naam, Hindustan Ki Kahani, Our Shared Culture Heritage, Formation of Indian Identity etc. দেখা যেতে পারে।

পাঠ্য উপকরণ ১ : মধ্যযুগ পূর্ব সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য
(Sycretic Traditions Prior to Medieval Times)

ইসলামের আগমনের পরেই উপমহাদেশীয় সমন্বয়বাদীতা এবং যৌগ সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা হতে দেখা যায় এবং এ পরম্পরাকে মধ্যযুগে শুরু হওয়া সুফি ও ভক্তিবাদমূলক আন্দোলনে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। সম্ভবত নতুন ধরনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে আমরা অবারিত হয়ে গিয়েছিলাম যা সমন্বয়বাদীতা সম্পর্কিত সাফল্যের সম্ভাবনার জন্য উদ্দ্যমের সঞ্চার করেছে। কিন্তু এটা থেকে আমাদের এমন মনে করাটা ঠিক হবেনা যে এ জিনিষগুলো প্রাচীনকালে আমাদের সমাজে ছিলনা। মধ্যযুগ পূর্ব সমন্বয়বাদীতা আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন অবয়বে অভিব্যক্ত বা স্পষ্ট ছিল।

আমরা জানি যে, ইসলাম বর্হিভারত থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে আগত প্রথম ধর্ম নয়। প্রথম সহস্রাব্দের বিভিন্ন সময়ে ভারতে ইহুদী, জরথুস্ত্র ও খ্রিস্টধর্মের উপস্থিতি ছিল। বস্তুত, ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠালাভের বহু পূর্বেই উপমহাদেশে খ্রিস্টধর্মের আগমন ঘটেছিল। ধর্মের এ স্থানান্তর, সচলতা এবং সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাতে আত্তীকরণের প্রবণতা একটা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। যে প্রেক্ষিতে সমন্বয়বাদীতাকে সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে সেটি ছাড়াও আমাদের দর্শন ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রকৃতি এমন যে এগুলো বাইরের প্রভাবকে গ্রহণ ও নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে যৌগের সাফল্যের সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বাসের জগৎ ও অন্যান্য জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে মানুষের দু'ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে- একেশ্বরবাদ (এক ঈশ্বরে বিশ্বাস) ও বহুঈশ্বর বা বহুদেবোপসনায় (সৃষ্টিক্রমে বহুদেবতা ও বহুঈশ্বরে বিশ্বাস) বিশ্বাস। কিছু পন্ডিতের মতে, পৌত্তলিকতা থেকে ঈশ্বরবাদ- মানুষের ধর্ম পালন রীতির এক ধরনের উত্তরণ (transition) অর্থাৎ বহুঈশ্বরবাদ বা বহুদেবোপসনা থেকে একেশ্বরবাদ। বহুদেবোপসনা ও একেশ্বরবাদের মধ্যে অনেকেই নিরন্তর পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের পরম্পরা লক্ষ্য করেছেন। তবে তাঁরা সকলেই একমত যে, একটি ও অপরটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে ঃ সেমিটিক ধর্মীয় পরম্পরাসমূহ (ইহুদীধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম) একেশ্বরবাদী; ভারতীয় ধর্মীয় পরম্পরাগুলো বহুদেববাদী। তবে কৌতুহলের বিষয় হলো, ভারতীয় ধর্মসমূহ (ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম) বহুদেববাদী হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর মধ্যে একেশ্বরবাদের শক্তিশালী উপাদানসমূহের উপস্থিতি রয়েছে।

ঋগ্ বেদ, যা সম্ভবত পৃথিবীতে এ যাবৎ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বাধিক প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন উক্তি ও প্রসঙ্গ রয়েছে যেগুলো আজও মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। রিগ্ বেদের দু'টি উক্তি হলো ঃ ''সত্যমেবাদ্বিতীয়ম। জ্ঞানীজনেরা যার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন" এবং ''সর্বদিক থেকেই মহৎ ভাবধারা আসুক।"এ দু'টো উক্তি অভিষ্ট অর্জনের যে মার্গপথ তার বহুত্বের দার্শনিক স্বীকৃতির প্রতীক, যার মাধ্যমে সর্বজনীন সত্যের তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করা যায়। তদুপরি দ্বিতীয় উক্তিটিতে প্রজ্ঞার একটি ভান্ডারতৈরির প্রয়াস রয়েছে যেখানে সকলেই অবদান রাখতে পারে যা পরিণামে সকলের জন্য কল্যাণকর হবে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের সমান্তরালে ঐতিহ্য বা পরম্পাগুলোও চলে এসেছে। বুদ্ধদেব (৫৬৪-৪৮০ খ্রিস্টপূর্ব) বেদ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্রান্ততাকে প্রত্যাখান করে সেগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, ইহজগতেই নির্বাণ (জীবন ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি) অর্জন করতে হবে এবং তা সদাচরণের মাধ্যমে যে কোন জনই অর্জন করতে পারে।

অনুরূপভাবে, বহু ঐতিহ্যের মিলনেই কেবল বহুত্ববাদ ও সত্যের অর্জনে সাফল্যের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে জৈনদর্শনও অবদান রেখেছে। বিখ্যাত জৈন দর্শন *Syadvad* যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, সত্যকে কেউই পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারেনা, তাই সত্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা ও তাকে বুঝতে পর্যাপ্ত সুযোগের অবকাশ রাখতে হবে।

এভাবে দেখা যায় যে, সকল ধর্মের পরম্পরার মধ্যে বহুত্বের চৈতন্য বা প্রাণসত্তা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এ বহুত্ব বাস্তব ও আদর্শিক এ উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। অর্থাৎ বাস্তবতা ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য মান হিসেবে বহুত্ব বা বহুজাতীয়তা বলবৎ থাকল। সাধারণ ধর্মীয় জীবন বহুত্বকে মেনেছে ও একত্রীভূত করেছে এবং এটাকে সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম সংগঠিত করার উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। মূলধারার ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রত্যাবর্তনের জন্য এখন এটা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, খ্রিস্টিয় শতকের শুরুতে অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুরা হয় বৈষ্ণব নতুবা শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। সাম্প্রতিককালে হিন্দুধর্ম মানোপযোগী হওয়ায় এ বিভাজন এখন প্রয়োজনারিক্ত বলে

প্রতীয়মান হয় এবং এটি এখন তার ফোকাসটি হারিয়েছে। তবে, খ্রিস্টিয় প্রথম সহস্রাব্দকালীন সময়ে এটি হিন্দুধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন ছিল। যদিও অন্যান্য দেবগণ স্বীকৃত ছিলেন, তবে তাঁদেরকে সাধুসন্ত ও দেবদূতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও এ দু'য়ের মধ্যে মতপার্থক্য বিরোধের জন্ম দিয়েছে, এবং কিছু ধর্মীয় নির্যাতনও হয়েছে। তবে হিন্দুধর্মের এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজিত অংশ মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটেই পরস্পর মানিয়ে চলেছে এ বিশ্বাসে যে, চূড়ান্ত বিচারে দু'টো অংশই সঠিক। প্রাচীন ভারতের অগ্রস্থানীয় ঐতিহাসিক A.L. Basham বলেন ঃ ''হিন্দুধর্ম মূলত সহিষ্ণু, কঠোরভাবে বর্জন না করে আত্তীভূত করে নেয়। তাই বিচক্ষণ বৈষ্ণব ও শৈবধর্মাবলম্বীরা আদিকাল থেকেই বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা যে সকল দেবতার উপাসনা করতেন তাঁরা একই দেব বা ঐশী সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ঐশীসত্তাকে হীরক খন্ডের বিভিন্ন পার্শ্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার মধ্যে অতি বৃহৎ ও উজ্জল দু'টি পার্শ্ব হলো বিষ্ণু ও শিবএবং অন্যান্য পার্শ্বগুলো হলো যে সব দেবগণ পূজিত হয়ে আসছেন তাঁদের প্রতীক (Basham, *The Wonder That Was India,* p. 309)।

এভাবেই ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য বা পরম্পরা অর্গলমুক্ত হয়ে খুব সহজেই একেশ্বরবাদ ও বহুদেবোপসনাবাদের প্রভাবকে গ্রহণ করতে পেরেছিল। ভাগবত গীতায় অর্জুনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে একেশ্বরবাদের একটি জোরালো উপাদান লক্ষ্য করা যায়ঃ

যদি কোন পূজারী বিশ্বাস সহযোগে ভক্তি করে/ যে কোন দেবতা, সে যেই হোক/ এবং সেই একই বিশ্বাস সহযোগেযে নিজ দেবতাকে ভক্তি করে/ এবং তার কামনা চরিতার্থ হয়/ আমিই সে, কারণ এগুলো আমিই দান করেছি

এ পটভূমিতেই বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। ৬ষ্ট শতাব্দীর দিকে বিবর্তনের ধারায় 'ত্রিমূর্ত্তি'র (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব)ধারণা বিকশিত হয়েছে, যা পরবর্তীকালে হিন্দুদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তথাপি সমন্বয়বাদের অপর একটি উপাদান দেবতা 'হরিহর'-কে (বিষ্ণুর উপাধি হলো 'হরি' এবং শিবের উপাধি হলো 'হর') দেবের প্রতিকৃতি হিসেবে উপাসনা করা হয়, যার উভয় দেবতারই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'হরিহর'-এর উপাসনা মধ্যযুগে সূচিত হয়েছে এবং এটা দেশের দক্ষিণ অংশে বেশি সাফল্য পেয়েছে যেখানে রাজন্যরা 'হরিহর' মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

প্রধানত, আভ্যন্তরীন বহুত্ব ও সমন্বয়বাদের বৈশিষ্ট্যের কারণেই ভারতীয় ধর্মীয় পরম্পরা বহিরাগত ধর্মীয় শক্তির সাথে সৌহার্দ রেখে মিথস্ক্রিয়া করতে পেরেছে এবং ভাব বিনিময়ের মেজাজ বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। মধ্যযুগে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম নিয়ে সাধারণ্যে যে মিথস্ক্রিয়া হতো তাতে এ মেজাজটা থাকতো। এটার প্রতিফলন, অন্যান্যের মধ্যে, ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে দেখা যেতো। কিন্তু অতীতে ইহুদীধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও জরথুস্ত্রধর্মের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল পারস্পরিকতার মেজাজ।

জনশ্রুতি অনুসারে, ইউরোপে পৌঁছানোর আগেই ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম এসে পৌঁছেছিল। খ্রিস্টের একজন শিষ্য সাধু থমাস সিরিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন। ১৩শ শতাব্দীর শেষের দিকে মার্কো পোলো যখন ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন তখন তিনি সাধু থমাসের সমাধি দেখেছিলেন (মাদ্রাজের উপকণ্ঠে মাইলপুরের একটি গীর্জায়) এবং একটি তীর্থক্ষেত্র হিসেবে এর লোকপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। খ্রিস্টান এবং মালাবারের খ্রিস্টানরাতাদের আগে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মাবলম্বীদের অনুরূপ হিন্দুদের অনেক রীতি গ্রহণ করেছেন, এবং মুক্তমনা হিন্দুধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় ছিলেন।

খ্রিস্টানধর্মাবণম্বীদের অনুরূপ ইহুদিদের (ইহুদি ধর্মের অনুসারী; পৌরাণিক দেশ Yahuda থেকে অভিবাসিত হওয়ার কারণে ভারতীয় ভাষায় নাম হলো ইহুদি) একটি ছোট্ট সম্প্রদায় মালাবারে বসতি স্থাপন করেছিল। ভারতীয় সূত্রে জানা যায়, ১০ম শতাব্দীর একটি সরকারি সনদ অনুসারে যোসেফ নামে জনৈক ইহুদিকে রাজা ভাস্কর জমিসহ অন্যান্য বিশেষ অধিকার বা সুবিধাদি দিয়েছিলেন। এর পরে পরেই ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকেদের বসতি স্থাপন শুরু হয়। কিন্তু ইহুদি পরম্পরায় উল্লেখ আছে, খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর দিকে বর্তমান কোচিনের একটি অঞ্চলে ইহুদির একটি বড় বসতি ছিল। যাই ঘটে থাকুকনা কেন, হাজার বছরেরও বেশি পূর্বে (সম্ভবত দু'হাজার বছর) ভারতে ইহুদিদের একটি ছোট্ট সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। একটা শ্রেণী স্থানীয় মালায়ালী বাসীদের সাথে এত ঘনিষ্টভাবে মিশে গেছে যে, মালায়াদের সাথে তারা সম্পূর্ণভাবে একীভূত হয়ে গিয়েছে। অন্য শাখাটি এর বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পেরেছে এবং এখনও দৃশ্যত সেমিটিক রয়ে গেছে। অনুরূভাবে, জরথুস্ত্ররা (তাদের বাসভূমি পারস্যের নামানুসারে এখন তাদেরকে পার্‌সিস নামে ডাকা হয়) আদিতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিল। আরব কর্তৃক পারস্য বিজয়ের পর আরও অনেক শরণার্থী ভারতে এসে বসবাস করতে শুরু করে। অন্যান্য দলদের মতো এরাও ভারতের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এদের সংস্কৃতিও পক্ষান্তরে ভারতীয়দের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। এ মিথস্ক্রিযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরনটা হলো ভাব বিনিময়ের, সম্পূর্ণভাবে মিশে যাওয়া নয়।

এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশ, যদিও স্থানীয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি অনুরক্ত থেকেছে, ভারতের বহিরাঞ্চল থেকে যারা এসেছে তারেকে স্বাগত জানিয়েছে। ধর্মযুদ্ধতো দূরের কথা, কোন অ-ভারতীয় সম্প্রদায় কিংবা ধর্মের প্রতি নির্যাতনের কোন প্রমাণ সাধারণভাবে দেখা যায়না। এ সব সম্প্রদায় ও ধর্মের অনুসারীরা নিরুপদ্রবে তাদের ধর্মের অনুসরণ করেছেন এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলে ধর্মীয় জীবনে ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। হিন্দুদের বৃহত্তর অংশ বহিরাগত বা বিদেশি ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিন্তু তাঁরা কোনভাবেই

এগুলোর বিরোধী ছিলেননা। ভারতীয় ধর্মীয় পরম্পরার বৈশিষ্ট্যসূচক যে স্থিতিস্থাপকতা তাতে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের সামর্থ্যের অবদান রয়েছে।

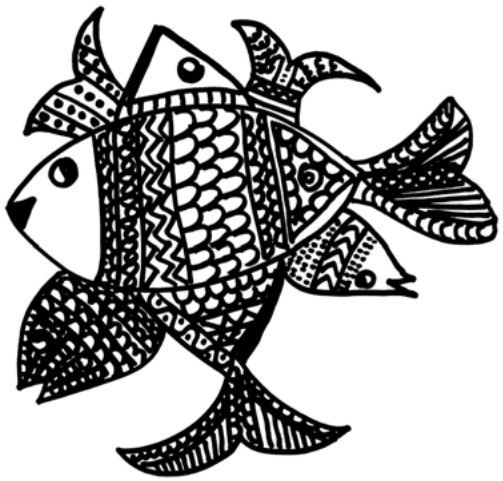

পাঠ্য উপকরণ ২ : মধ্যযুগের দক্ষিণ এশিয়ায় সমন্বয়বাদী পরম্পরা বা ঐতিহ্য (Syncretic Traditions in Medieval South Asia)

যখন তুর্কী ও মোঘলরা ভারতকে (এখন থেকে উপমহাদেশ পড়তে হবে) তাদের আবাসভূমিতে পরিণত করলো, তারা অনেক নতুন জিনিসের প্রচলন ঘটালো যা তারা পারস্যীয়, আরবীয় ও তর্কী পরম্পরা থেকে শিখেছে। শাসকদের যাঁরা বিজেতা হিসেবে এসেছিলেন তাঁরা গোড়ায় দেশীয় ধর্মাচারের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যখনই তাঁরা এদেশে স্থায়ী হলেন তখন তাঁরা স্থানীয় রাজন্যবর্গ ও পুরোহিতবৃন্দের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করলেন। একটি ব্যাখ্যা রয়েছে যে, সুলতানী ও মোঘল আমলের রাজা ও বাদশাহ্‌রা ইসলামের প্রবর্ধনে সক্রিয় সহযোগিতা এবং হিন্দুদের নির্যাতন করেছিলেন। কতিপয় শাসকের ক্ষেত্রে এটি সত্য হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নয়। এ সব রাজারা এখানে শাসন করতে এসেছেন।

কোন ইসলামী আইন যদি বেশি কর কিংবা বেশি ক্ষমতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে, তৎক্ষনাৎ তাঁরা সেই সব আইন রদ করে দিয়েছেন। যেটা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কর আদায় ও প্রশাসন পরিচালনায় এ সব রাজাদের হিন্দু রাজন্যবর্গ, বণিক ও জমিদারদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল।এ সব হিন্দু জমিদার তুর্কী ও মোঘলদের কর্মকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কারণ এতে তাঁরা উপকৃত হয়েছিলেন। তুর্কী ও মোঘলরা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন কারণ তাঁরা হিন্দু জমিদারদের সমর্থন পেয়েছিলেন।বিনিময়ে এ সব জমিদার আরও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন, কারণ তাঁরা শক্তিশালীতুর্কী সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ছিলেন। এ সব জমিদার কার্যকরভাবে হিন্দু ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক রাজপুত রাজা যাঁরা মোঘল রাজাদের সাথে মিত্রতা বা সখ্যতা গড়ে তুলেছিলেনতাঁরা অনেক ক্ষমতাশালী হতে পেরেছিলেন কারণ তাঁরা মোঘল আমলাতন্ত্রে অত্যন্ত লোভনীয় পদ লাভ করেছিলেন। তাঁরা বহু মন্দিরস্থাপন করেছিলেন। যেমন, জয়পুরের কাছওয়ারা বংশীয় রাজারা আমের নামক স্থানে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ছোট ছোট রাজ্যের অনেক মুসলমান শাসক স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ ও গীতার বঙ্গানুবাদ হয়েছিল।

যৌগ সংস্কৃতির রূপায়ন

শাসকরা শাসন করতেন। শাসক ছাড়া আরও অনেকেই ভারতে অভিবাসী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সাধু-সন্ত, বণিক, পন্ডিত ও সাধারণ সৈনিকরা ছিলেন। ইসলামের দু'টি ধারা ছিল ঃ একদিকে কঠোর অনুশাসনসম্মত কোরান ও হাদিসের মতবাদ, অন্যদিকে মরমিয়া ধারার সুফি ও সাধু-সন্ত গণ। এ শেষোক্ত ধারাই ছিল তাঁদের পথ-নির্দেশক নীতি। একবার তাঁরা যখন এখানে স্থায়ী হলেন তখন তাঁদেরকে জীবিকারও সংস্থান করতে হলো। বিয়ে করে তাঁদেরকে সংসারী হতে হলো। এর অর্থ হলো খাবার ও পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান করা। থাকার জন্য তাঁদেরকে ঘর তৈরি করতে হলো। মানুষের সাথে তাঁদেরকে মিথস্ক্রিয়া করতে হলো। এ সব কিছু মিলে একটি নতুন পরম্পরার উত্থান ঘটলো। গাজীপুর কিংবা মোজাফ্‌ফরপুর ইত্যাদি জায়গার নাম যুগচেতনাকেই নির্দেশ করছে। যেখানে গাজী, মোজাফ্‌ফর শব্দগুলোর উৎস আরবীয়, সেখানে পুরী হলো সংস্কৃত শব্দ। নতুন খাদ্যাভ্যাস, নতুন দালান, নতুন ভাষা, নতুন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সূচনা হলো। বস্তুত, অধিকাংশ শাসকেরাই এ পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেননি। এ সব পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁরা গভীরভাবে সন্দিহান ছিলেন। অনেক সময় তাঁরা মুসলমান বা হিন্দু ধর্মপ্রচারকদের ধর্মদ্বেষীতার অভিযোগে শাস্তি দিয়েছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের তাঁরা অবজ্ঞা করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা রূপায়িত এ লোকপ্রিয় সংস্কৃতি শানকদের চাইতেও অনেক শক্তিশালী ছিল। এ সব ঘটনার কিছু কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

খাদ্য ও পোশাক

ময়দা থেকে তৈরি করা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার 'রুটি' যা ভারতীয়রা খেয়ে থাকে, একটি তুর্কী শব্দ। এর অর্থ হলো, অত্যন্ত জনপ্রিয় ভারতীয় খাবারের উৎস তুর্কী ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রোথিত হয়ে আছে। উত্তর ভারতে জনপ্রিয় জলখাবার হলো 'জিলাবী', 'কচুরী' এবং 'আলুর সবজি'। 'জিলাবী' তুর্কীরা নিয়ে এসেছে। প্রাচীন ভারতীয়রা 'কচুরী' উদ্ভাবন করেছেন আর ইউরোপীয়রা আমেরিকা থেকে 'আলু' এনেছে। আমাদের সান্ধ্যকাল 'হালুয়া', 'সমোসা' এবং এক কাপ 'চা' ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তুর্কীরা 'হালুয়া' আর 'সমোসা'র প্রচলন ঘটান। চীনারা 'চা' আবিষ্কার করেছেন। আর বৃটিশরা ভারতে চা-এর প্রচলন ঘটান। তুর্কীরা ভারতে 'পরটা'র উদ্ভাবন করেন। 'বিরিয়ানী', 'কাবাব' এবং এ জাতীয় আরও অনেক মুখরোচক আমিষজাতীয় খাবার এ সব বহিরাগতরাই প্রচলন করেছিলেন।

আজকের দিনে যখন একজন কেতাদুরস্ত মেয়ে 'সেলোয়ার', 'শেমিজ' ও 'দোপাট্টা' গায়ে বেরিয়ে আসে তখন সে আমাদের দু'টি ঐতিহ্যের মিশ্রণেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। যেখানে 'সেলায়ার' আর 'শেমিজ'-এ তুর্কী ও পারস্যীয় ঐতিহ্য, সেখানে 'দোপাট্টা' এসেছে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে।
লোকপ্রিয় ধর্মীয় পরম্পরা বা ঐতিহ্য

প্রতিটি মানব সম্প্রদায়ে বেশ কিছু মানুষ আছেন যাঁরা বৃহত্তর বিচার্য বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন যেমন, ''জীবন কি?'' ''কারোর মৃত্যু হলেতার কী হয়?'' ''কোনটা সাধুতা, কোনটা অসাধুতা?'' আধ্যাত্মিক লোকেরা বিভিন্ন সময়ে এ সব প্রশ্নের উত্তর নিজেদের মতো করে দিয়েছেন। সাধারণত এঁদের ছোট্ট একটি অনুসারী দল থাকে। তবে, ইতিহাসের কোন এক পর্যায়ে একটি সম্প্রদায়ের জীবনে এ সব বিচার্য বিষয়গুলো এত সঙ্গিন হয়ে উঠে যে এগুলো ব্যাপক মানুষের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়েই লোকপ্রিয় ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর আবির্ভাব ঘটে। প্রথম সহস্রাব্দের পর উত্তর ভারতে চারি বর্ণের শ্রেণী কাঠামো ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঐতিহ্যে পরিণত হয়। ১০ম শতাব্দীর পর বিশাল এলাকা চাষাবাদের অধীনে নিয়ে আসা হয়। অভিবাসী 'জাঠ' সম্প্রদায়ের লোকেরা এ সব জমি আবাদ করেছিল। অনেক জায়গায় বনবাসীরাও চাষাবাদে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে আদিবাসীদের শক্ত ঐতিহ্য 'সাম্য' ছিল। এভাবে যখন নব্য কৃষকদের আবির্ভাব ঘটেছিল ঠিক সে সময়ের পটভূমিতেই নব্য ধর্মীয় ঐতিহ্যেরসূচনা ঘটে। এ সময়ে ইসলাম তার সাম্যের বাণী নিয়ে ভারতে এস পৌঁছে এবং স্বদেশী ঐতিহ্য ইসলামের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে ধর্মে মহান সব পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। আমরা যদি নানক, কবীর, রাইদাস, দাদু ইত্যাদি সাধুজনদের প্রচারিত ধর্ম পড়ে দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে, তাঁদের মধ্যে একটা জিনিসের মিল রয়েছে। তাঁরা সকলেই মানুষের সমতার কথা বলেছেন।তাঁদের প্রচারিত ধর্ম অধ্যয়নে দেখা যায় তাঁরা সকলেই ইসলামী পরম্পরার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এগুলোর মধ্যে শিখ ধর্ম অত্যন্ত সুপরিচিত। শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গুরুগ্রন্থ সাহেব'-এ কিছু স্তবক রয়েছে যেগুলো মুসলিম সাধক বাবা ফরিদ রচনা করেছেন। সাধক কবীরকে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। সাম্যের উপর প্রবলভাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি সম্ভবত ইসলামী পরম্পরা থেকে এসেছে। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর ও ভক্তি বিষয়ে তাঁদের ধারণা স্পষ্টতই ৬ষ্ট ও ৭ম শতাব্দীতে তামিলভাষী অঞ্চলে বিদ্যমান ঐতিহ্য থেকেই এসেছে। এ ভাবে সাধু পুরুষেরা দু'টি পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের অনুপম মিশ্রণের প্রতীক ছিলেন। সাম্যের শক্তিশালী আদিবাসী ঐতিহ্যধারী নব্য-কৃষককূলের কাছে এ সব সাধকদের শিক্ষা আকর্ষণীয় হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে এবং তাঁরা এ সব গুরুদের গ্রহণ করেছেন। যৌগ সংস্কৃতির এ উত্তরাধিকারই 'সত্যনারায়ণ কথা'-এর মতো লোকপ্রিয় উপাসনায় পরিদৃষ্ট হয়। এ 'কথা' যত না সত্যনারায়ণের কাহিনীর দ্বারা ঠিক ততখানিই পূর্ব বাংলার সত্য পীর-এর কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত।

মুসলমান সাধক যারা ভারতে এসেছিলেন তাঁরাও এদেশীয় ঐতিহ্যকে জানতে উদগ্রীব ছিলেন। স্বদেশী ও ইসলামী ধর্মীয় পরম্পরার মিশ্রণের যে ইসলামী সংস্করণ তার প্রতীক মঈনউদ্দীন চিশতী ও নিজামউদ্দীন আওলিয়া। কোন সাধকের সমাধিতে প্রার্থনা করা ভারতের বাইরের ইসলামের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সাধু-সন্তদের কবরস্ত করা ও তার চারপাশে মন্দির নির্মাণের যে ধারণা তার সঙ্গে হিন্দুরা সুপরিচিত। আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে গান করা অ-ভারতীয় ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ঈশ্বরের প্রশংসা করে গান পবিেশন করা হিন্দুদের দীর্ঘ ঐতিহ্য। কাওয়ালী একটি জনপ্রিয় ধরনের গান, সুফিদের উপাসনার স্থান থেকেই এ গানের উদ্ভব ঘটে। খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন কালে (উর্‌শ) তাঁর মাজার অসাধারণ কাওয়ালী গানের কেন্দ্রে বা আসরে পরিণত হয়। দিল্লীতে নিজামউদ্দীন আওলিয়ার মাজারও অনুরূপ একটি কেন্দ্র। গানগুলো উর্দ্দুতে গাওয়া হয় কিন্ত এগুলো পার্‌সী কাব্য সাহিত্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরের মতো জায়গাগুলোতে মুসলমান সুফিদের সর্বাধিক শক্তিশালী পরম্পরার নাম হলো ঋষি সিলসিলা। ঋষি একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হলো সাধক। লোকেরা যখন এ সব সাধকদের দর্শনে আসেন তখন এটা তাঁদেরকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা দান করে। সাধক পুরুষ হিন্দু না মুসলমান এটা তাঁদের কাছে তুচ্ছ বিষয়। তাই গুরু নানক ও নিজামউদ্দীন আওলিয়ার ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে অনুসারী রয়েছে। হাসান ও হোসেনের প্রাণ বিসর্জনের মূর্ত প্রতীক তাজিয়া মিছিল ভারতের বাইরে অজ্ঞাত। এটি হিন্দুদের রথ উৎসব থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। দিল্লীর রামলীলা মুসলমান কারিগররাই তৈরি করে থাকেন। তামিলনাড়ু ও কেরালার লোক ও ঐতিহ্যবাহী তেরুকুথু এবং কথাকলি নামের গান ও নাচ-শিল্পে মুসলমান সঙ্গীত শিল্পিদের অংশগ্রহণকে থোড়াই মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সত্য হরিয়ানা, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের সোয়াং (Swang), খেয়াল (Khyal) ও নাচ-এর (Nach) ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। এ সব অনুষ্ঠানে বেশ ভাল সংখ্যক মুসলমান গায়ক, সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও অভিনেতারা রয়েছেন। রাজস্থানের লাঙ্গা ও মাঙ্গানিয়াররা তাঁদের নিজস্ব লোক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অসাধারণ উৎকর্ষতার নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকেন। তথাপি এঁদেরকে চেহারায়, পোশাকে কিংবা ভাষায় রাজস্থানের হিন্দু আদিবাসী শিল্পীদের থেকে কদাচিৎ আলাদা করা যাবে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদী ঐতিহ্য

ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদী ঐতিহ্য বিশ্বের কাছে ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে সৃজনশীল উপহারসমূহের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। এ ঐতিহ্যর মধ্যেই আমরা হিন্দু ও মুসলমান পরিচিতি বা স্বরূপত্বের সবচেয়ে সুন্দর যৌগের দেখা পাই।

রাগ

সেতার ও তবলার উদ্ভাবনে আমীর খসরুকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। জনৈক ওস্তাদ সরোদ উদ্ভাবন করেন।

সবচেয়ে জনপ্রিয় ধ্রুপদী কণ্ঠসঙ্গীত হলো খেয়াল ধাঁচের গান। ১৬শ শতাব্দীতে এই ধরনের গানের সূচনা ঘটে। ধ্রুপদী গানের পূর্বেকার ঐতিহ্য ধ্রুপদরীতি নামে পরিচিত ছিল। ঈশ্বরের প্রশস্তি গাইতে ধ্রুপদ ঐতিহ্যের ব্যবহার ছিল বেশি। এমনকি কিছু কিছু পরিবার গানের এ ঐতিহ্য এখনও ধরে রেখেছে। এ পরম্পরার সর্বাধিক পরিচিত গায়করা হলেন আমীনউদ্দীন ও মঙ্গনউদ্দীন দাগার। শীবের প্রশস্তিতে গাওয়া তাঁদের গান শ্রোতাদেরকে গভীরভাবে আপ্লুতকরতো।

ধ্রুপদও পারস্যীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে খেয়াল গানের ঐতিহ্যের উদ্ভব হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ঘরানা রয়েছে যাঁরা স্বতন্ত্র রীতিতে খেয়াল গান করে থাকেন। এ সব ঘরানা গুরু-শিষ্যের পরম্পরা ধরেই গান করে থাকেন। এ কারণে গোয়ালিয়রের অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতমঘরানার প্রবক্তা হিসেবে আমরা পন্ডিত কৃষ্ণরাও শংকর ও মোস্তাক হুসেইন খানকে দেখি। জয়পুর ঘরানার মহান প্রবক্তারা হলেন পন্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুর ও রজব আলী খান।

ধ্রুপদী ধাঁচ থেকে উদ্ভূত লঘু ধ্রুপদী সঙ্গীতেও এ ধরনের একটি মিশ্রণ দেখা যায়। রসুলান বাঈ-এর কাজরী, চৈতী ও হরি (হোলির গান) ইত্যাদির কোন তুলনা হয়না। ভজনের কথাই যদি ভাবা হয় তাহলে বড়ে গোলাম আলী খানের 'হরি ওম তাৎসাৎ' গান এ জাতীয় গানের মধ্যে অসাধারণ।

যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আলাউদ্দীন খানের মাইহার ঘরানা অসাধারণ।সেনিয়ারা নিজেদেরকে মিয়া তানসেনের বংশধর বলে দাবি করেন। আলাউদ্দীন খান পন্ডিত রবি শংকরকে সেতার বাদন শিখিছিলেন। যখন কেউ রবি শংকরের সেতার, আলী আকবর খানের সরোদ কিংবা হরি প্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশি শোনেন তখন তাঁরা সেনিয়া ঘরানার সঙ্গীতকেই শুনে থাকেন।প্রায় সকল ঘরানার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান গায়ক-গায়িকারা রয়েছেন। দেবী স্বরস্বতীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রার্থনা দিয়েই সাধারণত গানগুলো শুরু হয়। আলাউদ্দীন খান কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। বিসমিল্লা খানকে কে ভুলতে পারেন? হিন্দুদের অসংখ্য বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর সানাইয়ের রেকর্ডিংগুলো অনুরণিত হয়ে থাকে। (বস্তারিত তথ্যের জন্য ৪৪-৪৮ পৃষ্ঠায় যে সব পাঠ্য বিষয় রয়েছে সেগুলো দেখুন)

নাচের ঐতিহ্য

কথক

কথক উত্তর ভারতের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় নৃত্য। কথক শব্দটি 'কথা' বা 'গল্প' নামক শব্দ থেকে উদ্ভূত। এটি আদিতে একটি একক নৃত্যকলা ছিল। প্রতিটি শিল্পী আবৃত্তি ও বর্ণনামূলক ধারাভাষ্যের মাধ্যমে শ্রোতৃমন্ডলীর সঙ্গে যে সম্পর্ক তৈরি করেন সেটি এ নৃত্যের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য। অতীতে ভারতে দীর্ঘকাল ধরে চারণ কবিরা পৌরাণিক/পুরাণের কাহিনীগুলোকে গ্রামীণ শ্রোতাদের কাছে বর্ণনা করে বা নেচ-গেয়ে প্রদর্শন করে এসেছেন। প্রায়শই তাঁরা তাঁদের কাহিনীগুলো মহাভারত এবং রামায়ণ নামক মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনী, বিশেষ করে, প্রভূ কৃষ্ণ ও পবিত্র ভূমি বৃন্দাবনে তাঁর যে রসলীলার কাহিনী তা থেকে নিয়েছেন।

মধ্যযুগে মোঘলরা এ নাচকে রাজসভার চৌহদ্দি বা পরিমন্ডলে নিয়ে আসেন। পোশাক ও অলঙ্কারের অকৃপণ সজ্জায় সজ্জিত রাজসভার নর্তকীরা তাঁদের কাব্যিক বর্ণনা,সুক্ষ রসজ্ঞান ও মার্জিত সৌন্দর্য দিয়ে রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করতেন।১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লক্ষ্মৌ-এ অবস্থিত ওয়াওজদ আলী শাহ্-এর রাজসভাতেইকথক নৃত্য বর্তমান রূপ ধারন করে। একদিকে কৃষ্ণ লীলার (তরুণ কৃষ্ণের প্রণয়ঘটিত লীলা) অন্তর্ভূক্তিতে এ নৃত্যের ভক্তিমূলক ভাবরাজির এক নতুন উপলব্ধি সষ্টি হলো যে, এ লঘু-ধ্রুপদীর কণ্ঠরূপঠুমরী সহযোগেও করা যায়। অন্যদিকে, রাজসভার অঙ্গসজ্জা-শৈলীর মার্জিত রুচিসমৃদ্ধ নিখুঁত সৌন্দর্য, নৃত্য পরিবেশনার গুণমানকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে কথক হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির একটি সুক্ষ মিশ্রণে দাঁড়িয়ে গেল যেখানে হিন্দুদের মূল মহাকাব্যের কাহিনীসহ পার্সী ও উর্দ্দু কবিতার বিষয়বস্তুসমূহ চিত্রিত বা বর্ণিত হতো।

আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের ঐতিহ্য

আধুনিক যুগে থিয়েটার পুনরুজ্জীবনের কৃতিত্ব আগা হাসান আমানত-এর। তাঁর রচিত ও ১৮৫৬ সালে মঞ্চস্থ ইন্দ্রসভা নাটক কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে ভারতে থিয়েটারের বীজ বপন করে। জনশ্রুতি রয়েছে, লক্ষ্মৌ-এ ওয়াজেদ আলী শাহ্, যিনি নিজেই একজন কবি ও সুরকার, কথক-এর স্রষ্টা এবং রাসলীলা বিষয়ে একজন উদ্ভাবক ছিলেন, তাঁর দরবারে প্রথম এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। বস্তুত, ওয়াজেদ আলী শাহ্-এর রাজদরবারে নিয়মিত অনুষ্ঠিত রাসলীলা-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমানতের গীতিনাট্যগুলো কবিতার ছন্দে বা পদ্যের আকারে রচিত হয়েছিল।

পার্সী থিয়েটার

ভারতের থিয়েটার আন্দোলনে পার্সী থিয়েটার আন্দোলন মর্যাদার স্থান দখল করে আছে। ১৮৫০ সাল থেকে শুরু করে পার্সী থিয়েটার ভারতীয় কাহিনীগুলোকে বিভিন্ন রূপে থিয়েটারে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে আসছে। ১৯৩০ সালে ভারতীয় সিনেমার সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি বিকশিত হয়েছিল। পার্সী থিয়েটারকে ঘিরে পুরো একদল তরুণ মুসলিম নাট্যকারদের উত্থান ঘটেছিল। রওনক, বেতাব, রুসওয়া, হাফিজ আবদুল্লাহ্ তালিব, হুবাব, জারিফ, আরাম, খুরশিদ এবং আরও অনেকেই প্রায়শই পুরাণ

এবং অন্য দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে সফল নাটক সৃষ্টি করতে লাগলেন। পার্সী থিয়েটারের সর্বাধিক পরিচিত নাট্যকারের নাম হলো আগা হাসান কাশ্মিরী। তাঁর রচনার ক্ষেত্র তাঁর নিজের রুস্তম-ই-সোহ্রাব-এ বর্ণিত ফেরদৌসের পারস্যীয় মহাকাব্য শাহ্নামার কাহিনী থেকে শুরু করে হিন্দু ধর্মের কিংবদন্তীর কাহিনী যেমন, শূদ্রদের জীবন নিয়ে চিত্রিত বিল্বমঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সব নাট্যকাররা ফরাসী অপেরার দ্বারাবিশেষ ভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তবে তাঁরা নাট্যশাস্ত্রেরঅনুলিপিও তাঁদের সাথে রাখতেন।

যখন টকি সিনেমার নির্মাণ শুরু হলো, অনেক অভিনেতা, অভিনেত্রী সিনেমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেন। ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে বহু ভাষায় নির্মিত ছায়াছবিগুলো পার্সী থিয়েটারকে অনুকরণ করেই নির্মিত হয়েছে। প্রাচীনকালে আমাদের দেব-দেবী, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের ব্যবহৃত পোশাকের ধারণার পুরোটাই পার্সী থিয়েটার থেকে গৃহিত হয়েছে। টেলিভিশনে রামায়ণ ও মহাভারত ভিত্তিক সিরিয়ালগুলোতেও একই ঐতিহ্য অনুসৃত হচ্ছে।

হাবিব তানভিরের মতো নাট্যকারেরা একই নৃত্য-গীতের ঐতিহ্যের অনুসারী। তাঁর লিখিত নাটকগুলোর মধ্যে অগ্র বাজার, এবং চরণ দাস চোর ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম কালিদাসের শকুন্তলা, বিশাখাদত্তের মুদ্রারাক্ষস ওভবভূতির উত্তর রাম চরিত রয়েছে।
ভাষা

একটা বিন্দুতে এস মিলিত হওয়াটাই ভারতীয় ঐতিহ্যের উৎকৃষ্টতর নিদর্শন। বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণের সুস্পষ্ট উদাহরণ ভাষার ক্ষেত্রেই বেশি লক্ষ্য করা যায়। মেরে চাচা রিটার্ণ কর রাহে হ্যাঁয় (আমার চাচা ফিরে আসছেন) এ সাধারণ বাক্যটিতে সংস্কৃত (মেরে), তুর্কী (চাচা), এবং ইংরেজী (রিটার্ণ) শব্দ রয়েছে। ভারতীয় ভাষাসমূহের বাক্য গঠন এমনই যে, তা সহজেই বিদেশি ভাষাকে আত্মস্থ করতে পারে। উত্তর ভারতীয় ভাষাসমূহ বিগত সাতশত থেকে আটশত বছরের বিবর্তনের ফসল। আজ যে সব শব্দ আমরা ব্যবহার করি সেগুলোর অধিকাংশেরই উৎপত্তি ছিল প্রাচীনকালে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের পবিত্রতম নদী গঙ্গা নামের উৎপত্তি সংস্কৃত ভাষা থেকে নয়। এ নামের উৎপত্তি অজ্ঞাত এক মুন্ডারি ভাষা থেকে। চাউল শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ১৩শ শতাব্দী ছিল এ সব ভাষার নির্দিষ্ট আকার ধারনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এ সময়টাকে ভারতে তুর্কী শাসকদের আগমনের সাথে সম্পর্কিত করা যায়। এ সব শাসকেরা পারস্যীয় ও আরবীভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। পার্সী প্রশাসনিক ভাষা হওয়াতে দেশীয় ভাষীরাও এ ভাষা রপ্ত করে। মারাঠারা আওরঙ্গজেবের সাথে যুদ্ধ করলেও পার্সী ভাষাকে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে বলবৎ রাখে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ সব ভাষার মিথস্ক্রিয়া হিসেবেই হিন্দি ভাষার সৃষ্টি হয়। প্রথম যে ব্যক্তি হিন্দি ভাষার সৌন্দর্যে গর্বিত ছিলেন তি হলেন আমী খসরু। আজকে আমরা যে হিন্দি ভাষায় কথা বলি সেটার গঠন সংস্কৃত ভাষার মতো হলেও এ ভাষার মধ্যে ব্রজ, আওয়াধী, ভোজপুরী, আরবী ও পার্সী শব্দের বিস্ময়কর মিশ্রণ রয়েছে। আসুন, আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত কিছু শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করি।
আরবী থেকে উদ্ভূত শব্দ

আমরা যখন আদমী বা ইনসান শব্দ ব্যবহার করি তখন আমরা আরবী শব্দই ব্যবহার করি।আকল (বুদ্ধি) বৃদ্ধির জন্য এ সব মানুষদের কিতাব (বই) পড়া উচিত ও কলম (লেখনি) দিয়ে লেখা উচিত। এরূপ মানুষদের ইনসাফের (ন্যায়) জন্য যুদ্ধ করা উচিত এবং কখনই জালিম (নিষ্ঠুর মানুষ)-এর জুরমা (আপকর্ম) মেনে নেওয়া উচিত নয়। মহব্বতের (ভালবাসা) বিস্তারে আমাদের সহায়তা করা উচিত এবং কখনই ওয়াদা (প্রতিজ্ঞা) ভঙ্গ করা উচিত নয়। শরাফত (সাধুতা) সব সময়ই পুরস্কৃত হয় এবং গাদ্দারী (বিশ্বাসঘাতকতা) সব সময়ই শাস্তি পেয়ে থাক- এটাই সকল হিন্দি ছবির কিস্সা (কাহিনী)।

এ পৃথিবীতে (দুনিয়া) সময় (ওয়াক্ত) এবং জোয়ার কারোর জন্য অপেক্ষা করেনা। সকলের জন্য মৃত্যু (মউত) অবধারিত, তার জন্য দুঃখ (গাম) করে লাভ নেই। দিল্লীতে গ্রীষ্মে পরিষ্কার (সাফ) জলের এক গ্লাস শরবতের মতো আর কিছু হয়না, নতুবা তার জন্য দাওয়া (ঔষধ) নিতে হবে। এ দেশের আমীরদের (ধনী) গরিবদের (দরিদ্র) জন্য কোন মাথা ব্যথা নেই। সবজি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। তেমনি খোলা মাঠে (ময়দান) হাঁটাও ভাল।

পার্সী থেকে উদ্ভূত শব্দ

ইনকিলাব জিন্দাবাদ (বিপ্লব চিরজীবি হউক) শ্লোগানটি যে পার্সী-আরবী থেকে উদ্ভূত এটা ঘূর্ণাক্ষরে না জেনেও ভগৎ সিং-এর অনুকরণে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এ শ্লোগানটি উচ্চারণ করেছে। বিপ্লবীরা একদিন স্বপ্ন দেখবে যে, আকাশ (আসমান) যেমন তেমনি পৃথিবীও (জমিন) একদিন আমাদের হবে।

বাড়িতে আমরা খবরের (আকবর) কাগজ পড়তে পছন্দ করি। তবে মনে হচ্ছে দামটা (কিমত) প্রতি বছর বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ির লোকেদের আয়ই (আমদানি) তাদের ব্যয় (খরচা)। তাঁরা ক্রমশ কম পুষ্টিকর খাদ্য কিনতে (খরিদ) পারেন যার ফলে তাঁদের অসুখ (বিমার) হয়। স্বাস্থ্যের (সেহাত) যত্ন নেওয়া উচিত। তাঁরা তাঁদের পোশাক (লেবাস, জামা,পাজামা,সালওয়ার,শেমিজ) কিনতে পারেননা। বস্তিগুলোতে খোলা জায়গা (ময়দান) ও বিশুদ্ধ বাতাস (হাওয়া) না থাকায় বিভিন্ন রোগের (বিমার) ডিপোতে পরিণত হয়। শিশুদের (বাচ্চে) সাধারণত রোগের ঝুঁকি বেশি। এ জন্য তাতের অবস্থা (হালত) খারাপ (খারাব) হতে থাকে। কিন্তু দরিদ্রদের (গরিব) ব্যথা (দর্দ) বোঝার মতো মন (দিল) শাসকদের নেই। যুগের (জমানা) পরিবর্তন হবে যদি আমরা একতাবদ্ধ হইএবং শোষণের (জুলমা)

শৃঙ্খল (জঞ্জির) ভাঙতে আমরা আমাদের শক্তি (তাকত) ব্যবহার করি। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো একটি সমাজ যা বন্ধুত্বের (দোস্তি) উপর প্রতিষ্ঠিত। ইচ্ছা (চাহ্) থাকলে উপায় (রাহ্) হয়। শাসকদের (হাকিম) কাছে এ প্রশ্নগুলো (সওয়াল) করা উচিত।

জীবনটা শুধু ধন (দৌলত), চাকুরি (নওক্‌রি) এবং বাড়িওয়ালার বাড়িভাড়া (কিরায়া) নয়। সকাল (শুভা) ও সন্ধ্যা (শাম) আমরা যদি এ সব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি তাহলে জীবনের যাদুময়তাই (যাদু) হারিয়ে যাবে। দেশকে (মুলক্) নিয়েও চিন্তা করা উচিত।

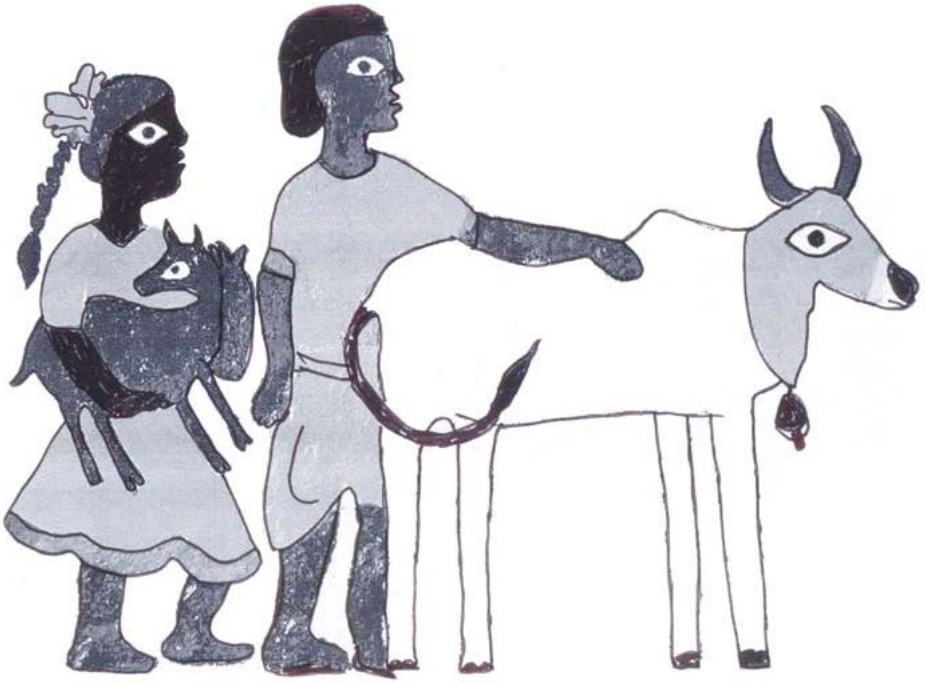

নোটসমূহ ঃ

অনুশীলন - ৪

বিভিন্ন ধরনের কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যের অনুসন্ধান (মতের সৃজনশীল প্রকাশ)

উদ্দেশ্য:
অংশগ্রহণকারীদেরকে বিভিন্ন ধরণের "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যের" মধ্যে সর্ম্পক খুজে বের

প্রক্রিয়া:

- বিমিশ্র ঐতিহ্যের (কম্পোজিট হেরিটেজ) বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্য এটি একটি পরীক্ষামূলক অধিবেশন।
- এটি একটি স্বতঃপ্রণোদিত (ভলান্টারী) অনুশীলন। অংশগ্রহণকারীগণ হয়ত সম্পূর্ণরূপে অধিবেশনটি উপভোগ করবে।
- এই অধিবেশনটি সমাপ্তির জন্য বেশ সময় লাগবে, তাই সহায়ককে সময়ের ব্যাপারে নমনীয় থাকা বাঞ্ছনীয়।
- অংশগ্রহণকারীরা যত বেশী সম্ভব বিভিন্ন প্রকারের সমন্বিত ঐতিহ্য উপস্থাপন করতে চায়, তার জন্য তাদের উৎসাহিত করা উচিত।
- যৌথ/ দলীয়ভাবে উপস্থাপনা করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের আরও বেশী উৎসাহিত করুন।
- অংশগ্রহনকারীরা কম্পোজিট হেরিটেজের যতগুলো নমুনা বা ধরণ উপস্থাপন করেছেন তা ব্যাখ্যা করবেন এবং কেন করেছেন তা বলবেন।
- এক্ষেত্রে সহায়ক নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন-
    ১. উপস্থাপনা করার সময় আপনার অনুভূতি কি ছিল?
    ২. উপস্থাপনার পর আপনার অনুভুতি কি হ'লো?
    ৩. প্রথম দিনের অনুভূতি এবং উপস্থাপনার শেষে আপনার অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য কি?
    ৪. কল্পনা করুন, এই বিভিন্ন ধরণের সমন্বিত ঐতিহ্যের অনুপস্থিতিতে কেমন সমাজ গড়ে উঠবে?
- পরিশেষে, সহায়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর সমাজের দুই ধরনের অবস্থাকে উপস্থাপন করবেন।

অধিবেশন উপকরণ:

উপস্থাপনার প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীগণ নিজেদের ইচ্ছামত উপকরণ বেছে নিতে পারবেন।

সময়:

অর্ধ দিবস।

সহায়কদের জন্য নোটঃ

সেশনের শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি আনন্দঘন পরিবেশ তৈরী করতে হবে। সহায়ককে এমন কিছু করতে হবে যাতে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের জড়তা দুর করতে পারে।

এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ সমন্বিত ঐতিহ্যের কয়েক ধরনের নমুনা উপস্থাপন করবেন যা তারা সমন্বিত ঐতিহ্যের পূর্ববর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করেছেন।

অংশগ্রহণকারীদেরকে এটা অনুভব করাতে চেষ্টা করুন যে, তারা কাজের চাইতে বেশী মজা করছে। অংশগ্রহণকারীগণ স্মৃতি হাতরে সমন্বিত ঐতিহ্যের নাচ, গান, গল্প, নাটক, মহাকাব্য, থিয়েটার, পুতুল নাচ, লোক সঙ্গীত, উৎসব, স্থানীয় মেলা এবং এই ধরণের আরও অন্যান্য আঙ্গিকসমূহ স্মরণ করতে পারেন। সহায়ককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মানুষ স্বভাবতই পুরানো ঐতিহ্যের প্রতি টান অনুভব করে, মানুষ তার পুরানো ঐতিহ্যের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়। কখনো কখনো পুরোনো স্মৃতি মধুর না হলেও মানুষ তা নিয়ে থাকতে চায় এবং সুখ অনুভব করে।

তাই সহায়ককে, অংশগ্রহণকারীগণদের উৎসাহিত করে তুলতে হবে যাতে তারা তাদের পুরানো স্মৃতি মনে করতে পারে এবং অংশগ্রহণকারীগণ তাদের স্মৃতিগুলো আগ্রহভরে উপস্থাপনা করতে পারে এবং তাদের এ উপস্থাপনা দেখে অন্যরা যেন আরও প্রভাবিত হতে পারে।

এই অধিবেশনে আমরা দেখবো যে, বিমিশ্র ঐতিহ্যের যে বিভিন্ন ধরন বা নমুনাগুলো দলগত পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছে সেগুলো তাদের স্ব স্ব এলাকায় গড়ে উঠেছিল এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়েছে। এটি সম্ভব যে এই নমুনাগুলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক দলকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভূমিকা পালন করছে। এই চর্চার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও আদর্শ নির্বিশেষে মানুষ মিলেমিশে বসবাস করেছে। এই অনুশীলনী শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির যোগসূত্র খুঁজে পাবে।

কোন কোন অংশগ্রহণকারী মনে করতে পারেন যে সমন্বিত ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারণা/প্রকারভেদ হয়তোবা ঐতিহাসিক ভমিকা পালন করেছে যার বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোন ভূমিকা নেই। অনেকেই ধারণা করতে পারেন যে সমান্বত ঐতিহ্যেও এই নমুনাগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক। অন্যরা ভাবতে পারে যে এই নমূনাগুলোর কম প্রসঙ্গিকতা সত্ত্বেও এগুলো সংরক্ষিত হওয়া দরকার। অনেকে ভিন্নমত পোষন করে বলতে পারেন যে আমরা আধুনিক যুগে বাস করি। আধুনিক যুগের প্রয়োজন উপযোগী চিন্তা ও ধারণা আমাদের আছে তাই প্রয়োজন না থাকাসত্ত্বেও অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা কি ঠিক হবে?

একজন সহায়ককে অবশ্যই শিখন উপকরণগুলো ভালো করে পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং নির্দেশনা দিতে হবে। যেহেতু সব বিষয়গুলো একবারে দেখা ও বোঝা সম্ভব নয় তাই অংশগ্রহণকারীগণকে পড়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া দরকার যাতে তার শিখন উপকরণগুলো পড়তে পারে এবং বড়দলে প্রশ্ন করতে পারে। বক্তৃতা পদ্ধতির চেয়ে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বেশী কার্যকরী। অনুশীলনীর শেষে সহায়ক অনুধাবন করতে পারবেন যে আমাদের সমন্বিত ঐতিহ্যের যে ধারণা রয়েছে তাতে তারা নুতন মাত্রা ও নমুনা যোগ করতে পেরেছেন।

এই প্রক্রিয়ায় সহায়ক এবং অংশগ্রহণকারীগণ উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে শিখতে পারবেন। অংশগ্রহণকারিদেরকে নিয়ে সহায়ক যে অধিবেশন পরিচালনা করবেন তাতে সমন্বিত ঐতিহ্যের তালিকা আরো সমৃদ্ধ হবে।

সহায়ক নোটঃ

সহায়ককে এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা লাভের জন্য অবশ্যই সেশন উপকরণ ১,২,৩,৪,৫ এবং৬ (পৃষ্ঠা ৩৭-৫৬) পড়তে হবে ও অনুধাবন করতে হবে।

পাঠ্য উপকরণ ১: মেলা ও উৎসবসমূহ

দক্ষিণ এশিয়ায় সাধারণতঃ যেসব মেলা এবং উৎসবসমূহ অনুষ্ঠিত হয় তার অধিকাংশই ধর্মভিত্তিক। তবে এটা অনেকেই পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নেন না। মেলা এবং উৎসবগুলি ধর্মভিত্তিক হলেও এর সাথে লোক সংস্কৃতি, স্থানীয় প্রথা ও রীতি-নীতি, ঋতু পরিবর্তনজনিত অনুষ্ঠান, ফসল উত্তোলনজনিত অনুষ্ঠান, ইত্যাদি সম্পর্কযুক্ত। ধর্মীয় ভিন্নতা সত্বেও এর অধিকাংশই সাধারণ মানুষের সাথে একীভূত।

দক্ষিণ এশিয়ার মেলা এবং উৎসবসমূহ এর মৌলিকত্ব এবং সংখ্যার দিক থেকে অনেক বৈচিত্রপূর্ণ। এগুলো দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন-যাত্রার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন-যাত্রায় একতা এবং সার্বজনীনতা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা বিভিন্ন মেলা এবং উৎসবের মাধ্যমেই উদ্‌যাপিত হয়। নিম্নে দক্ষিণ এশিয়ায় মেলা এবং উৎসবসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হ'লো।

১. যদিও দক্ষিণ এশিয়ায় মেলা এবং উৎসবসমূহের সবগুলির উপর উচ্চ ধর্মীয় মতবাদের কতৃত্ব নেই, তবুও এগুলির সাথে আন্তঃ ধর্মীয়-সামাজিক বিষয় জড়িত। প্রত্যেকটি মেলা বা উৎসবের মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। যথা- একটি ধর্মীয় প্রার্থনা এবং অপরটি উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ধর্মীয় প্রার্থনা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- হোলি, দেওয়ালী, রাম নবমী, ইত্যাদি তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিশ্বাসের অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেব দেবীর প্রার্থনা। ঈদের দিন মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনার অংশ। বড়দিনে চার্চে গিয়ে প্রার্থনা খ্রীস্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু ধর্মীয় আবেশ সত্বেও মেলা এবং উৎসবসমূহে অংশগ্রহণ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি সবার, সকল বিশ্বাসের মানুষের। দক্ষিণ এশিয়ায় হোলি, দেওয়ালী, রাম নবমী, ঈদ, বড়দিন, বৈশাখ উদ্‌যাপন ইত্যাদিতে সকল বিশ্বাসের মানুষের অংশগ্রহণে কোন বাধা নেই। সুতরাং ধর্মীয় শক্তিশালী প্রেক্ষাপট থাকা সত্বেও সকল মেলা এবং উৎসবসমূহে সবধর্মের মানুষের দায়বদ্ধতা, সার্বজনীনতা ও অংশগ্রহণ রয়েছে।

২. দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ মেলা এবং উৎসবই মৌশুমভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এগুলি মৌশুমভিত্তিক ফসল উত্তোলনের ভিন্নতার নিদর্শনস্বরূপ। প্রায় সকল মেলা এবং উৎসবসবগুলিই ফসল উত্তোলনের দু'টি মৌশুমকে কেন্দ্র করে উদ্‌যাপিত হয়। যথা- রবি মৌশুম (মার্চ-এপ্রিল) এবং খরিপ মৌশুম (আগষ্ট- অক্টোবর)। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, যেমন- বিজু (জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়), ওনাম (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর), পাঙ্গল (জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়), ভাষান পঞ্চমী (ফেব্রুয়ারী), মকর সংক্রান্তি (জানুয়ারী), লহরী (জানুয়ারী), বৈশাখী (এপ্রিল), ইত্যাদি যা কৃষিভিত্তিক ফসল উৎপাদন ও উত্তোলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং ধমীয় ভিন্নতা থাকা সত্বেও সকল মেলা ও উৎসবের মধ্যে সর্বদাই কিছু ঐক্যবদাধতা খঁজে পাওয়া যায়।

৩. এসব মেলা এবং উৎসবসমূহ কৃষিজাত ফসল উত্তেলন সম্পকৃত হলেও এগুলোর কর্মকান্ডসমূহ অনেকাংশেই অসাম্প্রদায়িক এবং সার্বজনীন। যেমন- মকর সংক্রান্তিতে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা একটি বিশেষ বিষয়। বিজু উৎসবে "বিজু নৃত্য" একটি বড় আকর্ষণ। তেমনি "কথাকলি নৃত্য" ওমান উৎসবের একটি উপাদ্য বিষয়, যা ভারতবর্ষের অত্যন্ত জনপ্রিয় উচ্চাঙ্গ অঙ্গের নৃত্য। ওমান উৎসবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো- নৌকা বাইচ বা ভালুমকালী। এতে বিশেষ নৌকায় ১০০ জন মাল্লা ড্রামের তালে তালে একত্রে গান গেয়ে নৌকা চালায়। লহরী উৎসবে পাঞ্জাবের অধিকাংশ জনগণ রাস্তায় নেমে আসে এবং ভাংরার সুরে নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে আনন্দে মেতে উঠে। তেমনি গুজরাটে নবরাত্রি উৎসবে গারবা নৃত্য একটি বিশেষ উপাদ্য বিষয়। এরূপ দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দুর্গাপূজায়, ভারতের উত্তর অংশে দশরা উৎসবে, ব্রাজ অঞ্চলের হোলিতে এবং মহারাষ্ট্রের গনেশ চতুর্থিতে দেখা যায়। এসব উৎসবসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মবহির্ভূত, উপাসনা বহির্ভূত, ধর্মীয় উচ্চ পর্যায়ের কতৃত্বহীন এবং সার্বজনীন কর্মকান্ডই সবক্ষেত্রে স্থান দখল করে আছে, অর্থাৎ এসবই সকলের।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মেলাগুলো ধর্মনির্ভর বৈশিষ্ট্য বহির্ভূত, কিন্তু ভারতের এলাহাবাদের কুম্ভ মেলা ধর্মীয় উপাসকদের সমাবেশ নির্ভর উৎসব। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মেলাগুলোতে নানাধরণের হস্তশিল্প, গরু, ছাগল, মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি কেনা-বেচা হয় এবং মেলাগুলি বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রমূলক কর্মকান্ডে ভরপুর থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, এসব মেলাসমূহ

দক্ষিণ এশিয়ায় বংশানুক্রমিকভাবে মানুষের আর্থ-সাংস্কৃতিক জীবনধারা উপস্থাপন করে আসছে। যদিও কিছু মেলা ধর্মীয় রীতি নির্ভর, এগুলো সম্পূর্ণই অর্থনৈতিক শিল্প বহির্ভূত।

সুতরাং দেখা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় মেলা এবং উৎসবসমূহ সর্বদাই মানুষের বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্রই ফুটিয়ে তোলে। উৎসবগুলির অধিকাংশই ধর্মীয় আবেশভিত্তিক কিন্তু সাম্প্রদায়িক কর্তৃত্ব নির্ভর নয়। উৎসবগুলি হয়তো বিশেষ কোন ধর্মীয় কর্মকান্ড থেকে উৎপত্তি হয়েছে, শুধুমাত্র এইটুকুই। উৎসব উদ্‌যাপনের প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ। উৎসবগুলিতে অংশগ্রহণে সার্বজনীনতা বৈশিষ্ট্যের অগ্রগতির মাধ্যমে ধর্মীয় বিভেদ বা ভিন্নতা কমিয়ে আনা যেতে পারে। অপরদিকে মেলাগুলি ধর্মীয় আবেশের আবরণ মাত্র এবং এগুলি দক্ষিণ এশিয়ায় আর্থ-সাংস্কৃতিক জীবন-যাত্রার ফলাফলস্বরূপ। বলতে গেলে মেলাগুলি সবই ধর্মীয় আবেশ বহির্ভূত। কিন্তু উৎসবগুলো কিছুটা ধর্মনির্ভর। দক্ষিণ এশিয়ায় মেলা এবং উৎসবসমূহ এই উপমহাদেশের মানুষের কম্পোজিট হেরিটেজ (বিমিশ্র ঐতিহ্য), সহভাগিতা এবং সার্বজনীনতাই প্রকাশ করে।

নিম্নে বংলাদেশের কিছু প্রসিদ্ধ মেলার বর্ণনা দেয়া হ'লোঃ-

লাঙ্গলবন্দের মেলাঃ

গৌরবময় ইতিহাস বিজড়িত সোনারগাঁ (সুবর্ণগ্রাম) একসময় ছিলো পূর্ববঙ্গের রাজধানী। পরে সংযুক্ত হয় ঢাকা জেলার অংশ হিসেবে। প্রশাসানিক বিকেন্দ্রীকরণে এখন এটি নারায়ণগঞ্জ জেলার অংশ। এখানে অনেকগুলি প্রচীন গ্রাম আছে, যার কোনোটি ঝিনুকের বোতাম শিল্পের জন্য, কোনোটি বস্ত্রশিল্প বিশেষ করে মসলিন/জামদানির জন্য,আর কোনোটি তীর্থস্থান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত লাঙ্গলবন্দ ও পঞ্চমী ঘাট এমনি প্রাচীন দু'টি তীর্থস্থান, যেখানে প্রতিবছর চৈত্র মাসের আশোকাষ্টমী স্নান উপলক্ষে হাজার হাজার হিন্দু পুণ্যার্থীর আগমন ঘটে। যে ব্রহ্মপুত্র নদে পুণ্যার্থীরা চৈত্র বারুণী উপলক্ষে স্নান করে থাকেন, তার সম্পর্কেও একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, মহাবল পরশুরাম লোহিত সরোবরের তীরে উঠে কুঠোরাঘাতে পথ রচনা করে ব্রহ্মপুত্র নদকে পূর্বদিকে প্রবাহিত করেন। তারপার তিনি কিছুদূর গিয়ে হেম শৃঙ্গগিরি ভেদ করে কামরূপ পিঠের মাঝ দিয়ে এই নদকে প্রবহমান করে তোলেন, স্বয়ং ব্রহ্মা এর নাম রাখেন লোহিত।

লাঙ্গলবন্দের মেলা উপলক্ষে চৈত্র বারুনী, বারুনী স্নান, অষ্টমীস্নান এবং আশোকাষ্টমী প্রভৃতি নামে পরিচিত। তবে ওইসব উপলক্ষের চেয়ে লাঙ্গলবন্দের মেলা নামটি যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছে। এখানে মেলা বসে তিনদিন। অষ্টমী স্নানের আগের দিন, স্নানের দিন এবং স্নানের পরের দিন। অষ্টমী স্নানের তীর্থযাত্রীরা এখানে পায়ে হেঁটে বা বিভিন্ন যানবাহনে চেপে আসেন। তীর্থযাত্রী ছাড়াও অনেক লোক আসেন নানা উদ্দেশ্য নিয়ে। কেউ আসেন মেলা থেকে কিছু কেনাকাটার জন্য, কেউ আসেন কিছুটা কৌতূহল নিয়ে। আজকাল সাংবাদিক ও গবেষকরাও এখানে আসেন। পূন্যার্থীদের অনেকে আসেন নানা মনস্কামনা নিয়ে।

লাঙ্গলবন্দের মেলায় মাটির তৈরি হাঁড়ি-কলসি,বাঁশ-বেত-সূতার হাতপাখার আমদানি নিতান্ত মন্দ নয়। আর ওঠে দেবদেবীর পোড়ামাটির মূর্তি এবং ছবি। পূণ্যার্থীদের কাছে এর বেশ চাহিদাও আছে। খাবার দোকান ও মিষ্টির দোকান এ সময় বেশ জমজমাট ব্যবসা করে। এখানে চড়কগাছ (নাগরদোলা), সার্কাস, পুতুলনাচে বেশ ভালো ভিড় হয়। চৈত্র বা বৈশাখ মাসেই সাধারণত এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গুড়পুকুরের মেলাঃ

প্রাচীনত্বের দিক থেকে গুড়পুকুরের মেলা তুলনামূলকভাবে লাঙ্গলবন্দের মেলার অনেক পরের। অনেকে মনে করেন বাংলা দ্বাদশ শতকের প্রতমদিকে এই মেলার সূচনা। এই মেলার ইতিহাস ও উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। গুড়পুকুর মূলতঃ সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক স্থান। সাতক্ষীরা এক সময় সুন্দরবনের মতোই বনবেষ্ঠিত ছিল। বন কেটে বসত করার ফলে এখন বন অনেক সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এইসব এলাকার একটির নাম পাওয়া যায় 'বড়ন'। অর্থাৎ ওই অঞ্চল যে জলাভূমি ছিল, তার প্রমাণ ওই নামেই পাওয়া যাচ্ছে। 'মনসা মঙ্গল' এর বেহুলা লখিন্দরের কাহিনীও এই অঞ্চলকে স্পর্শ করেছে। বেহুলা যখন সর্পদৃষ্ট মৃত স্বামীর লাশ কলার ভেলায় করে জলপথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে যে ঘাটে তাঁর দেখা হয়েছিল গোদা পাটনির সঙ্গে, সেই গোদা পাটনির নামে গড়ে ওঠে 'গোদাঘাট' নামে একটি গ্রাম। তার একমাইল দূরে আরেকটি জায়গার নাম হলো 'বেহুলার ঝোড়'। সর্পসঙ্কুল সাতক্ষীরায় বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী নিয়ে প্রতি বছরই 'মনসা পূজা' অনুষ্ঠিত হয়। এসব এলাকায় প্রতি বছরই সর্পদংশনে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। বিশ্বাস, সর্পদেবী মনসাকে পূজা করলে সাপের উপদ্রব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ তারিখে গুড়পুকুরের ধারে যে বিশাল বটবৃক্ষ ছিল, তার বাঁধানো চাতালে মনসা পূজা হয়। সেই উপলক্ষে হয় গুড়পুকুরের মেলা। গুড়পুকুরের সেই প্রচীন বটবৃক্ষটি এখন আর নেই। তদস্থলে একটি নতুন বটগাছ রোপণ করা হয়েছে। গুড়পুকুর কেন নামকরণ করা হয়েছে, এ নিয়েও একাধিক কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। গুড়পুকুর নামক এই পুকুরে নাকি একসময় মোটেই পানি থাকত না। তখন স্থানীয় কেউ স্বপ্ন দেখেন, ওই পুকুরে একশ ভাড় গুড় ঢাললে পানি উঠবে এবং কখনো শুকাবে না। স্বপ্ন অনুযায়ী পুকুরে গুনে গুনে একশ ভাড় গুড় ঢালা হ'লো। আর অমনি পুকুরের তলদেশে থেকে পানি উঠে পুকুটি কানায় কানায় ভরে গেলো। পলাশ পোলের খান চৌধুরী পরিবারের এক প্রবীন সদস্য বিভিন্ন কিংবদন্তির নাম করে জানান যে, 'তাদের পর্বপুরুষ ব্রাহ্মণরা ছিলেন গৌড়বর্ণের অধিকারী। উত্তরাধিকার সূত্রে গৌড়বর্ণের অধিকারী ছিলেন তারাও। গৌড়বর্ণের অধিকারী খান চৌধুরীরা ওই পুকুরের মালিক বিধায় পুকুরের নাম হয়েছে 'গুড়পুকুর'।

'গৌড়' লোক মুখে ঘুরতে ঘুরতে 'গুড়ে' রুপান্তরিত হয়েছে বলে তারা মনে করেন। গুড়পুকুরের মেলাটা মূলত 'মনসা' পূজাকে কেন্দ্র করেই। কারো কারো মতে 'ওটা হবে বিশ্বকর্মা পূজা'। পঞ্জিকা অনুযায়ী ভাদ্রের শেষ তারিখে বিশ্বকর্মা পূজা হওয়াই সঙ্গত। কেননা মনসা পূজা হয় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে অর্থাৎ শ্রাবণের শেষ তারিখে।

গুড়পুকুরের মেলা স্থানীয় উচ্চারণে 'গুড়পুকুরির মিলা'। সাতক্ষীরা জেলার সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য এই মেলা। ভাদ্র মাসের শেষ তারিখে মনসা পূজা উপলক্ষে গুড়পুকুর থেকে ইটেখোলা-কামান নগর পর্যন্ত বিশল এলাকা জুড়ে মেলা বসে। মূল মেলা একদিনের, যদিও তা এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আর কলমের চারার দোকানগুলো চলে এক মাসব্যাপী। এই মেলার বৈশিষ্ট্য হলো, আম-জাম-লিচু-কাঁঠালের কলম ও চারার ব্যাপক সমারোহ। এছাড়া আরো অনেক ফল-ফলারীর চারাও উঠে এখানে। কলমের চারার দোকানগুলো বসে প্রায় আধা কিলোমিটার জায়গা জুড়ে। আরো একটি জিনিস আমদানি হয় এখানে। আম-জাম- সেগুন গাছের আসবাবপত্র তৈরির কাঠ। এই কাঠ বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকা থেকে আসে। আগে কাঠের তৈরি আসবাবপত্র এখানে আসত নদী পথে। এগুলো আসতো ঢাকা, ফরিদপুর,বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। এ মেলায় বিনোদনমূলক ব্যবস্থা আগেও ছিল, এখনো আছে। নাগরদোলা, যাদু, পুতুলনাচ, মাকড়সা কন্যা, মৃত্যুকূপ, যাত্রাগানের আয়োজন এখনো আগের মতোই করা হয়।

নারায়ণঞ্জের গোলাকান্দাইল মেলাঃ

গোলাকান্দাইল ঢাকা-নরসিংদী মহাসড়কের একটু দক্ষিণে শিউলি সিনেমা হলের অল্প পেছনে ভুলতা বা গাউছিয়া বাস স্ট্যান্ডের কাছে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামে অনেক আগে থেকেই প্রতি বৃহস্পতিবার হাট বসে। সেই হাটে প্রতিবছর মাঘ মাসের পয়লা তারিখ থেকে সাতদিন ধরে জমে বিরাট মেলা। কেউ জানে না, এই মেলার উৎপত্তি কবে থেকে, কীভাবে। বিশাল বটগাছের ছায়ায় বসে এ মেলা। বটগাছ তো উপলক্ষ মাত্র, বটগাছ ছাড়িয়ে মেলা ছড়িয়ে পড়ে আরো অনেক দূর।

ঘোষবিলার মেলাঃ

চুয়াডাঙ্গা জেলার আমলডাঙ্গা উপজেলার একটি গ্রাম ঘোষবিলা। আমলডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে এ গ্রামের দূরত্ব দশ কিলোমিটার। আগে রাস্তা কাঁচা ছিল। এখন পাকা। আমলডাঙ্গা থেকে রিকশা অথবা ভ্যানে ঘোষবিলা যেতে হয়। এই মেলার আরেক নাম ঘোষবিলার বারুনী। বারুনী তিথিতে এই মেলা বসে, সেই কারণে এই মেলাকে ঘোষবিলার বারুনীও বলা হয়।

আগে ঘোষবিলার মেলা খুবই জমজমাট হতো। লোকজন কুমার নদের তীরে এসে স্নান করত। এটাকে তারা বলতো গঙ্গাস্নান। অনেকে কুমার নদের পানিতে ফল বিসর্জন দিত। এটাকে বলা হতো মানত শোধ। সেখানে কুমার নদ এখন মৃত। তবু কুমারের তীরে ঘোষবিলার সেই স্থানে বারুণীর মেলা বসে। বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা, চৈত্র আর আষাঢ়ে।

এটি এখন গ্রাম্যমেলার রূপ নিয়েছে। এই মেলায় মাটির পুতুল, রঙিন হাঁড়ি, খেলার জিনিস, তালের পাখা, ছাঁচ, কদমা, বাতাসা, রসগোল্লা ইত্যাদি বেচাকেনা হয়। মনোহারি অন্যান্য দোকানও বসে। তবে সাধারণ মানুষের সমাগমই মেলার বিশেষ দিক। এখন এ এক মিলন- মেলা। ঘোষবিলা ও তার আশপাশের গ্রামের লোকেরা সারাবছর ধরে দিন গোনে এই মেলায় যোগদানের আশায়।

মতুয়া সম্প্রদায়ের মেলা (ওড়াকান্দির মেলা)ঃ

উনিশ শতকে পল্লিবঙ্গে উদ্ভুত একটি লৌকিক ধর্মসম্প্রদায় এই মেলাকে তাদের প্রচারণার অন্যতম উপায়রূপে ব্যবহার করে। দক্ষিণবঙ্গেও বেশ কয়েকটি জেলায় তাদের প্রতিষ্ঠিত এই মেলা এখনো বর্তমান। সম্প্রদায়টির নাম মতুয়া। প্রধানতঃ এই মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠত মেলা এবং উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত অন্য সাধারণ কয়েকটি মেলা সম্পর্কে জানা যাক।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার নমঃশূদ্র নামক একটি কৃষিজীবি হিন্দু জনগোষ্ঠিতে মতুয়া ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বসবাস থাকলেও গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নড়াইল, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর প্রভৃতি জেলায় এদের জনসংখ্যা সর্বাধিক। মতুয়া সম্প্রাদয়ের প্রাথমিক বিস্তার তাই এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়। মতুয়া ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার সফলাডাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। একই জেলার ওড়াকান্দি গ্রাম ছিলো তাঁর কর্মক্ষেত্র। একটি অবহেলিত সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করে হরিচাঁদ নিজেকে সেই সম্প্রদায়ের প্রধান সংস্কারক হিসেবে নিয়োজিত করেন।

গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দিতে বারুণী মেলার সূচনা হয় ১৮৮০ সালে। মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের পূর্ব থেকেই তাঁর জন্মস্থান সফলডাঙ্গায় বারুণী স্নান এবং সে উপলক্ষে মেলা হ'তো। হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর ভক্তদের নিয়ে সে মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন ও স্নান উৎসবে যোগ দিয়েছেন। ১৮৭৯ সালে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র যজ্ঞেস্বর ঠাকুর সর্বপ্রথম এই মেলাকে ওড়াকান্দিতে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব অনুসারে মেলা ও বারুণী উৎসবটি হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬-১৯৬৩) ১৮৮০খ্রিষ্টাব্দে ওড়াকান্দিতে স্থানান্তর করেন। মেলাটি ওড়াকান্দিতে প্রতিস্থাপন করার উদ্দেশ্যে গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন । মেলায় আগত মতুয়া ভক্তদের মিছিল বিশেষ বৈচিত্র্যে ভরপুর। বাংলাদেশে আর কোনো অঞ্চলে এ

ধরনের মেলা দেখা যায় না। এই মেলায় মিছিলটির মধ্যে এক ধরণের সামরিক আবহ আছে। নির্যাতিত ও অবহেলিত একটি সম্প্রদায়ের সামাজিক উত্থানের সংগ্রামের সঙ্গে এই সামরিক মিছিল বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

সব বয়সের নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে মিছিল সহকারে ওড়াকান্দিতে আসে। মিছিলে ব্যবহৃত হয় নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। এসব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ডঙ্কা, কাঁসি, শিঙ্গা, জগডম্প প্রভৃতি অন্যতম। মতুয়াদের এ মিছিলে উন্মাতাল রূপ ধারণ করে ওড়াকান্দিতে পৌঁছানোর পর। ওড়াকান্দির ঠাকুর বাড়ি, যা 'শ্রীধাম ওড়াকান্দি' নামে বিশেষ পরিচিত, মহাবারুণীর দিনে তা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। সমস্ত বাড়ি ঘিরে সেদিন যে নৃতোৎসব হয় তা দেখার মতো। অসংখ্য ছোটবড় দলে বিভক্ত হয়ে মতুয়ারা সেদিন নৃত্য ও গানে মাতোয়ারা হয়ে যান।

এই মেলা মোট ৭ দিন ধরে চলে। প্রচুর মতুয়াভক্তের সমাগম হয় বলে স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ীরা সারা বছর ধরে এই মেলার অপেক্ষায় থাকে। মতুয়ারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক ধরনের মালাকে পবিত্র অলঙ্কার রূপে ব্যবহার করে। মালাটি তৈরি করা হয় নারকেলের মালাকে ছোট ছোট গোলাকার খণ্ড করে সুতোয় গেঁথে এবং দেখতে তা কালো রঙের পুঁতির মালার মতো। এই মালা ব্যাপকহারে মেলায় বিক্রি হয়। নারকেলের মালা থেকে তৈরি আংটিও এ মেলায় বিক্রি হতে দেখা যায়। মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। বর্তমানে মতুয়াভক্ত ছাড়াও ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আশপাশের অনেকেই এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন ধরণের বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকে। কবিগান হয়। যাত্রা, পুতুল নাচ, সার্কাসও আসে।

কেনুয়াডাঙ্গার মেলা:

পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলা কেনুয়াডাঙ্গা গ্রামে বিপিন গোঁসাইয়ের আশ্রমে ওড়াকান্দির বারুণী মেলার ৭ দিন পরে তিনদিনব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে। এ মেলাতেও ওড়াকান্দির মতো মতুয়াদের মিছিল, নাচ-গান, স্নান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বারুনীযোগ না থাকলেও এ মেলায় আগত মতুয়ারা পার্শ্ববর্তী মধুমতী নদীতে স্নান করেন এবং সে স্নানকে বারুনী স্নান তুল্য বলেই তারা বিবেচনা করেন। সাধারণ ক্রেতাদের জন্য বাঁশ ও বেতের নির্মিত হস্তশিল্প সামগ্রী এ মেলার বিশেষ আর্কষণ।

লক্ষ্মীখালীর মেলা:

বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীখালী গ্রামে ওড়াকান্দির বারুণীর ১৫ দিন পরে বিখ্যাত মাতুয়াভক্ত গোপাল সাধুর আশ্রমে ৭ দিনব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে। মতুয়াদের মেলাগুলোর মধ্যে ওড়াকান্দির পরেই এ মেলায় সর্বাধিক লোকের সমাগম হয়ে থাকে। মতুয়াদের মিছিল এ মেলায় এসে গোপাল সাধুর বাড়ি দক্ষিণস্থ দিঘিতে স্নান করে। এ স্নানকেও বারুণী স্নানের সমতুল্য ভাবা হয়। গোপাল সাধু সম্পর্কে এ অঞ্চলে বহু অলৌকিক কাহিনী ও কিংবদন্তি রয়েছে। যা এ মেলার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

হুড়কা মেলা:

বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার হুড়কা গ্রামে প্রতি বছর রমণী গোঁসাই ওরফে রূপচাঁদ গোঁসাইয়ের আশ্রমে ওড়াকান্দির মেলার ১৫ দিন পর অর্থাৎ লক্ষ্মীখালী মেলার একই সময়ে ৩ দিনব্যাপী মতুয়া মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলাতে মতুয়ারা তাদের উৎসব অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করে।

লড়ার মেলা:

পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার লড়া গ্রামে প্রতি বছর ৭ বৈশাখ পূর্ণ সাধুর আশ্রমে ৩ দিনব্যাপী এক মেলা হয়। পূর্ণ সাধু ছিলেন বিপিন গোঁসাইয়ের শিষ্য এবং এ এলাকায় তিনি পূর্ণ পণ্ডিত নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এখানে মেলার পাশাপাশি মতুয়াদের ধর্মসম্মেলনও হয়ে থাকে।

গঙ্গার্চনার মেলা:

মতুয়াদের সাধনা-সঙ্গীতের অন্যতম রচয়িতা অশ্বিনী সরকার (৯১৮৭৭-১৯২৭) ওরফে অশ্বিনী গোঁসাইয়ের জন্মস্থান বাগেরহাট জেলার চিতলমারি উপজেলার গঙ্গার্চনা গ্রামে। প্রতি বছর বৈশাখ ২ ও ৩ তারিখে এখানে মেলা হয়। অন্যান্য মতুয়া মেলার মতো এ মেলার দু'টো অংশ: একটি বিপণিকেন্দ্রিক, অন্যটি ভক্তসমাগম ও মহোৎসবকেন্দ্রিক। মতুয়াদের কাছে অশ্বিনী গোঁসাই জনপ্রিয় একটি নাম। তিনি বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকশ সাধন সঙ্গীত মতুয়াদের কাছে খুবই প্রিয়।

জয়পুরের মেলা:

নড়াইল জেলার জয়পুর গ্রামে কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৭-১৯১৪) ওরফে তারক গোঁসাইয়ের জন্মস্থানে তাঁর জন্মতিথি ভাদ্র মাসের আমাবস্যায় ৩ দিনব্যাপী কবিগানের আয়োজন হয়ে থাকে। অন্যান্য মতুয়া মেলার মতো জয়পুরের মেলাতেও মতুয়াদের মিছিল আসে এবং নিকটবর্তী নবগঙ্গা নদীতে ভক্তগণ স্নানানুষ্ঠান করেন। কবিগানের পূর্ববঙ্গ পর্বের সার্থক প্রবর্তক তারক সরকার করিগানের মধ্যে সর্বপ্রথম ধুয়া গানের প্রচলন করেন, যা আধুনিক কালের কবিগানের প্রধান আকর্ষণ। তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তার

অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করে সমকালে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তারক সরকার 'শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত' নামে হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনীকাব্য রচনা করেন। 'মহাসংকীর্তন' নামক গ্রন্থে তার শতাধিক গান সংকলিত রয়েছে।

দুবলারচরের মেলা:

বাগেরহাট জেলার সুন্দরবনের দক্ষিণে পশুর নদীর মোহনায় দুবলারচরে প্রতি বছর রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এক বিরাট মেলা বসে। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে হরিচাঁদ ঠাকুরের এক বনবাসী ভক্ত হরিভজন (১৮২৯-১৯২৩) এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর অসংখ্য পুণ্যার্থী রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে এখানে সমুদ্রস্নান করতে আসেন। মৎস্যজীবীদের বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে দুবলারচরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেলাটি ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই মেলা সম্পর্কে সর্বপ্রথম ব্যাপক জানাজানি হয় ১৯৭০ সালে নভেম্বরে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে মেলায় আগত অসংখ্য পুণ্যার্থীর সলিলসমাধি হবার খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার পর।

গণেশ পাগলের মেলা:

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলার পাড়াকোণায় গণেশ পাগলের আশ্রমে প্রতিবছর পৌষ মাসের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখ মেলা হয়। বাগান উত্তরপাড় গ্রামের কাছে পাড়কোণা নামক স্থানে এক নির্জন বটগাছের কোটরে বসে গণেশ পাগলা সাধনা করতেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের কমিটি পাড়কোণায় এই মেলার আয়োজন করে। গণেশ পাগলের নামে আর একটি মেলা হয় মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ি গ্রামে। পৌষ সংক্রান্তি থেকে ৫ দিন পর্যন্ত এই মেলার স্থিতিকাল।

খেজুরতলার মেলা:

পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার খেজুরতলা গ্রামে রাধা পাগলের মেলা কারুশিল্পের মেলা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ১৪ তারিখ থেকে প্রায় ১ মাস ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার প্রতিষ্ঠাতা রাধা-পাগল মতুয়া সম্প্রদায়ের এক বিশেষ শাখার জন্ম দিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বাগেরহাট জেলার চরবানিয়ারি গ্রামের এক বাড়িতে মোষ রাখার কাজ করতেন। অত্যধিক সততা ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী রাধা পাগল এক সময় ওড়াকান্দির গুরুচাঁদ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং গুরুচাঁদের নির্দেশে বিধবাদের পুনর্বিবাহের কাজকে তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে এই মেলা ছিলো বিধবাদের পুনর্বিবাহের মেলা। বিধবাদের এভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করায় রাধা পাগল সমসাময়িক রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সমলোচনার রোষে পড়েন।

কীর্তনখালীর মেলা:

বাগেরহাট জেলার চিতলমারি উপজেলার কীর্তনখালী গ্রামে বিপিন গোঁসাইয়ের শিষ্য সতীশ গোঁসাইয়ের উদ্যোগে মতুয়াদের একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এটি সাম্প্রতিকতম এবং মেলার সব আনুষ্ঠানিকতা মতুয়াদের রীতিনীতি অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত জেলার চিতলমারিতে দোলপূর্ণিমায় গুরুচাঁদ ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য বিচরণ পাগলের আশ্রমে ২ দিনব্যাপী একটি মেলা হয়। দোলপূর্ণিমা সাধারণত ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে অথবা মাসের প্রথম দিকে হয়ে থাকে।

এল্লারচর ও শিমুলবাড়িয়ার মেলা:

সাতক্ষীরা জেলা সদর উপজেলায় এল্লারচর গ্রামে নরেন গোঁসাইয়ের আশ্রমে প্রতি বৈশাখ মাসে মতুয়া ধর্ম সম্মেলন ও কবিগানসহ দু'দিনব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে। সংসার ত্যাগী নরেন গোঁসাইয়ের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ টিকাদার। গোপালগঞ্জ জেলার হরিদাসপুর তাঁর পৈতৃক বাড়ি। সরকারি চাকরি ত্যাগ করে তিনি মতুয়া ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আসেন। একই উপজেলার শিহুলবাড়িয়া গ্রামে প্রতি বছর জৈষ্ঠ্য মাসের ১ ও ২ তারিখে মতুয়া ধর্মসম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি মেলা হয়। মেলায় কবিগানের আয়োজন হয়। এ মেলার প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ কর্মকার। নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে মতুয়া ধর্ম গ্রহণের নজির খুব কম। রবীন্দ্রনাথ কর্মকার বা রবীন কর্মকার এ ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত।

চাক্‌মাদের বিজু উৎসব:

পাবর্ত্য চাট্টগ্রামের সবক'টি জেলাতেই বিভিন্ন উপজাতির বসবাস। তন্মধ্যে চাক্‌মাদের সংখ্যাই বেশি। বছরের শেষদিন অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষদিন তারা বিজু উৎসব পালন করে। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় অলঙ্কৃত এই বিজু উৎসব। চাক্‌মাদের প্রতিটি বাড়িতেই নানা স্বাদের খাবার তৈরি হয়। তাদের ধারণা, সবরকম খাবার খেয়ে ও বিলিয়ে বর্ষবিদায় করা পুণ্যের কাজ। এদিন তরুন-তরুণীরা নদী থেকে জল এনে বাড়ির বয়স্কদের স্নান করিয়ে দেয়, আর্শীবাদ গ্রহণ করে। সদ্য বিবাহিত বর-কনেরা বেড়াতে যায় বাপের বাড়ি কিংবা শ্বশুড়বাড়ি। শুধু বাড়ি বাড়ি নয়, হাটে-মাঠে-ঘাটে, সর্বত্রই আমোদ ফূর্তি। মন্দিরে ফুল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধকে স্মরণ করে, ভিক্ষুদের প্রণাম জানিয়ে আর্শীবাদ গ্রহণ করে। শুধু চাক্‌মারা নয়, বিজু উৎসব প্রায় প্রতিটি উপজাতিরাই পালন করে। লোকজ সৌন্দর্যের কারণেই হয়তো বিজু উৎসব সার্বজনীন মেলায় পরিণত হয়েছে। এই মেলায় গরুর লড়াই, মোরগের লড়াই, বাজি খেলা, বলি খেলা ও ওঝার লড়াই হয়। সব আনুষ্ঠানিকতার উদ্দেশ্য একটাই, আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি নিজের ভাগ্য ফেরানো।

রাজশাহী আশ্বিন সংক্রান্তির মেলাঃ

গঙ্গার পলিবিধৌত রাজশাহী গ্রামগুলোতে রোদে পোড়া মানুষের আনন্দ উল্লাসের কমতি নেই। একটার পিঠে আর একটা উৎসব লেগেই আছে। এর কোনোটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনকে ডিঙ্গিয়ে সার্বজনীন মিলন অর্থে পরিণত হয়েছে। এমন একটি মেলা হচ্ছে রাজশাহীর দুর্গাপুরের উজাল খলসির আশ্বিনের মেলা। দুর্গাপুর উপজেলা থেকে প্রায় পাঁচ কি.মি- এর আঁকাবাঁকা পথ। যেতে হয় রিক্সা-ভ্যানে চেপে। দু'পাশে পানের বরজ, আম-কাঁঠালের বাগান, ডোবা, ঝোপঝাড়। গ্রামের প্রবেশ মুখেই বিশালাকৃতির বটবৃক্ষ। সেখানে দু'দণ্ড শান্তির আশ্বাস। অনেক ইতিহাস বুকে ধারণ করে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে।

আশ্বিনের মেলা উপলক্ষে গ্রামের সব পরিবারেই দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজনরা এসে জড়ো হয়। এই মেলা একদিনের হলেও ব্যাপ্তি প্রায় ৩ দিন। এক সময় মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিলো জাগের গান। এই গানের সুর ও পরিবেশনা একটু ভিন্ন ধরনের । বিভিন্ন স্থান থেকে আসতো জাগের গানের দল। নৌকা নদীতে ভেসে বেড়াত, শিল্পীরা নৌকায় উপর বিচিত্র পোশাক পরে খোল-করতাল বাজিয়ে গানই গাইতো না, সঙ্গে থাকত অভিনয় ও নৃত্য। জাগানোর গান থেকে জাগের গান শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি। ব্রিটিশ সরকারের আতাচ্যারের কাহিনী নিয়ে এই গান বানাতো নিরক্ষর এক সাধু বাঙালি।

শিশু আনন্দ মেলাঃ

রাজধানী ঢাকাকে এখন মেলার শহর বললে আশা করি খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না। সারা বছরই কোনো না কোনো মেলা হয় এখানে। এতো মেলার ভিড়ে শিশুদের একান্ত একটি মেলা আছে। এই মেলার সবকিছুই শিশুদের উপযোগী। মেলাটির নাম শিশু আনন্দ মেলা। শিশুদের হাসি-খুশি আনন্দ-উচ্ছাসে ভরপুর এই মেলার আয়োজক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী। ১৯৭৮ সাল থেকে শিশু একাডেমী ব্যাতিক্রমী এই মেলা চালিয়ে আসছে। প্রথম প্রথম শিশু একাডেমীর ক্ষুদ্র পরিসরে দাপ্তরিক কাজর্কম চলতো সেগুন বাগিচায়। সেখানে মেলার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান না থাকায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হতো। শুধু মেলা বলতে যা বোঝায়-এ মেলা ঠিক সেরকম নয়। এখানে বসে নানা জিনিসের পসরা। তৈরি হয় স্টল। হরেক জিনিসের পাশাপাশি থাকে বই ; শিশুদের বই। থাকে বিজ্ঞান স্টল। সেখানে শিশুদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন বিজ্ঞান-পদ্ধতি বা আবিষ্কার প্রদর্শিত হয়। থাকে শিশুদের তৈরি মাটি ও বাঁশের তৈরি খেলনা, হস্তশিল্প, সূচিকর্ম, শিশুদের আঁকা ছবি, শিশুদের লেখা এবং শিশুদের সম্পাদনায় ঝলমলে দেয়াল পত্রিকাও প্রতিযোগিতার জন্য এখানে প্রদর্শিত হয়।

শাহ মোস্তফার ওরস উপলক্ষে মেলাঃ

মৌলভীবাজার জেলা শহরের এই মেলাটি বৃহত্তম। হযরত সৈয়দ শাহ মোস্তফার ওরস মোবারক উপলক্ষে বেরি লেকের পাড়ে তাঁর মাজার শরিফকে কেন্দ্র করে মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, এখানে চন্দ্রসিংহ নামে এক সামন্ত রাজা রাজত্ব করতেন। এ রাজ্যের প্রজারা বাঘের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কোনোভাবেই বাঘের আক্রমণ প্রতিহত করা যাচ্ছিল না। এ সময়েই হযরত শাহ মোস্তফা (রহ.)-এর আগমন ঘটে। তিনি হযরত শাহজালালের সফরসঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার একজন। এই রাজ্যে এসে তিনি বাঘের পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর হাতে থাকত সাপ, এই সাপটি চাবুকের কাজ করত। এজন্য তাঁর নামের সঙ্গে ' শের সওয়ার চাবুকমার' উপাধি সংযোজিত হয়। খবরটি রাজার কানে গেলে রাজা তাঁকে রাজ দরবারে আমন্ত্রণ জানান এবং মুগ্ধ হয়ে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেন। এতে প্রজাদের বাঘের ভয় কাটে। প্রতি বছর পয়লা মাঘ এই মহান অলি আল্লাহর মাজারে ওরস উপলক্ষে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে। বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর দোকান বসে। এসব দোকানে ক্রেতাদের প্রচণ্ড ভির জমে।

মাধবকুণ্ডের মেলাঃ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক স্বর্গরাজ্য মাধবকুণ্ড। বড়লেখা উপজেলার পাথারিয়া পাহাড়ের এই স্থানে ২০০ ফুট উঁচু থেকে নেমে আসা ঝর্ণাধারা পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায়, কোনো এক সময় সিলেটের রাজা গোবর্ধন কুলোতাত মৃগায়ার উদ্দেশ্যে পাথারিয়া পাহাড়ে আসেন। তিনি মাধবকুণ্ডের নৈসর্গিক শোভা দেখে মুগ্ধ হন এবং সেখানে একটি বিশ্রামাগার নির্মাণের উদ্দেশ্যে মাটি খুঁড়তে গিয়ে এক ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর সন্ধান পান। রাজা সেই সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য পাবার জন্য স্তবস্তুতি শুরু করেন। মগ্নতা ভেঙ্গে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চোখ মেলেন। প্রসন্ন হয়ে রাজাকে নানা উপদেশসহ ঐ কুণ্ডে প্রতিবছর মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে পিণ্ড বিজর্সনের নির্দেশ দেন। সন্ন্যাসী তিরোধানের সময় তিনবার 'মাধব' শব্দটি উচ্চারণ করেন। সেই থেকে মাধবকুণ্ড নামে এর উৎপত্তি বলে জনশ্রুতি আছে। সেই ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা তিথিতে বারুণী স্নানে পুণ্যার্থীরা এখানে আসেন। কুণ্ডের পাশেই একটি শিবমন্দির আছে।

লালবাগের বারুণী মেলাঃ

হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব বারুণী স্নানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় মেলা। কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের লালবাগে আনুষ্ঠিত মেলাটি বৃহত্তম। মনু নদীর তীর ঘেঁসা এই অঞ্চল মেলা উপলক্ষে হাজার মানুষের পদচারণায় মখর হয়ে ওঠে। অসংখ্য দোকানপাট বসে । আসে সার্কাস, পুতুল নাচ।

বিষ্ণুপদ ধামের মেলাঃ

রাজনগর উপজেলার কামারচাক ইউনিয়নের বিষ্ণুপদ ধামে বিভিন্ন উৎসবে মেলা বসে। এর মধ্যে আছে রথ যাত্রা, স্নানযাত্রা, জন্মষ্টামী, ঝুলনযাত্রা, শিব চতুর্দশী উৎসব ও কীর্তন। চৈত্রমাসে আষ্টমী স্নান, গৌর পূর্ণিমায় পাঁচদিনব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান ও মেলা।

ঠাকুরবাণীর মেলাঃ

মৌলভীবাজার জেলার সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম শতক। যদিও গ্রামটি এখন প্রশাসনিকভাবে হবিগঞ্জ জেলার অধীন তবু মৌলভীবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ খুব নিবিড়। সাধক পুরুষ ঠাকুরবাণী'র স্মবণে এখানে প্রতিবছর তিনদিনব্যাপী মেলা বসে। তিথি অনুসারে শ্রী পঞ্চমীর দিন অধিবাস ও পরের দু'দিন উৎসব। উৎসবের সময় টিনশেড ঘরে কীর্তন হয়। দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষের ব্যাপক ভিড় জমে। মুখরিত মেলা প্রাঙ্গণে অনেক কিছু বেচা- কেনা হয়।

অজ্ঞান ঠাকুরের মেলাঃ

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার বিরইমাবাদ গ্রামে আছে অজ্ঞান ঠাকুরের মন্দির। মন্দির সংলগ্ন জোড়া পুকুর। কথিত আছে, সিদ্ধ পুরুষ অজ্ঞান ঠাকুর এক পুকুরে ডুব দিয়ে অন্য পুকুরে ভেসে উঠতেন। প্রতি বছর অজ্ঞান ঠাকুরের মন্দিরের দেয়াল ঘেঁসে বিশাল মেলা বসে। সেখানে বিভিন্ন দেশী শিল্পপণ্য, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা ইত্যাদি বিক্রি হয়। বর্তমানে যান্ত্রিক যুগে মেলার ঐতিহ্যবাহী পণ্য সামগ্রী ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে।

রাস মেলাঃ

কার্তিক মাসের শেষ দিকে মণিপুরীদের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকেও মণিপুরী সম্প্রায়ের ভক্তকুল শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও রাখাল লীলায় তাদের মানত পুরো করতে আসেন। কমলগঞ্জ উপজেলার মাধপপুর ইউনিয়নের শিব বাজারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখনকার সর্বস্তরের মানুষ রাস উৎসব দেখতে আসেন। উৎসব উপলক্ষে প্রায় সহস্রাধিক দোকান বসে। আসে পুতুল নাচ, যাত্রা, যাদু, নাগোরদোলা, বারোমাসী, আরো কত কিছু। হয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম। মণিপুরি সম্প্রদায় দ'ভাগে বিভক্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া ও মইতই। সম্প্রতি মইতই মণিপুরীরা একই উপজেলার আদমপুরি ইউনিয়নে আলাদাভাবে অনুরূপ মেলার আয়োজন করছে।

বৈশাখী মেলাঃ

সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সৃজনী'র উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে মৌলভীবাজার জেলা সদরে প্রথম বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে শ্রীমঙ্গল, কলাউড়া প্রভৃতি উপজেলায়ও অনিয়মিতভাবে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আশুরা উপলক্ষে মেলাঃ

কুলাউড়া উপজেলার পৃথিমপাশার নবাব পরিবার শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের পূর্ব পুরুষ ইরান থেকে এসেছিলেন। এই পরিবারের নবাব আলী আমজাদ খান অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। আশুরা উপলক্ষে তাদের পরিবারের উদ্যোগে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা স্মরণে কিছু অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে মেলা অন্যতম। পৃথিমপাশার এই মেলায় সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেয়। অসংখ্য দোকান বসে। হরেক রকম পণ্য সামগ্রীতে ভরে যায় মেলা প্রাঙ্গণ। মেলা উপলক্ষে ভক্ত-অনুরাগীরা হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেনের স্মরণে মাতম করে।

মাইজভাণ্ডারি মেলা ও অন্যান্যঃ

ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলার ইতিহাস সুপ্রাচীন। অনেক গবেষকের মতে মূলতঃ ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলার ইতিহাসের সৃষ্টি। চট্টগ্রামে ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাও প্রচীনতার দাবি রাখে। বলাবহুল্য, ধর্মীয় উৎসবকেন্দ্রিক এই সমস্ত মেলার সবগুলোই অমুসলিম- হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক। ঐতিহ্যগতভাবে মুসলিম ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মেলা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদিক থেকে সম্ভবত মাইভাণ্ডারি মেলাই এই ঐতিহ্য সৃষ্টির দাবিদার। কবি অম্বিকাচরণ চৌধুরীর কবিতায় চট্টগ্রামের ধর্মীয় মেলার এক সুন্দর বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়। এই কবিতায় তিনি চট্টগ্রামের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধর্মীয় মেলার বর্ণনা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এর সবগুলোই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক। এর মধ্যে যে একমাত্র মুসলিম ধর্মীয় মেলার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো মাইজভাণ্ডারি মেলা।

পাঠ্য উপকরণ ২: বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালা

জাতীয় উৎসবসমূহ:

শহীদ দিবস:

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে দেশব্যাপী এক বিশাল আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনে যারা শহীদ হন তঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে থাকে। এই দিবসের বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে যে, এই দিবস উৎযাপনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ নেই। এই দিবস সরকারী এবং বেসরকারীভাবে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পালিত হয়। পৃথিবীর আর কোথাও এই ধরণের উৎসব নেই, ভাষার জন্য কেউ প্রানও দেয়নি।

স্বাধীনতা দিবস:

প্রতি বছর ২৬ মার্চ আমরা স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন করি। এই দিবসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূত্রপাত ঘটে। এই দিনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের ডাকে পাকিস্তান থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করার আন্দোলন শুরু হয়। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম শুরু হয়, যার ফলে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হই। এই সংগ্রামে ভারত আমাদের সাহায্য করে। এই দিবসটিও সরকারী এবং বেসরকারীভাবে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পালিত হয়।

মহান বিজয় দিবস:

প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর আমরা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে থাকি। এই দিবসে বাংলাদেশ শত্রু কবলমুক্ত হয় এবং পূর্ণভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

জাতীয় সংহতি দিবস:

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে আমাদের দেশ একটি সংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিল। এ দিবসে সিপাহী এবং জনতা সম্মিলিত হয়ে দেশের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছিল। যার ফলে আমরা একটি সংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। একটি অশুভ শক্তি দেশের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্র আমরা রুখে দিয়েছিলাম ৭ই নভেম্বর তারিখে। প্রতিবছর এ দিনটিও সরকারীভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

বাংলা নববর্ষ (১লা বৈশাখ):

বাংলা নববর্ষ আমাদের সমাজ জীবনে সবসময়ই পালিত হয়ে এসেছে। তবে বর্তমানে এটি যতটা গুরুত্ব পেয়েছে তা অতীতে ছিল না। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপিত হচ্ছে বঙ্গভবনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এর ফলে ১লা বৈশাখ আমাদের জীবনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই দিনটি সরকারী ছুটির দিন। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে আমরা যেসব উৎসব পালন করে থাকি তার মধ্যে বাংলা নববর্ষ (১লা বৈশাখ) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মীয় উৎসবসমূহ:

ঈদে মিলাদুন্নবী:

আমাদের দেশে মুসলিমদের প্রধান উৎসব হিসেবে আমরা ঈদে মিলাদুন্নবী, ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করে থাকি। ঈদে মিলাদুন্নবী উৎসবটি আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়। এ উপলক্ষে ছুটি থাকে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। ঢাকায় এবং চট্টগ্রামে দু'টি প্রতিষ্ঠান মিছিল বের করে। মিছিল চলাকালে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা রাসুলে খোদার (স:) প্রসংশাসূচক দরুদ পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ইসলামিক ফাউরেন্ডশন পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং বঙ্গভবনে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি মিলাদ শরীফের আয়োজন করা হয়।

শবে মেরাজঃ

শবে মেরাজের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৭ রজব তারিখে। রাসুলে খোদা (স:) আলাহ্‌র নির্দেশে এবং্‌ হবানে মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মোকাদ্দেসে নিশাযোগে এসেছিলেন। সেখান থেকে তিনি উর্ধ্ব আকাশে উঠেছিলেন আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করার জন্য। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি অতিক্রম করে তিঁনি এমন একটি স্থানে উপনিত হয়েছিলেন, যেখানে পূর্বে কেউ যায়নি এবং ভবিষ্যতেও কেউ যাবে না। রাসুলে খোদার (স:) জীবনে এটি একটি অলৌকিক মাহাত্মপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনাকে স্মরণে রেখে ২৭ রজব সারারাত ধরে মুসলমানদের ঘরে ঘরে মিলাদ হয় এবং কোর-আন শরীফ পাঠ করা হয়। এই দিন সরকারী ছুটি থাকে।

লায়লাতুল কদরঃ

মালয়েশিয়ায় লায়লাতুল কদরকে "নুযুলে কোর-আন" বলা হয়। এই রাতে কোর-আন শরীফ নাজিল হয়েছিল, এই বিশ্বাসে এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। মূলত: কোর-আন শরীফ নাযিল উপলক্ষে লায়লাতুল কদর উদ্‌যাপন করা হয়। যে সময় রাসুলে খোদার নিকট ঐশি বাণী আসছিল সে সময় আরব দেশের জনগণ অশিক্ষিত ছিল। কোর-আন শরীফের বাণীর মাধ্যমে তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়, সত্যের অনুসারী হয় এবং শিক্ষাকে অবলম্বন করে। সে কারণে লায়লাতুল কদর উৎসবটি এক অর্থে জ্ঞানের উৎসব।

ঈদ-উল-আযহাঃ

এই উৎসবটি মূলতঃ হজ্বের উৎসব। ঈদ-উল-আযহায় পশু কোরবাণী দেয়া হয় হযরত ইব্রাহীমের উদ্দেশ্যে। তিঁনি আল্লাহর নির্দেশে তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবাণী দিতে গিয়েছিলেন। পরে মহান প্রভূর ব্যবস্থাপনায় ইসমাইলের পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবাণী দেয়া হয়। এই দিনটিও আমাদের দেশে অত্যন্ত উৎসবের আমেজে পালিত হয়।

ঈদ-উল-ফিতরঃ

বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের আনন্দ ও মিলনোৎসব হচ্ছে ঈদ-উল-ফিতরের উৎসব। পবিত্র রমজান মাসে একমাসব্যাপী সিয়াম পালনের পর এই উৎসবটি আসে। সেই কারনে এই উৎসবটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই উৎসবের দিনে গরীবদের সাহায্য দেয়া হয়। এই সাহায্যকে ফিত্‌রা বলে। যুগ যুগ ধরে এই উৎসবটি বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জীবনে একটি অসাধারণ তাৎপর্যবহ উৎসব।

হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানঃ

বাংলাদেশে হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠান অনেক। ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নির্ধারিত ধর্মানুষ্ঠানের সংখ্যা ৩৬টি। এর মধ্যে মূল ধর্মানুষ্ঠান হ'লো দুর্গাপুজা, যেটি ব্যাপকভাবে পালিত হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই পূজা পালিত হয়। দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর দিন সরকারী ছুটি থাকে। এই দিনটিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মিলনের দিন মনে করে। এই দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে একে অপরের মাঝে উপহার বিনিময় হয় এবং পারস্পরিক শুভকামনা করা হয়।

বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানঃ

বৌদ্ধদের ধর্মানুষ্ঠান মহামতি গৌতম বুদ্ধের জীবনকে কেন্দ্র করে। গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি এবং পরিনির্বান একই দিনে হয়েছিল বলে এই দিনটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দিনটিকে বৌদ্ধ পূর্ণিমা বলা হয়। এ দিনটি সরকারী ছুটির দিন। লুম্বিনী কাননে যেদিন বুদ্ধের জন্ম হয় ঠিক সেইদিনই ৩৫ বছর পর বুদ্ধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হন। ঠিক একই দিনে ৮০ বছর বয়সে তাঁরন মৃত্যু হয় বা তিঁনি নির্বান প্রাপ্ত হন। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর বৌদ্ধ অধ্যুশিত দেশে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই দিবসটি পালন করা হয়। রাত্রিবেলা মিছিলসহকারে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করে। মহামতি বুদ্ধের জীবনে জন্ম, সিদ্ধি এবং নির্বান লাভ এই তিনটি ঘটনার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করা হয়।

খ্রীশ্চিয়ান ধর্মানুষ্ঠানঃ

খ্রীশ্চিয়ানদের প্রধান ধর্মানুষ্ঠান যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন বা বড়দিন। ২৫ ডিসেম্বর এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এই দিন গির্জায় প্রার্থনা হয়। সামাজিকভাবে খ্রিস্টানগণ একে অপরের গৃহে গমন করে, শুভ কামনা করে এবং উপহার বিতরণ করে। এই দিনটি পৃথিবী ব্যাপী যিশু খ্রিস্টের স্মরণে শান্তির দিন বলে বিবেচিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর মধ্য রাত্রি থেকে এই উৎসব শুরু হয়। এই রাতে সেন্ট যোসেফ এবং কুমারী মেরী আশ্রয় সন্ধান করেছিলেন। পরে যিশুর জন্ম হলে পূর্বাঞ্চল থেকে তিনজন সাধু যিশুকে দর্শন করতে আসেন। এই জন্মের স্মরণেই বড়দিনের উৎসব। এই উৎসবটি উল্লাসের, উদ্দীপনার, শান্তির ও বিশ্বমৈত্রির। এই দিনটি বাংলাদেশে সরকারী ছুটির দিন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আরও দু'টি উৎসব হচ্ছে গুড ফ্রাইডে এবং ইংরেজী নববর্ষ।

পাঠ্য উপকরণ ৩: লোকচিত্র প্রথা

ভারতীয় চিত্রে দুইটি প্রথা প্রচলিত আছে-অলংকার বহির্ভূত, যার মূল নিহিত আছে প্রাচীন শিল্পের মূল বিষয়ে এবং যা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং 'দেশীয় ভাষা' বা লোকচিত্র যা সমাজের প্রথা বা বিশ্বাস অনুযায়ী সৃজিত হয়েছিল এবং প্রাথমিকভাবে তৎকালীন গ্রাম্য উপজাতীয় সমাজের মধ্যে বিরাজমান ছিল। প্রাচীন শিল্পকলায় দেখা যায় প্রাচীরের ওপর খোদিত এবং ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র ছিল এবং তখন কারিগর সমাজ এবং তাদের সংঘ কর্তৃক পরিচালিত স্কুল ছিল। যখন কিনা লোকচিত্রে সমগ্র পদ্ধতিটা ছিল ধর্মীয় আচার সম্বলিত কার্যাবলী যা বংশের পর বংশের মধ্যে পার হয়ে যেত। তারা তাদের গৃহের দেয়াল এবং মেঝে চিত্র দিয়ে সজ্জিত করত। যদি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা যার দ্বারা মন্দির সজ্জিত হত সেগুলি রাজা ও তাদের রাজত্ব, তাদের জীবন, তাদের বিশ্বাস এবং তাদের দেব দেবীর বিবরণ দেয়, লোকচিত্র সেখানে মানুষ তাদের পৌরানিক কাহিনী এবং লৌকিক উপখ্যান তাদের দেব দেবীদের বিবরণ বর্ণনা করে। ভারতবর্ষে প্রাচীন শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা, যা ব্রাহ্মণ ধর্মীয় দর্শন এবং গোঁড়া লোকশিল্পকে ও উদারপন্থী মতবাদকে সমর্থন করে। তাদের প্রধান বিষয় ছিল বৃষ্টি এবং শস্যের জন্য তারা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা এবং তাদের জীবনের প্রতি বিশ্বাস, যা কিনা সূক্ষভাবে বিচার করার চেয়ে উপলব্ধি ও উপভোগ করার প্রয়োজন বোধ করে। তাদের লোকচিত্রের মাধ্যমেই তাদের জীবনের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায়, যে তা কতটা স্পন্দনশীল এবং বর্ণাঢ্য।

পর্ব এবং মেলাগুলির এমন উপলক্ষ ছিল যে সমগ্র গ্রাম সাধারণতঃ সমবেতভাবে তা পালন করত। চিত্রকলায় তাদের সমবেত অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বেশীরভাগ ভারতীয় চিত্রপটে একজন চিত্রকর নয়, কিন্তু তাদের দলগত অংশগ্রহণ থাকত। সমষ্টিগত দর্শন এবং নৈপুন্য একটি শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হত।

প্রসিদ্ধ চিত্রের মধ্যে কিছু প্রথার প্রচলন হচ্ছে পিথোরো চিত্র যা গুজরাটের রাথাভ, মহারাষ্ট্রের ওয়ারলি চিত্র, বিহার রাজ্যের মিথিলা অঞ্চলের মধুরানি চিত্র, রাজস্থানের কার্ড, অন্ধপ্রদেশের শেরিয়াল, এবং পশ্চিমবঙ্গের পট চিত্র।

পঞ্চ মহলের বরোদা জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ সমাজ হচ্ছে রাযাভা সমাজ। এখানকার লোকচিত্র প্রথার রীতি হ'ল তাদের গৃহের দেয়ালগুলি সৃষ্টির বিষয় এবং রক্ষণ ও কল্যান সম্পর্কিত শ্রদ্ধেয় দেব পিথেরোর পৌরানিক কথা সম্বন্ধে চিত্র অঙ্কন করা। কয়েকজন চিত্রকর, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষেরা পিথেরোর চিত্র অঙ্কন করতে পারত। যখন তারা চিত্রাঙ্কন করত দুই বা তিনজন সঙ্গীতজ্ঞ ক্রমাগতভাবে সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরানিক কথা বিশেষতঃ পিথেরো ও ইন্দিরাজার কথা আরতি করে যেত। চিত্রকর্ম করা শেষ হয়ে গেলে আর একটা ধর্মানুষ্ঠান করা হ'তো, যা ছিল অনুমতি সংক্রান্ত, তখন বৃদ্ধরা পিথেরোর আবেশে বিস্তৃতভাবে চিত্রটি পরীক্ষা করতো। যখন মনুমতি পাওয়া যেত তখন একটা পাঁঠা এই চিত্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে বলি দেয়া হ'ত।

ওয়ারলি উপজাতি মহারাষ্ট্রের থানে জেলার মহিয়াদ্রি পর্বতের জংগলে বাস করত। ওয়ারলি নামটা "ওয়ারাল" থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ হল একখন্ড জমি বা মাঠ। ওয়ারলিদের জীবনধারণের প্রধান উৎস ছিল কৃষিকাজ। চিত্রাঙ্কনকে পবিত্র বলে গণ্য করা হ'ত, যা ব্যতিত কোন বিবাহ অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হ'ত না। যে চিত্রাঙ্কন বিবাহ অনুষ্ঠানে করা হ'ত, তার মধ্যে ওয়ারলি চিত্রাঙ্কন অন্যান্য লোকশিল্প থেকে একবারে পৃথক ছিল। কারণ এখানে বিভিন্ন উজ্জ্বল রংগুলিই বেশী ব্যবহার করা হ'ত। পরবর্তিতে এই ওয়ারলি চিত্রাঙ্কনে মেটে বা মাটির ওপর ইটের রং দিয়ে তার ওপর সাদা রং এর সাহায্যে চিত্রাঙ্কন করা হ'ত।

মধুবানী চিত্রাঙ্কন মিথিলা অঞ্চলের গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী অঙ্কন পদ্ধতিতে প্রস্তুত একধরণের চিত্রাঙ্কন। তাদের চিত্রাঙ্কনগুলি সাধারণতঃ প্রথাগতভাবে নারীরাই করত, এবং তা ছিল ধর্মাচরণ সম্পর্কিত। এগুলো সাধারণতঃ বিশেষ কক্ষে (পূজার ঘর, ধর্মানুষ্ঠান করার স্থান, বিবাহ স্থান, বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘর) গ্রামের প্রধান ঘরের দেয়াল ইত্যাদিতে করা হ'ত। আবার কোন আনুষ্ঠানিক পর্ব বা ধর্মানুষ্ঠান করার স্থানেও এই চিত্রাঙ্কন করা হ'ত। নারীরা আন্তরিকভাবে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা কাজ শুরু করার আগে এগুলো করত। শিল্পের মূল উপাদান প্রকৃতি এবং পৌরানিক কাহিনী থেকে আসত। হিন্দু দেবতাদের এবং রামায়ন থেকে নেয়া দৃশ্যগুলি খুব জনপ্রিয় ছিল।

লম্বা জড়ানো পুঁথি যেগুলোকে "ফার্ড" বলা হ'ত। এগুলো তৈরী করা হ'ত যোশিদের দ্বারা, যারা রাজস্থানের ভিলাওয়ারা জেলার শাহপুরা মন্দিরের কাছে থাকতো। তারা দৃশ্যগুলি পৌরানিক বীরদের, যাদের লোকেরা পূজা করত, তাদের জীবনী থেকে নেয়া হ'ত। এই 'ফার্ডগুলি' আবার ভোপা নামে পূজারীরা যখন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গান গেয়ে বেড়াত, তখন এইসব "ফার্ডে" যে দৃশ্যগুলির বর্ণনা থাকত সেদিকে নির্দেশ করে সেই গল্পগুলো সম্বন্ধে গান গেয়ে বেড়াত। অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াংগলের গুটানো পুঁথি চিত্রগুলিকে বলা হ'ত শেরিয়াল গুটানো পুঁথিচিত্র। যা এক বিশেষ সমাজের উৎপত্তি এবং চিত্রের সাহায্যে তাদের দেবদেবী, দৈত্য এবং বীরদের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করত। নাকাশি ভেঙ্কটারামাইয়ার পরিবারই হয়তো শেরিয়াল গ্রামে একমাত্র পরিবার যারা এই শিল্প ধারাটি অনুসরণ করে গেছে। এক সময়ে এই নাকাশিরা দীর্ঘ গুটানো পুঁথিকে লম্বা লম্বা পুঁথির আকারে চিত্রিত করেছে। পূর্বকালে এগুলো গল্পকারদের কাছে খুব চাহিদা ছিল। এই গল্পকাররা নাকাশিদের চিত্রিত এই গুটানো পুঁথিগুলি দেখিয়ে গান ও নাচ সহকারে গ্রাম থেকে গ্রামে গেয়ে বেড়াত।

পটচিত্র পশ্চিমবাংলার একটা ঐহিত্যবাহী শিল্প, যার বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে শিল্পের প্রধান প্রসংগ ও কাল্পনিক কাহিনী। পট একটি বাংলা শব্দ যা সংস্কৃত শব্দ পট্ট থেকে এসেছে যার অর্থ কাপড়। এই শিল্পের প্রকৃত উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায় না। এমন কি এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে গল্পগুলি আছে তাও পরিষ্কার জানা যায় না। পটুয়ারা জাতিতে মুসলমান হলেও তাদের হিন্দু নাম ছিল এবং তারা রামায়ন, মহাভারত ও পুরান থেকে নেয়া গল্পগুলি চিত্রিত করত। 'চিত্রকর' নামে এই সাধারণ উপাধিই তাদের পেশা সম্বন্ধে গুরুত্ব প্রকাশ করত।

এখন পৌর সভ্যতার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে বলে এইসব গ্রাম্য লোকচিত্রের ঐতিহ্যের স্তর নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এইসব লোকেরা এখন অন্য পেশা অবলম্বন করছে, যেমন দৈনিক মুজরের কাজ করছে। তাই তাদের শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে গেছে। বর্তমানে এই চিত্রগুলি সংরক্ষণ করার জন্য তাদের উৎসাহিত করা একটা জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

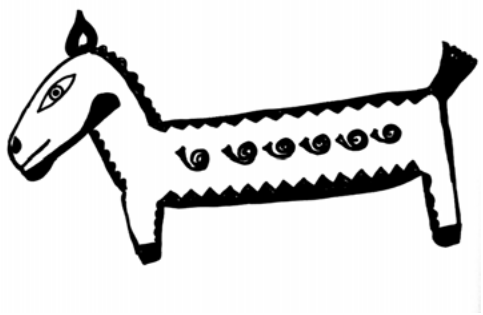

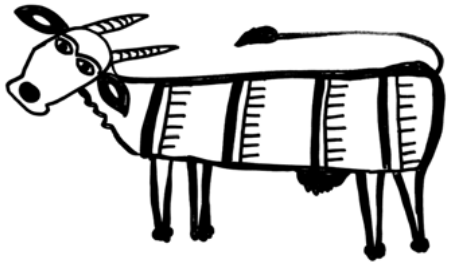

পাঠ্য উপকরণ ৪: লোক সঙ্গীত বা গীতবাদ্য

অত্যন্ত অমেয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের একটি উন্নত ও বিস্তৃত লোক গীতবাদ্যের ধারা রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার এবং ভারতবর্ষের এক একটি অঞ্চল তাদের লোক গীতবাদ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গৌরবমন্ডিত।

অনেক সাংস্কৃতিক বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকগণ নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতি/ আদিবাসী সম্প্রদায়ের গীতবাদ্যকে লোক সঙ্গীতের জৌলুস বলে মনে করেন। যদিও এ সম্পর্কে বেশ মতভেদও রয়েছে। লোক সঙ্গীত বা গীতবাদ্য ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রাণের সংস্কৃতির প্রতিফলন।

অপরদিকে, নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতি/ আদিবাসী সম্প্রদায়ের গীতবাদ্য একেবারেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সংস্কৃতি। যদিও নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতি/ আদিবাসী সম্প্রদায়ের গীতবাদ্য এবং আমাদের প্রচলিত লোক সঙ্গীত এই দু'টো আঙ্গীকই শত শত বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতি/ আদিবাসী সম্প্রদায়ের গীতবাদ্য আদি সঙ্গীত হিসেবে পরিচিত, যখন থেকে তারা গভীর বন-জঙ্গলে বা দুর্গম পাহাড় পর্বতে বসবাস করতে শুরু করে। উভয় লোক সঙ্গীতের আঙ্গিকই আমাদের কাছে বংশানুক্রমে এসেছে। এর আবির্ভাব বা শুরুর কোন সময়কাল নেই। এর উদ্ভাবক বা খ্যাত শিল্পীর কোন ইতিহাসও নেই, উচ্চাঙ্গ ঢংয়ের সঙ্গীতে যেমন উদ্ভাবক ও খ্যাতনামাদের ইতিহাস থাকে। উচ্চাঙ্গ ঢংয়ের সঙ্গীতে গানই শিল্পীদের জীবন-জীবিকার পেশা, কিন্তু উভয় লোক ঢংয়ের সঙ্গীতে এমনটি নয়। উভয় লোক ঢংয়ের সঙ্গীতের শিল্পীরা তাদের জীবন- জীবিকার সাধারণ পেশা যেমন- শিকার, কৃষিকাজ বা যে পেশায় তারা কাজ করে তাতেই তারা নিবেদিত থাকে, গান তাদের প্রণের অংশ, জীবিকার নয়।

সব ধরণের লোক সঙ্গীতের বেলায়ই গ্রামের বয়ঃজেষ্ঠ্য শিল্পীরা (গানের গুরু) তাদের অবসর সময়ে যুবক যুবতীদের এই গানের তালিম দিয়ে থাকেন। এরপর তারা তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ যেমন- বিবাহ উৎসব, আশীর্বাদ উৎসব, জন্ম দিনের উৎসব, অন্যান্য ধর্মী উৎসব, ইত্যাদিতে এই গান গাইতে অনুপ্রাণীত ও সহযোগিতা করেন, যাতে তারা এই গানে দক্ষ হয়ে উঠে। আর এভাবেই গুরু পরম্পরা হয়। এই লোক সঙ্গীতসমূহ কৃষি ক্ষেত্রে ধানের বা অন্যান্য ফসলের চারা রোপন, ফসল কাটা ও গৃহে উত্তোলন এবং অন্যান্য গ্রামীণ পেশার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই গানের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবনে তাদের আশা-আকাংঙ্খা, ভয়-ভীতি, প্রত্যাশা ইত্যাদির চিত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠে। আবার কিছু কিছু ধর্মীয় উৎসবে বিনোদনের সাথে সাথে শিক্ষার অংশ হিসেবেও লোক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। যেমন- বালিকাদের প্রথম রজঃ দর্শনের সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎসবের (ম্যাচ্যুরিটি সেরিমনি) আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে বিশেষ লোক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়, যা ঐ বালিকাদের ভবিষ্যত বৈবাহিক জীবন এবং মাতৃত্বের সক্ষমতার শিক্ষা দেয়।

লোক সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রসমূহ উচ্চাঙ্গ ঢংয়ের সঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদযন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহ আধুনিক এবং এ বিষয়ে কেবলমাত্র পারদর্শিরাই এগুলো তৈরী করেন। অপরদিকে, লোক সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রসমূহ সাধারণ শিল্পীরাই বিভিন্ন স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তৈরী করেন। তবে এ ধরণের বাদ্যযন্ত্রের কোন কোনটির নাম অঞ্চলভেদে এবং শাব্দিক উচ্চারণের কারণে কিছুটা ভিন্ন হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লোক সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রসমূহ স্থানীয় উপকরণ দিয়েই তৈরী করা হয়, যেমন- পশুর চামড়া, ফলের খোসা, পাতা, পশুর পেটের আবরক ঝিল্লি, বাঁশ, নারকেলের খোল বা মালা, তালের আঁশ, মাটির পাত্র, ইত্যাদি। নিম্নে লোক সঙ্গীতে ব্যবহৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্রের তালিকার উল্লেখ করা হ'লো। যেমন-

১. বাঁশরী (বাঁশের বাঁশি)।
২. চিমটা (আগুন তোলার আংটা যার মাথায় ঘুংরু থাকে, সণ্যাসীরা ব্যবহার করে)।
৩. ডাফ (এক ধরণের ড্রাম বিশেষ)।
৪. ঢোলক/ ঢাক (গোলাকার ফাঁপা ড্রাম বিশেষ)।
৫. একতারা, দোতারা (তার, কাঠ ও লাউয়ের শুকনো খোসা দিয়ে তৈরী)।
৬. গেটুভাদাম (বীণা জাতীয় তারের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ)।
৭. ঘাটাম (মাটির এক ধরণের পাত্র)।

৮. কর্তাল (দুই খন্ড কাঠ দিয়ে তৈরী, যার মাঝে ঘুংরু থাকে)।
৯. খোল (মাটির গোলাকার ফাঁপা ড্রাম বিশেষ)।
১০. মাগাদি ভেনা (বাঁশের তৈরী, মাঝে তার থাকে)।
১১. নাগাদা (এক ধরণের ড্রাম বিশেষ)।
১২. নাকুলা (বাঁশের তৈরী)।
১৩. পাং (ড্রাম)।
১৪. পুংগি (সাপের বীন)।
১৫. রাবাব (তার যন্ত্র)।
১৬. সান্তর (একতারা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র)।
১৭. শাঁখ (সঙ্খ)।
১৮. গোপীচান্দ (একতারা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র)।
১৯. থানথিপানাই (এক ধরণের ড্রাম বিশেষ)।
২০. পিনা (একতারা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র)।
২১. ডমরু (এক ধরণের ড্রাম বিশেষ)।
২২. মাদল (এক ধরণের ড্রাম বিশেষ)।

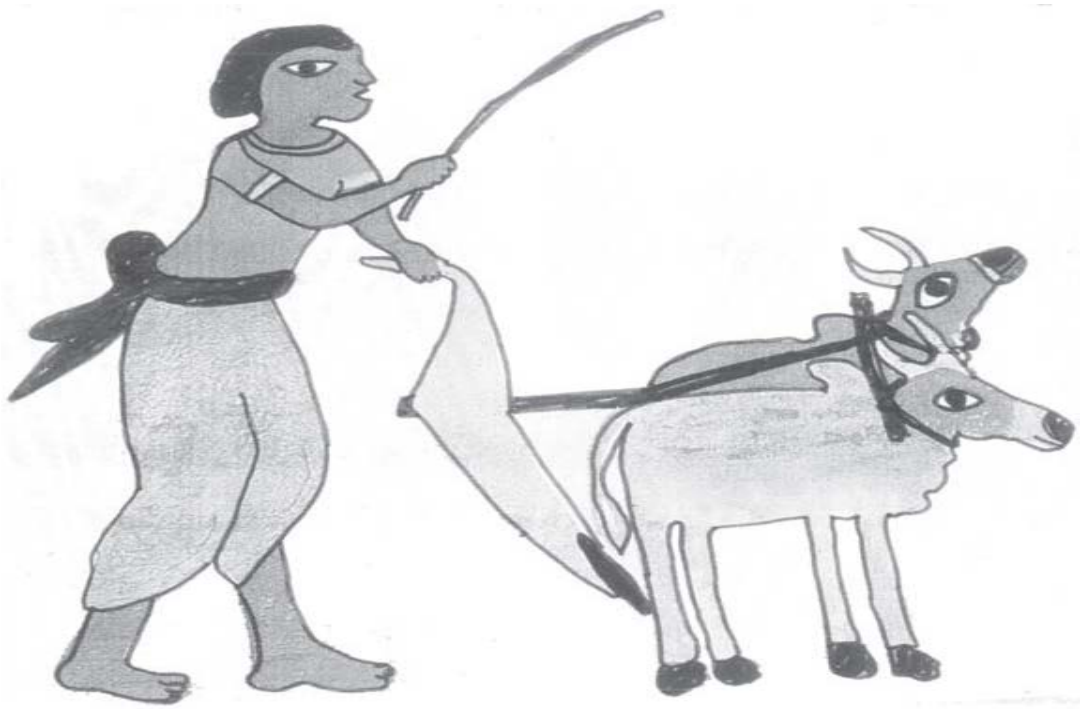

পাঠ্য উপকরণ ৫: কণ্ঠ সঙ্গীত

দক্ষিণ এশিয়া সার্বজনীন সংস্কৃতির নোঙ্গরবন্ধ, বংশগত মর্যাদা, প্রথা, মনোবিদ্যা, এবং নানাধরণের আচার ব্যবহারের একটি শিক্ষাক্ষেত্র। সময়ের বিবর্তনের ধারায় সাম্প্রদায়িকতার ছোবলে এখানে ভারত ভেঙ্গে তিনটি দেশের উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমানেও সাম্প্রদায়িকাতার বিষবাষ্প প্রবাহমান। সম্ভবত এখানকার মানুষের আত্মার টান এখনও অমলিন। সঙ্গীত হচ্ছে এমন একটি ক্ষেত্র যার মাধ্যমে খুব সহজেই এবং পস্কিারভাবে সাম্প্রদায়িকতা এবং সার্বজনীনতাকে অনুভব করা যায়। আমরা আশা করি নিম্নলিখিত কণ্ঠসঙ্গীতসমূহের মাধ্যমে এই উপমহাদেশের জনগণকে একীভূত করে, এমন সার্বজনীনতার বিষয়সমূহ খুঁজে পেতে সক্ষম হ'বো।

উচ্চাঙ্গ/ আধা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

ঠুমরীঃ

ঠুমরী একটি আধা উচ্চাঙ্গ ঢং এর সঙ্গীত। সাধারণত এই সঙ্গীতের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে বর্ণিত এবং ভারতের উত্তর প্রদেশের "ব্রিজ" ভাষার বর্ণনায় লিখিত। ঠুমরী সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনার ক্ষেত্রে ৮ মাত্রার কাহারবা তাল এবং ১৬ মাত্রার আধা তাল ব্যবহার করা হয়েছে। ঠুমরী ১৯ শতকের শুরু থেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত ঢং।

দাদরাঃ

দাদরাও অবশ্য আধা উচ্চাঙ্গ ঢং এর সঙ্গীত। ঠুমরীর সাথে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। দাদরা ঢিমা লয়ে রচিত এবং শিল্পীদের কাছে এই সঙ্গীত পরিবেশন বেশ সাচ্ছন্দমূলক। এই সঙ্গীতের বেলায় যে কোন হালকা তাল ব্যবহার করা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনায় ৮ মাত্রার কাহারবা তাল ব্যবহৃত হয়। এটি "পিলু" এবং "পাহাদী" রাগাশ্রয়ী সঙ্গীত।

ধ্রুপদ :

ধ্রুপদ ওস্তাদ তানসেনের আমলের অত্যন্ত জনপ্রিয় বেশ পুরাতন উচ্চাঙ্গ ঢং এর সঙ্গীত। বাদ্‌শা আকবর যিনি সংস্কৃতি ও সঙ্গীত শিক্ষার ধারাক-বাহক ছিলেন, তার দরবারী লোক সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে ওস্তাদ তানসেন খ্যাত। ধ্রুপদ সঙ্গীত তার বিশুদ্ধ মান এবং একিভূত তালের জন্য বিখ্যাত। সাধারণত পাখোয়াজ যন্ত্রের মাধ্যমে ধ্রুপদ সঙ্গীত পরেবেশন করা হয়। ধ্রুপদ সাধারণত রাজা-বাদশাদের বিজয় গাঁথা, রূপকথার গল্প এবং ভক্তিমূলক কথামালার সমন্বয়ে লিখিত। এর স্বরলিপি ৪টি অংশে বিভক্ত। যথা- স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। এটি সাধারণত ১২ মাত্রার চৌতাল, ৭ মাত্রার তেওড়া এবং ১৪ মাত্রার তালের সঙ্গীত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে এটি একটি কঠিন আঙ্গিকের গান। এর কাঠামোগত কাঠিন্যের কারনে কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক শিল্পীরাই এই সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারে। সাধারণ শিল্পীদের কাছে এই ধরণের গান গাওয়া দুরহ ব্যাপার। তবুও ধ্রুপদ অত্যন্ত জনপ্রিয় গান। ধ্রুপদ যন্তসঙ্গীতেরও একটি ঢং যা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অলংকারস্বরূপ।

ধামারঃ

ধ্রুপদের মত ধামারও অতি পুরাতন এবং উচ্চাঙ্গ অঙ্গের গান। ধ্রুপদের সাথে ধামারের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে ধামারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিষেয়ই বেশী। ধামারকে মাঝে মঝে মাঝে হরি বা হলি নামেও ডাকা হয়। এটি ১৪ মাত্রার তালে গঠিত। ধ্রুপদেও মত ধামারও খুব কম সংখ্যক শিল্পীই গাইতে পারে। তবুও ধামার অত্যন্ত জনপ্রিয় গান।

তারানাঃ

তারানা সাধারনত অর্থহীন সিলেবাস এবং দ্রুত উপস্থাপন ব্যবহার কৌশলের উপর ভিত্তি করে রচিত। কথিত আছে যে, স্বভাব কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ হযরত আমীর খসরু এই তারানা সঙ্গীত উদ্ভাবন করেছিলেন। ভারবর্ষের সর্বত্রই এই তারানার প্রচলন আছে। কর্নাটকি সঙ্গিতে তারানাকে "তিলানা" বলা হয়। তারানা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৃত্যশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

খেয়ালঃ

খেয়াল একটি পার্সিয়ান শব্দ, যার বাংলা অর্থ "চিন্তা" বা "কল্পনা"। ধ্রুপদের মত শাব্দিক ঐক্যতানে এর গুরুত্ব কম। খেয়ালে কাব্যকলি খুবই কম। শিল্পী বা গায়ক গানের কলির প্রত্যেক শব্দ বা শব্দমালা তার অপূর্ব দক্ষতায় বিভিন্ন লয় এবং ঢংয়ে পরিবেশন করে গানকে সম্প্রসারিত করেন। খেয়াল সঙ্গিতের কাঠামো ২টি অংশ বিভক্ত, যথা- স্থায়ী ও অন্তরা।

খেয়াল সঙ্গীত সাধারণত ২ প্রকারের। যথা- বিলম্বিত খেয়াল, যা বড় খেয়াল নামে পরিচিত। অপরটি দ্রুত খেয়াল, যা ছোট খেয়াল নামে পরিচিত। বিলম্বিত খেয়াল ঢিমা লয়ে এবং দ্রুত খেয়াল দ্রুত লয়ে পরিবেশন করা হয়। ১৫ শতকে জানপুরের সুলতান হুসাইন সারকির মাধ্যমে বিলম্বিত খেয়াল অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ এর দরবারে শত শত খেয়াল রচয়িতা সাদারং এবং আদারং এর মাধ্যমে এই বিলম্বিত খেয়াল অধিষ্ঠিত হয়। ১৪ শতকে সঙ্গীতজ্ঞ হযরত আমীর খসরু কতৃক দ্রুত খেয়াল উদ্ভাবিত/ রচিত হয়।

টপ্পাঃ

টপ্পা সাধারণতঃ ছোট তান দিয়ে শুরু হয় এবং মূলতঃ পাঞ্জাবী ভাষায় গীত হয়ে থাকে। টপ্পা সঙ্গীতের পংতিমালা খুবই সংক্ষিপ্ত। এই সঙ্গিতের কাঠামো ২টি অংশ বিভক্ত, যথা- স্থায়ী ও অন্তরা। টপ্পা সম্রাট মুহাম্মদ শাহ্ এর শাসনামলে সঙ্গিতজ্ঞ গোলাম নবী সরি (সরি মাইয়া) কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। এটি একটি স্বল্প উচ্চাঙ্গ আঙ্গিকের গান। এই গান পাঞ্জাব এবং বারানসীতে খুবই জনপ্রিয়। ভারতের বাংলা অংশেও খুবই শ্রুতিমধুর টপ্পা শোনা যায়। টপ্পা সাধারণতঃ খাম্বাজ, কাফী, পিলু এবং ভৈরবী রাগে গীত হয়ে থাকে।

ভক্তিমূলক গানঃ

গজলঃ

ভারত এবং পাকিস্তানে গজল অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গিত এবং মূলতঃ উর্দু ভাষায় গীত হয়ে থাকে। গজল উদ্ভাবনের শুরুতে এটি কবিতার আকারে ছিল। শিল্পীরা গজল গান পরিবেশনের চাইতে কবিতা আবৃতিই বেশী করতেন। কিন্তু বর্তমানে সঙ্গিত হিসেবেই গজলের স্বরলিপি রচিত হচ্ছে। ঐতিহাসিক সূত্র অনুসারে ১২মত শতকে ভারতে গজল গানের সূচনা হয়। এটি পারস্য দেশ থেকে ভারতে আসে। ভারতীয় শিল্পীরা এর মধ্যে বিছুটা স্থানীয় আবেশ সংযোজন করেন। পরবর্তীতে এই গান ভারতীয় মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গজলের সূচনালগ্ন প্রথমে ভারতের উত্তর অঞ্চলে বিশেষ করে গোলকন্ডা ও বিজাপুরে হয়, যখন সেখানে উর্দু সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে গজল সঙ্গিত ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলেও অত্যন্ত জনপ্রিয় স্থান দখল করে।

গজলের কবিতার আঙ্গিক থেকে সঙ্গিতের রূপ পরিগ্রহ করতে বেশ সময় ক্ষেপন হয়েছে। ৯০ শতকে রাজা বাদশাদের দরবারে নর্তকীদের নাচের সাথে এই গানের ব্যবহার শুরু হয়, তখন এটা তাওয়াইফ নামে পরিচিত ছিল।

বর্তমানে গজল মানব সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গজল গানের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম। এটি ভাব প্রধান এবং শ্রবনে শ্রুতিমধুরতা আনে। অনেকে মনে করেন কাওয়ালী পদ্ধতির গান হতে গজলের উৎপত্তি। গজলে বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রনে এবং সূক্ষ্ম স্বরবিন্যাসের কারুকার্য অপূর্ব রসের সঞ্চার করে। গজল গানে বাণীকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। তা'ছাড়া লয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য শিল্পীর পরিবেশনের দক্ষতা বিশেষভাবে উপভোগ্য। গজল সাধারণতঃ হালকা তাল এবং ছোট ছোট রাগের সংমিশ্রনে পরিবেশিত হয়ে থাকে। গজল পরিবেশনকালে মাঝে মাঝে গানের বাণীর ছন্দ ভেঙ্গে একটানা দীর্ঘস্বরে শ্রুতিমধুরভাবে তালবিহীন আবৃতির মত করতে হয়। তখন সেই স্থানগুলোকে শেওর বলে। এই শেওরই গজলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গজলের অনেকগুলো তুক বা কলি পরিলক্ষিত হয়। এর প্রথম তুককে স্থায়ী এবং পরবর্তী তুককে অন্তরা বলা হয়। গজল সাধারণতঃ উর্দু ও ফরাসী ভাষায় গীত রচনা হয়ে থাকে। তবে ইদানিংকালে বিভিন্ন ভাষাতেই গজল গানের কথা লেখা হচ্ছে।

কাওয়ালী ঃ

বর্তমানে কাওয়ালী গাানের বিশেষ জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। কাওয়ালী গানের কথা আধ্যাত্মিক, প্রেম ও ধর্ম বিষয়ক হয়ে থাকে। কাওয়ালী সাধারণতঃ সুফি, সাধু এবং মহাপুরুষরাই বেশী গেয়ে থাকেন এবং পছন্দ করেন। কাওয়ালীর প্রবর্তক সঙ্গীতজ্ঞ হযরত আমীর খসরুর দুইজন শিষ্য সামাত ও নিয়াজকেই মানা হয়। কাওয়ালী বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রন এবং সুক্ষ স্বরবিণ্যাস তথা শিল্পীর পরিবেশনের দক্ষতায় মানব হৃদয়ে অপূর্ব ভাব রসের সঞ্চার করে। কাওয়ালী পরিবেশনকালে যখন গানের বাণীর ছন্দ ভেঙ্গে তালবিহীন শ্রুতিমধুরভাবে বিভিন্ন প্রকার স্বরবিণ্যাস করা হয়ে থাকে, তখন সেই স্থানগুলোকে শেওর বলে। কাওয়ালী একক বা সমবেতভাবেও গাওয়া হয়। সাধারণতঃ ঢোলক বাদ্যের সাহায্যে কাওয়ালী গানের সঙ্গত করা হয়ে থাকে। তবে অনেককে পাশাপাশি তবলা বাজাতেও দেখা যায়। কাওয়ালী পরিবেশনকারীরা সঙ্গতকালীন সময়ে হাতে হালি দিয়ে তাল রাখেন। কাওয়ালী বিভিন্ন তালে গাওয়া হয়ে থাকে। যেমন- দাদরা, পশতু, রূপক এবং কাওয়ালী তাল, ইত্যাদি। কাওয়ালী গায়ককে কাওয়াল বলা হয়ে থাকে। কাওয়ালী সাধারণতঃ উর্দু ও ফরাসী ভাষায় গীত রচনা হয়ে থাকে। তবে ইদানিংকালে বিভিন্ন ভাষাতেই কাওয়ালী গানের কথা লেখা হচ্ছে।

কীর্ত্তনঃ

কীর্ত্তন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিঘোষণ। শ্রী ভগবানের লীলা, নাম ও তার গুণগাণ ভক্তিভাবে গাওয়াকে কীর্ত্তন বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন কাল থেকেই কীর্ত্তন গানের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তবে কবি জয়দেব কীর্ত্তন গানের প্রবর্তক বলে অনেকে মনে করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সাধকগণ, যেমন- বিদ্যাপতি ও চন্ডিদাস বাংলা ভাষায় অনেক কীর্ত্তন বা পদাবলী গান রচনা করেন। তবে বিশেষভাবে শ্রী চৈতন্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বসাধারণের মধ্যে নাম কীর্ত্তন অক্লান্তভাবে প্রচার করেছেন। কীর্ত্তন গানে দেব দেবতার কথা থাকে। কীর্ত্তন গানে বিভিন্ন রাগ রাগিনীর উল্লেখ থাকলেও মিশ্রসূর ও ভাবের প্রাবল্যতা বেশী। কীর্ত্তন গান সাধারণতঃ খোল, কর্তাল, আরবাঁশি, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্রের সাথে গাওয়া হয়ে থাকে। কীর্ত্তন সাধারণত দুই প্রকার, যথা- নাম কীর্ত্তন ও লীলা কীর্ত্তন।

ভজনঃ

ভজন গানের বাণী, ছন্দ মাধুর্য, কাব্য অলংকার এবং সুরের অপরূপ সুলালিত্যে কঠিন অবিনশ্বর হৃদয়কেও ভক্তিভাবরসে উদাসী বাউল করেন তোলে। সেজন্য গানের বাণী মূলতঃ আধ্যাত্মবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। গিরিধারীলাল, শ্রী কৃষ্ণ বিষয়ক ভাষাই এ গানের প্রধান বিষয়বস্তু। ভজন গান সাধারণতঃ হিন্দি ভাষায় গীত হলেও, বাংলা বা অন্য ভাষায়ও গীত হয়ে থাকে। এ গান ভাব প্রধান। ভজন গানের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, ভক্তি ভালবাসার আকুলতা, চির মিলনের কঠিন প্রতিক্ষা, প্রেম বিরহ রসের সমাহার তথা বিশ্ব পিতার প্রতি ভক্তি ও প্রেম তৃষ্ণার করুন হৃদয়স্পর্শী নিবেদন। ভজন গানের প্রবর্তক হিসেবে মীরাবাঈ, সুরদাস, তুলসীদাস, কবীর, নানক, ব্রজবন্দ, রুহীদাস প্রমূখের নাম আজও মানব হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে আছে এবং থাকবে।

হোরী বা হোলীঃ

ধামার গানের অনুকরণে হোরী গান রচিত। রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক এবং বসন্তকালের হোলী উৎসবের রূপলীলা বর্ণনামূলক ভাষা এই গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে ধামার পরিবেশনের সাথে হরি পরিবেশনের পার্থক্য আছে। এছাড়া গানের ভাষাও সংক্ষিপ্ত। এই সঙ্গিতের কাঠামো ২টি অংশ বিভক্ত, যথা- স্থায়ী ও অন্তরা। ধামার অপেক্ষা হরি গানের গতি এবং প্রকৃতি লঘু ও চঞ্চল। হোলী সাধারণতঃ দীপচন্দী, ত্রিতাল ও কাহারবা তালে গীত হয়। হোলী গানে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য অধিক লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ঠুমরী গানের সাথে হোলী গানের বিশেষ মিল আছে।

সাদ্‌রাঃ

সাদ্‌রা গান ঝাপতালে নিবদ্ধ। পূর্ববর্তীকালে ধ্রুপদ গানের পরে সাধারণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনার্থে সাদ্‌রা গান পরিবেশন করা হ'তো। বর্তমামানে সাদ্‌রা দুই প্রকারে শুনতে পাওয়া যায়। যথা- ধ্রুপদ অঙ্গে ও খেয়াল অঙ্গে। ধ্রুপদ অঙ্গের সাদ্‌রার ভাষা ও গাইবার রীতি ধ্রুপদের মতই। এতে বাট, লয়কারী, ইত্যাদি অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার খেয়াল অঙ্গের সাদ্‌রার ভাষা ও গাইবার রীতি খেয়ালের মতই। এরজন্য এতে বোলতান, স্বরগম, তান, ইত্যাদি অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাম্‌দ ও নাদ্‌ ঃ

খোদার অপার মহিমা বর্ণনা এবং তাঁর সকল সৃষ্টি বিষয় নিয়ে রচিত গানই হাম্‌দ ও নাদ্‌। হাম্‌দ ও নাদ্‌ গাইবার সময় কোন যন্ত্র উপকরণ সাধারনতঃ ব্যবহার করা হয় না। অধিকাংশ হাম্‌দ ও নাদ্‌ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেছেন। ধর্মপ্রান মুসলমানদের মধ্যে এই গান খুবই জনপ্রিয়।

লোকগীতি ও অন্যান্য ঃ

লোকসঙ্গীতঃ

যে গানের মাধ্যমে সমাজের অতি সাধারণ মানুষ তাদের হৃদয়ের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা এবং আশা-আকাঙ্খাকে পূর্ণভাবে ব্যাক্ত করে তাকেই লোকসঙ্গীত বলে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই লোকসঙ্গীতের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কবে থেকে এই লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে তা আজও অজ্ঞাত। তবে মানুষ যখন থেকে সভ্যতার আলোক পেতে থাকে তখন থেকেই এই সঙ্গিতের সৃষ্টি ধরা যায়। গ্রামে গঞ্জে গায়করা অবসর সময়ে দোতারা বা একতারা বাজিয়ে এই গানের আসর জমিয়ে গ্রামের মানুষের হৃদয় ভরিয়ে তোলে। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে, ক্ষেত নিড়ানো এবং ধান কাটার সময় বিভিন্ন সুরে এই গান গাইতে দেখা যায়। এই গান শুনলে পল্লী মানুষের একটি সুন্দর ছবি হৃদয়ে ভেসে ওঠে।

ভাটিয়ালীঃ

লোকসঙ্গীতের মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ভাবপ্রবন গান ভাটিয়ালী। নৌকার মাঝি নদীর ভাটির টানে নৌকা ছেড়ে, নৌকার হাল ধরে উদাত্ত কণ্ঠে এবং আপন মনে টানা সুরে যে গান গায় তাই ভাটিয়ালী গান। নদী যেমন বন্ধনহীন, সীমাহীন, ভাটিয়ালী গানও তেমন বন্ধনহীন, সীমাহীন। ভাটিয়ালী গানের বৈশিষ্ট্য ছন্দ বিচিত্রহীন এবং এর চলন বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে। একতারা বা দোতারার সাহায্যে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। ভাটিয়ালী গানের সুর ঢেওয়ের মত গড়িয়ে যায়, মনে হয় নদীও সেই সুরের তালে আপন মনে বয়ে চলেছে। পল্লীর মানুষের সাধারণ জীবনের ছবি একমাত্র ভাটিয়ালী গানের সুরেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

ত্রিবটঃ

ত্রিবট গানে তিনটি অংশ বিরাজিত। এতে সাধারণত গানের বাণী, পাখোয়াজের বোল এবং তারানা বা স্বরগমের অংশ থাকে। এ গান খেয়াল অঙ্গে গীত হয়ে থাকে। ত্রিবট গানে বিভিন্ন তানের কারুকার্য্যও ব্যবহৃত হয়। তারানা প্রচলনের পর বর্তমানে ত্রিবট প্রায় শোনা যায় না।

চতুরঙ্গঃ

চতুরঙ্গ গানে মোট চারটি অংশ থাকে। যথা- গানের বাণী, পাখোয়াজের বোল, তবলার বোল এবং তারানা বা স্বরগমের অংশ। এ গানও খেয়াল অঙ্গে গীত হয়ে থাকে। এই গানের আভোগে গায়কের নাম উল্লেখ থাকে এবং চতুরঙ্গ এ শব্দটিরও উল্লেখ থাকে। এই সঙ্গিতের কাঠামো ২টি অংশ বিভক্ত, যথা- স্থায়ী ও অন্তরা। এটি তারানা অঙ্গে গীত হয়ে থাকে।

বাউলঃ

আধ্যাত্মিক সাধনা হ'তেই বাউলের উৎপত্তি। মানব ধর্মই এই সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্য। বাউল শব্দটি হিন্দি। বাংলায় এর অর্থ বাউরা বা পাগল। এখানে পাগল বলতে ঈশ্বর প্রেমে আত্মভোলা সম্প্রদায়কেই বোঝায়। বাউল গানের বাণী অনেকটা হালকা হলেও এর মর্মার্থ অনেক গভীরে, মূলতঃ পরমার্থ বিষয়ক। আত্মার সাথে আত্মীয়তা এবং মমত্ববোধই বাউল গান বা বাউল ধর্মের অন্তর্নিহীত গুঢ় তত্ত্ব। এই আত্মার সন্ধানেই বাউলেরা নিরুদ্দেশ যাত্রা পথের পথিক। এদের পোষাক পরিচ্ছদও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। একতারা সহযোগেই এ গান অধিক পরিবেশিত হয়ে থাকে।

গম্ভীরাঃ

গম্ভীরা মালদহ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গান। শিবকে কেন্দ্র করেই এ গানের ভাষা রচিত। তবে সামাজিক বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করেও গম্ভীরা গান রচিত হয়ে থাকে। মূলতঃ পৌষ সংক্রান্তি, গাজন ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই এ গান অধিক পরিবেশিত হয়ে থাকে। গম্ভীরা গানে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কয়েকটি সুরের সংমিশ্রনে এর উৎপত্তি। গম্ভীরা সাধারণতঃ দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে।

ভাওয়াইয়া ঃ

ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার অঞ্চলের বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় লোকগীতি। ভাওয়াইয়া গানে সাধারণতঃ বিরহ বিচ্ছেদ মিশ্রিত ভাষায় করুন এবং মধুর রসের সুরে অন্তরকে সহজেই দ্রবীভূত ক'রে তোলে। এর সুরের সুমধুর ব্যঞ্জনা এবং অন্তর্নিহিত ভাবকে যথাযোগ্য রূপদানে সক্ষম বলেই এ গানকে ভাওয়াইয়া গান বলা হয়। সাধারণতঃ দোতারার সহযোগে এই গান গাওয়া হয়।

চারণ গানঃ

তৎযুগে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে যারা গান রচনা করতেন তাঁদেরকে চারণ কবি বলা হ'তো। অতি সহজ ও সরল সুরে তারা গান রচনা করে গ্রাম গ্রামান্তে বা পল্লীতে পল্লীতে গেয়ে বেড়াতেন। এতে করে গ্রামবাসীগণ অতি সহজেই দেশ বিদেশের ঐতিহাসিক ঘটনা ও খবর অক্লেশে জানতে পারতেন। চারণ কবিরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁদের ভাট বা ভট্ট বলা হ'তো।

সারি গানঃ

নৌকা বাইচ্ এবং ছাদ পেটানোর সময় সারিবদ্ধভাবে বিশেষ তালে ও ছন্দের মাধ্যমে এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। তাই এর নাম সারিগান। সারিগান সাধারণত দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। এর সুরটিও থাকে দ্রুত।

ঝুমুরঃ

ঝুমুর এক প্রকার নৃত্যবহুল আদিরসাত্মক লোক সঙ্গীত। চতুর্দশ শতাব্দি থেকে শাঁওতাল, কোল, মুন্ডা প্রবৃতি সম্পদায়ের মধ্যে এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। এদের প্রতিটি উৎসব ঝুমুর গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক বিষয়বস্তু এই গানে প্রধান উপজীব্য। ঝুমুর গানে পুরুষেরা নৃত্যের তালে মাদল ও বাঁশি বাজায়। মেয়েরা দলবদ্ধভাবে নাচের গান গায়। এ গান সকলের সাবলীল এক আনন্দ ও অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

পঞ্চ কবির গানঃ

বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চ কবির গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। বলতে গেলে পঞ্চ কবির গান মানুষের প্রানের গান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনী কান্ত এবং অতুল প্রসাদ এই পাঁচজন কবিকে একত্রে পঞ্চ কবি বলা হয়।

পাঠ্য উপকরণ ৬ : সিনেমা

মূলধারার বোম্বে সিনেমা জন্মের পর থেকে এখনও বিভিন্নভাবে দক্ষিণ এশিয়ার "কম্পোজিট হেরিটেজ বা সমন্বিত ঐতিহ্য" সংরক্ষণ, প্রচার ও জনপ্রিয়করণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এভাবে সিনেমা "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" সংরক্ষণ ও প্রচারে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বলিউড সিনেমা দক্ষিণ এশিয়ার একটি প্যান-উপ-সংস্কৃতি তৈরী করেছে, যা সমন্বিত বৈশিষ্ট্যের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। এভাবেই জনপ্রিয় বোম্বে সিনেমা কেবল "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এর ধারকই নয়, বরং এটি সংস্কৃতি তৈরি করছে, যা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা নিদর্শনগুলি অন্যান্য সাংস্কৃতিক ভূখন্ডে ছড়িয়ে দিয়েছে। করেছে সর্বভারতীয় নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যম। এখানে কয়েকটি উপায় বর্ণনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বোম্বে সিনেমায় দক্ষিণ এশিয়ার "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

১. গ্রহনযোগ্যতাকে জীবনের উপায় হিসাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমঃ

সুচনালগ্ন থেকে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আন্তঃসম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন একটি তাত্ত্বিক উদ্বেগের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। জীবনে এই পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার গুরুত্ব ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়স্তরে আন্ত:সম্প্রদায়িক সম্পর্ক শক্তিশালীকরণে এর ভূমিকা বারবার সেলুলয়েডে (ছবির মাধ্যমে) প্রকাশিত হয়েছে। নিজের স্বকীয়তাকে অন্যের সাথে স্থাপন এবং একাত্ম হয়ে অন্যান্য সাংস্কৃতিক / নৃগোষ্ঠীয় / ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে মানুষ তার সংকীর্ণ মনোভাব এবং শত্রুতা না দেখিয়ে বরং শক্তিশালী, মানবিক এবং সংবেদনশীলতার বিষয়গুলো আমাদের চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছে, যা সমাজে মানুষের কাছে অনুকরণীয়। এই দিক নির্দেশনা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র হলো- খুদা কি শান (১৯৩১), পরোসী (১৯৪১), হাম এক হ্যায় (১৯৪৬), আর পার (১৯৫৪), হাম পাঁঞ্চে এক দলকে (১৯৫৭), চার দিল চার রাহেন (১৯৫৯), কাবুলিওয়ালা (১৯৫৮), সাট হিন্দুস্থানী (১৯৬৯), নানহা ফারিস্তা (১৯৬৯), পন্ডিত অর পাঠান (১৯৭৬), আমার আকবর অ্যান্থনি (১৯৭৭), সাজা-ই-কালাপানী (১৯৯৭), গোলাম-ই-মোস্তফা (১৯৯৭)), লাগান (২০০১), আরও অনেক।

২. সম্প্রদায়ের চরিত্রগুলোর ইতিবাচক চিত্রায়নের মাধ্যমঃ

আমাদের সমন্বিত ঐতিহ্যের ভিত্তি হচ্ছে ঐক্য ও সম্প্রীতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি যা দু'টি স্তম্ভ হিসাবে পরিচিত। পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা, প্রশংসা, সমবেদনা এবং সদিচ্ছার অনুশীলনকারী সংখ্যালঘুদের আইকনিক চিত্রগুলির চিত্রায়ন এবং মানুষ ও সমাজকে সান্তনা এনে দেওয়া আমাদের জনপ্রিয় সিনেমার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রগুলি হলো: বাজি (১৯৫২, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান চরিত্র), গরম কোট (১৯৫২, মুসলিম চরিত্র), বুট পালিশ (১৯৫৪, খ্রিষ্টান চরিত্র), পিয়াসা (১৯৫৫, মুসলিম চরিত্র), ধুল কা ফুল (১৯৫৯, মুসলিম চরিত্র), আনারি (১৯৫৯, খ্রিষ্টান চরিত্র), জাঞ্জির (১৯৭৩, পাঠান চরিত্র), আঞ্জুমান (১৯৮৬, হিন্দু চরিত্র), হাতিয়ার (১৯৮৯, মুসলিম চরিত্র), মিস বিটলি'স চিলড্রেন (১৯৯৯, ইংরেজি ধমপ্রচারক), হুকুমাত (১৯৯৭, উভয় মুসলিম এবং খ্রিষ্টান চরিত্রগুলি), সরফরোষ (মুসলিম চরিত্র), এবং আরও অনেক।

এই জাতীয় চলচ্চিত্রগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সম্প্রদায়ের চরিত্রগুলো বিভিন্ন নাম ভূমিকায় প্রায়শঃই অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা অভিনয় করে। তাই, পন্ডিত এবং পাঠানে, পন্ডিতের ভূমিকা একজন মুসলমান, মাহমুদ এবং একজন পাঠক হিন্দু জোগিন্দার দ্বারা পাঠানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এটি আমাদের চলচ্চিত্র গুলিতে বেশিরভাগ (যদিও সমন্বয়) সম্প্রদায়ের চিত্রের ক্ষেত্রে সত্য।

এটা লক্ষনীয় যে, দিলীপ কুমার (বাস্তব জীবনে ইউসুফ খান), বোম্বাই সিনেমার এক প্রতিমূর্তি, তিনি কখনও মুসলিম চরিত্রে অভিনয় করেননি (ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র মুঘল-ই-আজমএবং আজাদের এক ছদ্মবেশী মুসলমানের চরিত্র বাদে) এবং ১৯৬০ এর দশকের বেশিরভাগ মুসলিম সমাজের প্রধান ভূমিকায় গুরু দত্ত, অশোক কুমার, রাজেন্দ্র কুমার, প্রদীপ কুমার এবং রাজেশ খান্না প্রমুখ অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন।

৩. ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রগুলির মাধ্যমে বিমিশ্র **ঐতিহ্য, যৌগিক সংস্কৃতি ও পারস্পরিক স্বীকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্ব উদ্ভাবনঃ**
অনেক ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার **সমন্বিত** সংস্কৃতির তত্ত্বগুলি হিন্দু এবং মুসলিম নায়কদের একটি ইতিবাচক চরিত্রের চারদিকে আবর্তিত হয়েছিল। সোহরাব মোদীর পুকার (১৯৩৯), মেহবুব খানের হুমায়ুন (১৯৪৫), এবং কে আসিফের মোগল-এ-আজমের মতো মহাকাব্যগুলি এই ধারার অগ্রদূত ছিল। মধ্যযুগীয় সময়ের তানসেন (১৯৪৬), বৈজু বাওড়া (১৯৫২), সংগীত সম্রাট তানসেন (১৯৫৯), রানী রূপমতি (১৯৬০) এবং মীরা (১৯৯০) এর মতো আধা-ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রে ব্যতহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি তাদের ভারতীয় সাংস্কৃতিক নৈতিকতার দৃঢ় উপস্থাপনের জন্য বোঝা যায় মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজ্য সচেতনভাবে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ও আখ্যান থিয়েটারে অনাড়ম্বর সম্প্রদায়গত সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি প্রসারিত করে।

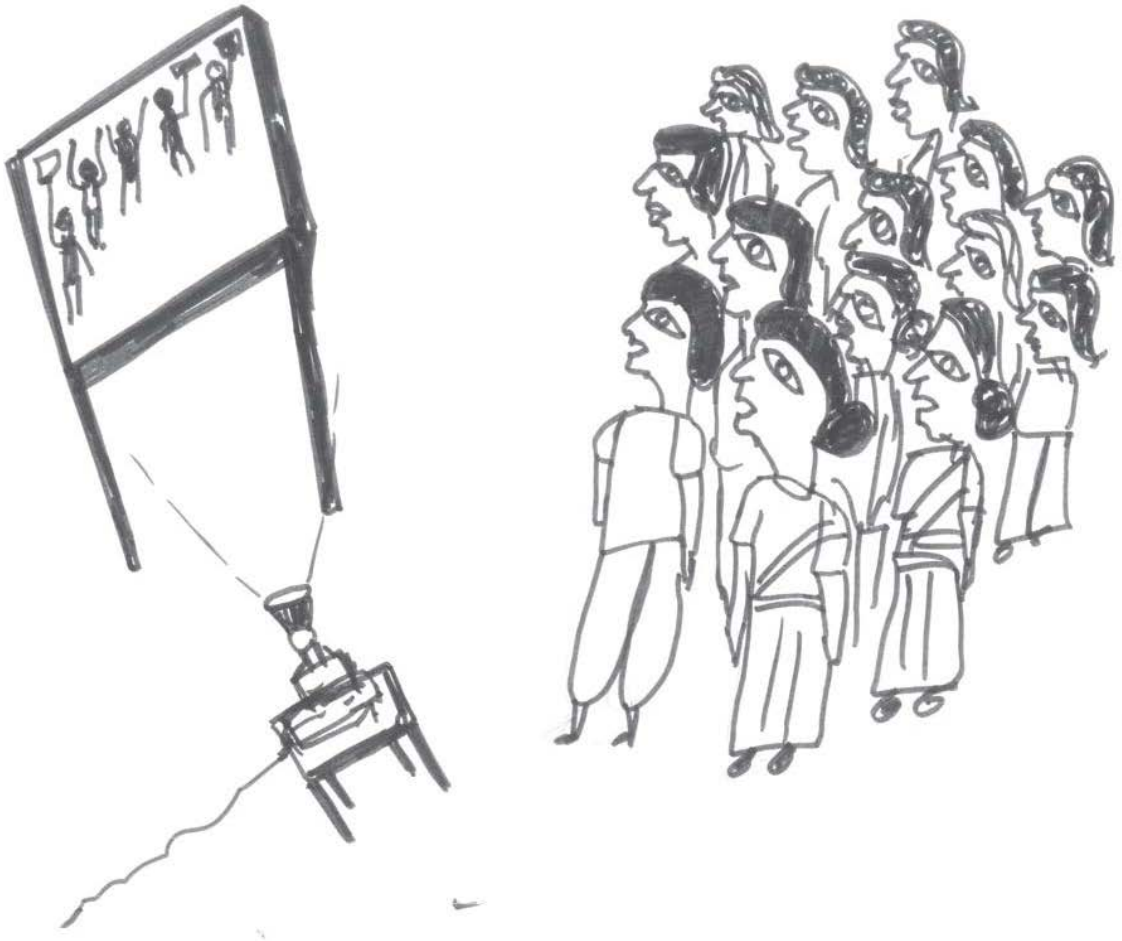

নোটসমূহ ঃ

অনুশীলন- ৫: দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রেক্ষাপট

উদ্দেশ্য: নিজ নিজ এলাকার দ্বন্দ্বসমূহ চিহ্নিত করা, দ্বন্দ্বসমূহ স্বীকার করে নেয়া এবং এর পেছনের প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করা।

নিম্নলিখিত পয়েন্ট সম্বলিত একটি চার্ট বোর্ডে/ পোষ্টার পেপারে উপস্থাপন করুন-

- আপনার এলাকায় কোন সামাজিক টানাপোড়েন (টেনশন) রয়েছে কি?
- যদি থাকে তবে তা কি ধরনের?
- এই ধরণের সামাজিক টানাপোড়েনের জন্য কি বা কারা দায়ী বলে মনে করছেন?
- সামাজিক টানাপোড়েনসমূহ হ্রাসকরণে কি কি প্রতিরোধমূলক শক্তি কাজ করছে?
- সামাজিক টানাপোড়েনসমূহ হ্রাসকরণ এবং নিরসনে কি কি ধরণের কৌশল গ্রহণ করা হয়?

প্রক্রিয়া:

- যদি অংশগ্রহণকারীগণ একই এলাকার হয় তবে গণনার মাধ্যমে দলে ভাগ করুন অথবা অঞ্চলভিত্তিক দল গঠন করুন।
- দলে তিনি সবাইকে উপরিল্লিখিত বিষয় (ভবিষ্যতে সামাজিক টানাপোড়েন হ্রাসের কৌশল) সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণা এক এক করে বিনিময় করতে বলবেন। এসময় সবাই সবার ধারণা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এরপর তিনি সবার ধারণা একত্রিত বা সমন্বয় করে দলীয়ভাবে ধারণা তৈরী করতে বলবেন। এসময় সহায়ক প্রত্যেক দলে ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম সরবরাহ করবেন। দলীয় আলোচনার জন্য ১ ঘন্টা সময় দেয়া হবে।
- সহায়ক ছোট দলের সমন্বিত ধারণা ফ্লিপচার্টে লিখতে বলবেন।
- এরপর সহায়ক ছোট দলের সমন্বিত ধারণা বড় দলে উপস্থাপন করতে বলবেন।

পরামর্শ:

সহায়ককে মনে রাখতে হবে যে, অংশগ্রহণকারীগণ যেন ভবিষ্যতে সামাজিক টানাপোড়েন হ্রাসের কৌশল প্রণয়নের সময় অবশ্যই যেন উপরোল্লিখিত ৫ টি প্রাসঙ্গিক পয়েন্ট মনে রাখেন।

সেশন উপকরন:

পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিন টেপ

সময়:

২ ঘন্টা।

সহায়কদের জন্য নোটঃ

এ পর্যন্ত, আমরা **বিমিশ্র** ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। কিন্তু, এ ছাড়াও সমাজের কিছু কঠোর বাস্তবতা রয়েছে যা আমাদের টানাপোড়েন ও বিরোধের অংশ হয়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই টানাপোড়েন ও তার পিছনের কারণগুলো জানব এবং এই পরিস্থিতি প্রশমনে সম্ভাব্য যেসব অনুকূল শক্তি রয়েছে সেগুলো বুঝার চেষ্টা করব।

এই অধিবেশনের মাধ্যমে, অংশগ্রহণকারীগণ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব এলাকার বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পারবেন। একই রকম সামাজিক টানাপোড়েন ও বিরোধ থাকা স্বত্বেও অংশগ্রহণকারীগণ ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসার কারণে তাদের সামাজিক টানাপোড়েন ও বিরোধের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এই সামাজিক টানাপোড়েন ও বিরোধের কারণ জানা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। এছাড়া এটাও আমাদের দেখতে হবে যে উপযোগী ও কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়ক হবে এমন প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলিকে যেন বাধা না দেয়।

সহায়ককে অংশগ্রহণকারীদের অনুধাবন করাতে হবে যে সামাজিক টানাপোড়েন ও বিরোধের মূল কারণগুলো কোন নির্দিষ্ট এলাকার সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে সৃষ্ট। সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে জাতিভেদ প্রথা , সাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণবাদ এবং অন্যান্য বিরোধের মূল প্রোথিত।

সহায়ককে মনে রাখতে হবে যে, সমাজে তারা যখন কাজ করে তখন অংশগ্রহণকারীগণ অনেক সময় সমস্যাটির ভিন্নতা বিবেচনা না করে তারা শুধুমাত্র সমস্যার এক দিক নিয়ে চিন্তা করে। তাই সহায়ককে অবশ্যই অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তাদের এলাকার সমস্যার ভিন্নতা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা কোন বিষয় সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে পারে।

সহায়ক যখন বিভিন্ন ধরনের সামাজিক টানাপোড়েন ও বিরোধের উদাহরণ ব্যাখ্যা করবেন তখন তাকে অবশ্যই সামাজিক টানাপোড়েন ও বিরোধের পিছনের শক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে, যা অংশগ্রহণকারীদের একটি নতুন দিক নির্দেশনা দিবে। এই ধরনের বিরোধের পিছনে বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে তারা মানুষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন বিষয় সম্পর্কে উদাসীনতা, এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মানসিকতা সম্পর্কে বলতে ব্যর্থ হন। আমরা মানবাধিকার কর্মীরাও অনেক সময় পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করি। আমাদের এ ধরনের আচরণ কিংবা উদাসীনতা এবং দায়িত্বহীন মনোভাবের দ্বারা অনেক সময় এই সামাজিক বিরোধ আরও উৎসাহিত হতে পারে।

নোটসমূহ ঃ

অনুশীলন- ৬: "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যের" নেতীবাচক ভূমিকা।

উদ্দেশ্য: সমাজে বিমিশ্র ঐতিহ্যের কিছু কিছু ধরণ আছে যেগুলোর নেতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি সামাজিক টানাপোড়েন ও বিরোধ তৈরীতে যে ভূমিকা

প্রক্রিয়া:

- অনুশীলনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি রূপরেখা তৈরী করা ও পরিচালনার লক্ষ্যে পরিবেশ সৃষ্টি করা
- একটি গল্প বা কেস পড়তে দিন কিংবা মুভি প্রদর্শন করুন
- এসময় সহায়ক দলে সবাইকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণা দলে আলোচনা করতে বলবেন। সহায়ক প্রত্যেক দলে ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম সরবরাহ করবেন। দলীয় আলোচনার জন্য ৩০ মিনিট সময় দেয়া হবে।
- সহায়ক ছোট দলের সমন্বিত ধারণা ফ্লিপচার্টে লিখতে বলবেন।
- এরপর সহায়ক ছোট দলের সমন্বিত ধারণা বড় দলে উপস্থাপন করতে বলবেন।

নেতিবাচক বিমিশ্র ঐতিহ্য নিয়ে ছোট বাজ দলে অংশগ্রহণকারীদের ৩০ মিনিট আলোচনার সুযোগ দিতে হবে।

আলোচ্য বিষয়সমূহ:

- আপনার দৃষ্টিতে ঐতিহ্যসমূহ কি কি যেগুলো নেতিবাচক বিমিশ্র ঐতিহ্য সৃষ্টি করে?
- কেন নেতিবাচক ঐতিহ্যগুলোকে গ্রহণ করি?
- কিভাবে নেতিবাচক ঐতিহ্যসমূহ সমাজে বিমিশ্র ঐতিহ্যে পরিনত হলো?
- কিভাবে নেতিবাচক ঐতিহ্যগুলো সমাজের অংশ হিসেবে পরিনত হলো?

আপনি যদি কোন গল্প বলে থাকেন কিংবা মুভি দেখিয়ে থাকেন তাহলে ওগুলোতে প্রদর্শিত চরিত্র এবং অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালা তৈরী করুন।

দল গঠন:

দল গঠনের ক্ষেত্রে সহায়ক শুধু নারী ও পুরুষ ভিত্তিতে করবেন না। বরং সম্ভব হলে, সহায়ক চেষ্টা করবেন গ্রুপগুলো যাতে এমনভাবে গঠিত হয় যেখানে, ধর্ম, সম্প্রদায়, নারী, পুরুষ, বর্ণ, শ্রেণি ইত্যাদির সমন্বয়ে ঘটে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি:

চার্ট, মার্কার, টেপ, গল্প এবং মুভি।

মোট সময় :

২ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

সহায়কদের জন্য নোটঃ

আমরা দ্বন্দ্ব প্রবণ সমাজে কাজ করতে সমন্বিত ঐহিত্যকে একটি টুলস্ হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক সময় সমন্বিত ঐতিহ্যের কিছু উপাদানকে উপেক্ষা করে থাকি, যেগুলো যুগ যুগ ধরে সমাজে বিভাজন/বিভেদ তৈরী করছে। প্রকৃতপক্ষে এই উপাদানগুলোই সমাজে সহিংসতা, শোষণসহ সমাজের বিরাট অংশকে দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। উদাহারণ হিসেবে জেন্ডার বৈষম্য, বর্ণপ্রথা এবং জাতিগত শোষণ ও দমনের মতো সমন্বিত ঐতিহ্যের উপাদান কিংবা ধরণের কথা বলা যায়। আরো পরিস্কার করতে বিমিশ্র ঐতিহ্য হিসেবে জেন্ডার ভিত্তিক শোষণের কথা বলতে পারি, যা নারী পুরুষ ভেদে পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। পুরুষ জন্মগতভাবে কিছু সুবিধাদি পায়, যা পুরুষদের জন্য একটি সমন্বিত ঐতিহ্যে রূপ নেয়। সারা পৃথিবীব্যাপী পুরুষরা সর্বদাই সুবিধাভোগী। সীমারেখা ও সমাজ নির্বিশেষে জেন্ডার বৈষম্যের এই অভিন্নতাকে নারীদের ক্ষেত্রে সমন্বিত ঐতিহ্যে পরিণত করে।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। সমাজে এমন নানা উদাহরণ পাওয়া যায়, যা নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমন্বিত ঐতিহ্যে পরিণত হয়। পুরুষেরা জেন্ডার বৈষম্যকে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি মূল্যবোধ হিসেবে নিশ্চিতভাবে টিকিয়ে রাখতে চায়। সমাজে পুরুষেরা সচেতনভাবেই সে লক্ষে কাজ করে। নারীরা যাতে এই ব্যবস্থাকে অদৃষ্ট এবং সমগ্র সমাজের মূল্যবোধ হিসেবে মেনে নেয়, সেই জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শিশুবেলা থেকে একজন কন্যা শিশুকে ঘরে, ঘরের বাইরে এবং সমাজে কেমন আচরণ করতে হবে সেই শিক্ষা দেয়া হয়। যে শিক্ষাটি মূলত: পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রত্যাশা করে।

এই শিক্ষা প্রক্রিয়াটি পরিবার, সমাজ ছাড়িয়ে স্কুল এবং কলেজের পর্যায়ে পর্যন্ত এই লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করছে। এমনকি আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোও এই বৈষম্য থেকে মুক্ত নয়। কন্যা শিশুটি যখন বড় হয়, তখন সে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নির্ধারিত সকল রীতি ও মূল্যবোধকে মেনে নেয়। এইভাবে নারীর ঐসব নেতিবাচক মূল্যবোধ ও রীতি নীতির ধারক ও বাহক শুধু নয়, তারজন্য তাকে দায়ী থাকাসহ জবাবদিহিও করতে হয়। এক সময় সে স্বেচ্ছায় ও বিনা প্রতিবাদে সমাজে পুরুষের প্রাধান্যকে মেনে নেয়। বিয়ের আগে বাবার বাড়িতে মেয়েরা ভাইদেরকে তাদের কর্তৃত্বকারী এবং বিয়ের পরে স্বামীকে তার 'প্রভূ বা মালিক' হিসেবে মেনে নেয়। মা সর্বদা ছেলে শিশু জন্ম দিবে এটাই সবার প্রত্যাশা। সমাজে যে নেতিবাচক মূল্যবোধ ব্যবস্থার মধ্যে নারী বড় হয়েছে তার কারণে মা হয়েও সে তার ছেলে ও মেয়ে সন্তানকে বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখে। এককথায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যাশা অনুসারেই নারীরা সেচ্ছায় সবকিছ পালন করে। যখনই সমাজে নারী পুরুষ বংশানুক্রমে কিছু বিশ্বাস, মূল্যবোধ ধারণ, বহন এবং সংরক্ষণ করে তখনই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরো সমাজের জন্য একটি সমন্বিত ঐতিহ্যে পরিনত হয়।

অনেকটা একই প্রক্রিয়াই বর্ণপ্রথাও বিশেষ করে ভারতে এবং সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় টিকে আছে। নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে এই মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তারাও এটাকে নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়। যে ব্যক্তিটি অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণজাত, যাদেরকে আমরা শুদ্র নামে জানি তাদেরকেও এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে উচ্চবর্ণজাত মানুষদেরকে সেবা করারই তার ধর্ম। ধর্ম থেকেই এই ব্যবস্থাটি বৈধতা পেয়েছে। যখনি একজন শুদ্র এই সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নেয় তখনই সে এই ব্যবস্থার বাহক ও সংরক্ষক হয়ে যায়।

বিধাতার ইচ্ছা হিসেবে মেনে নিতে এই ব্যবস্থাকে যারা সৃষ্টি করেছে তাদের সেই ধারণার সাথে মিলিয়ে শূদ্ররাও একই রকম ধারণা পোষণ করে। এই সমাজ ব্যবস্থাকে শোষক ও শোষিত উভয়ই যখন মেনে নেয় তখনই এটা উভয়ের জন্য বিমিশ্র ঐতিহ্যে পরিণত হয় এবং সময়ের পরিক্রমায় এই বিমিশ্র ঐতিহ্য রূপে এর অবস্থান মজবুত হয়। ঐতিহ্যেরও কিন্তু সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করার ক্ষমতা রয়েছে।

নোট- ১ ঃ বিষয় ভালভাবে অনুধাবনের জন্য সহায়কগন পাঠ উপকরণ ১-৪ পাঠ করতে পারেন (পৃষ্ঠা ৬৩-৭৬ পর্যন্ত)।
নোট- ২ ঃ সৎগতি, ধর্ম, মরিচ-মশলা, দিক্ষা, পিঙ্ক, ইত্যাদি মুভি দেখানো যেতে পারে।

পাঠ্য উপকরণঃ ১

রাজকিশোর আমার প্রিয় বন্ধু।
রাজকিশোর, আমার জীবনে প্রথম প্রিয় বন্ধু।

এটা ১৮ বছরের পুরানো গল্প। আমরা তখন একটা শহরে থাকতাম। আমি সরকারী একটা বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীতে পড়তাম। সেই সময়ে আমার দুইজন প্রিয় বন্ধু ছিল। তারা হ'লো রাজকিশোর এবং কমলেশ। তারা কাকাতো ভাই ছিল। রাজকিশোর আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল, প্রকৃতপক্ষে সত্যিই একজন অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ছিল। আমরা ক্লাশে পাশাপাশি বসতাম। আমরা যদি বাইরে যেতাম তাহলেও একসঙ্গে যেতাম। আমাদের শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্র ও একজন শিক্ষক ছিলেন। যাই হোক, একজন শিক্ষক কি করে ৪০ জন ছাত্রের দেখাশুনা করতে পারেন? তাই আমরা নিজেরাই এই দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমরা একে অন্যের দেখাশুনা করতাম।

রাজকিশোরের একটা বাইসাইকেল ছিল। সে আমাকে নিয়ে সাইকেল চালিয়ে চারিদেকে ঘুরত। হয়তো বা আমরা এই কারণেই এত প্রিয় বন্ধু হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের শিক্ষক ও বাকী ছাত্ররা তাকে ও তার ভাইকে পছন্দ করত না। (কিন্তু আমি কেন ও বিষয়ে ভাবব?)। তাদের অপচ্ছন্দের অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমি শুধু দু'টো কারণ অনেকদিন পরে কিছুদিন হ'ল জেনেছি। প্রথমতঃ তারা অন্য ছাত্রদের চেয়ে বড় ছিল- ১৪ থেকে ১৫ বছর হবে হয়তো। দ্বিতীয়তঃ তারা বাসর গোত্রের লোক ছিল এবং তাদের শূকরশালা ছিল। তারা তাদের চুল কাটত এবং বাজারে বিক্রী করত। তারা বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি বানাত ও রাস্তায় রাস্তায় তা বিক্রী করত। আমরা ছাড়া অন্যরা তাদের স্পর্শ করতে ইতঃস্তত বোধ করত।

কিছুদিন পর একদিন আমি রাজকিশোরের সঙ্গে তার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। যে রাস্তাটা আমাদের স্কুলের পিছন দিক দিয়ে গিয়েছিল এবং এলাহাবাদ ব্যাংক ও পোষ্ট অফিসের সামনে দিয়ে গিয়ে রাস্তায় ঢোকার আগে সরু হয়ে গিয়েছিল। আবার সেই সময়ে ময়লা জল দিয়ে রাস্তাটা নোংরা হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে আমরা তাদের বাড়ী পৌঁছালাম। এই বাড়ীটা ছিল খড়ের চাল এবং সেখানে দু'টা কামড়া ছিল। বাড়ীর সামনে ছোট একটা খালি জায়গা ছিল। এটাই তাদের শূকরের এবং তাদের বাচ্চা নিয়ে বসবাসের জায়গা ছিল। রাজকিশোর সেখানে গিয়ে শুকরের বাচ্চা দু'টো নিয়ে আসল, আমি তাদের নিয়ে একটু খেললাম। এগুলো লাফালাফি করতে করতে তাদের মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

রাজকিশোর বিবাহিত, প্রায় দু'বছর আগে বিয়ে হয়েছে। রাজকিশোর বেশ লজ্জা পেল, যখন আমি এই সংবাদ পেলাম। সে আমার কানে কানে বলল, আমি যেন এই ব্যাপরটা গোপন রাখি। আমিও কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম যখন আমি এটা শুনলাম যে তার ছোট বোনেরও বিয়ে হয়েছে এবং একটা বাচ্চাও আছে। এখন আমি তাদের সামাজিক পদমর্যাদার মূল্যায়ন করছি। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল। তার একটা বাইসাইকেল আছে এবং তার হাতে রোজগার করা টাকাও আছে। আমার হাতে কোন টাকা নেই। রাজকিশোর রোজ স্কুলে আসতে পারে। সে তার অনেক কাজে ব্যস্ত থাকে, যেমন শূকরের দেখাশোনা করা। তারা যদি কোথায়ও হারিয়ে তবে যায় তাদের খুঁজে আনা। বাঁশের লাঠি দিয়ে ঝুড়ি তৈরী করে রাস্তায় বিক্রী করা। এত কাজের পর সে স্কুল আসে। যখন সে স্কুলে আসত তখন তার হাতে ১০ বা ২০ টাকা থাকত। আমরা আবার বাইরে বের হতাম। আমরা সাইকেলে চড়ে রাস্তার কোনায় একটা দোকানে যেতাম সেখানে আমরা ১ টাকা দামের চাট দুবার খেয়ে শেষে গোলগাপ্পা খেতাম। কিন্তু দোকানে আমার টাকা পয়সা দিতে হত না।

যখন আমার প্রিয় বন্ধু আমাদের কলোনীতে আসত, তখন আমি তার ব্যবহারে একটি পরিবর্তন দেখতাম। সে আমার সঙ্গে স্বভাবিকভাবে কথাবার্তা বলত না, যে রকম স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম, তখন কথা বলত। আমার প্রশ্ন ছিল, কেন? আজ আমি তা বুঝতে পারি, কিন্তু তখন বুঝতে পারতাম না। রাজকিশোর যে ক্লাশে একটা বাক্যও বলতে পারত না, কারণ তার সামাজিক অসমতা, যা অস্পৃশ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে চিহ্ন ও অভিজ্ঞতা, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল না। যখন সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝুড়ি বিক্রী করত, তখন কলোনীর মহিলারা, যার মধ্যে আমার ঠাকুমাও ছিলেন, তিনিও তাদের সঙ্গে থাকতেন। তারা তাদের কাপড়চোপড় সামলে রাখতেন, যাতে রাজকিশোরের ছোঁয়া না লাগে। ঝুড়ি দেখাতে হলে রাজকিশোর একটু উঁচু জায়গায় সেগুলো ছুঁড়ে দিত। আমার

ঠাকুমা রাজকিশোর আমার বন্ধু বলে তার কাছ থেকে ঝুড়ির দামের ছাড় পাবার সুযোগ নিতেন। সময় সময় তা অর্ধেক দামেও নেমে আসত, কিন্তু এই ছাড় তিনি চাইতেন তাকে না ছুঁয়েই।

আমি তার বাড়ীতে অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু তাকে কোন দিনও সেই সরু গলি দিয়ে বার করে এনে আমার বাড়ী পর্যন্ত আনতে পারি নি।

আমাদের স্কুলের বাইরে একটা জায়গা ছিল। যেখানে আমরা দু'জনেই স্বচ্ছন্দে যেতে পারতাম, তা হল নদীর ধারে। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে একটা সরু নদী ছিল। এটাই আমাদের সাক্ষাতের জায়গা ছিল। আমাদের একই নদী থাকলেও স্নানের ঘাট ছিল আলাদা। তাদের ঘাট ছিল তাদের কলোনীর কাছে এবং আমাদের ঘাট ছিল আমাদের কলোনীর কাছে। আমি তাদের ঘাটে স্নান করতে পারতাম। কিন্তু তাকে কয়েকবার অনুরোধ করা সত্বেও সে আমাদের ঘাটে একটা ডুব দিতেও আসত না।

আজ আমি বুঝতে পারি যে নদীও আমাদের বর্ণভেদ প্রথা সম্বন্ধে-উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণ বা অপৃশ্যতা সম্বন্ধে সচেতন। সেইজন্য নদীর স্রোতও আমাদের ঘাট ছুঁয়ে তারপর আমার বন্ধুদের ঘাটে যাবে। আমরা এমন একটা গতি অনুসরণ করি না কেন, যাতে ওদের ঘাট থেকে আমাদের ঘাটে নদীর স্রোত আসবে?

আমি ৪র্থ শ্রেণীর পরীক্ষার সময়ে কিছু হয়েছিল কিনা তা মনে করতে পারছি না। আমরা আনন্দ ও স্ফুর্তিতে ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীতে পৌঁছালাম। কিন্তু একটা ভুতও সেই শ্রেণীতে এলো। এই ভুত ছিল বোর্ডের পরীক্ষা। আমরা এই বোর্ডের পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। এর মধ্যে নূতন কি ঘটবে? কিন্তু এটা অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ভুত ছিল। এটা বাড়ী থেকে স্কুল পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করত। হয় আমাদের শিক্ষক বা আমাদের পিতামাতা সর্বদাই এই ভুতের কথা আলোচনা করতেন। এই ভুতের দয়াই আমাকে বিশেষ টিউশনে নিয়ে গেল এবং জোর করে রাজকিশোরের স্কুল বন্ধ করে দিল। আমাদের শিক্ষক সাধারনত বলতেন তোমরা মুগের হালুয়ার মিষ্টি স্বাদ পেয়েছ, এখন বোর্ডের তিতা জিনিষ খাবার জন্য তৈরী হও। এটা হয়তো সম্ভব ছিল যে, অন্য কোন কারণেও রাজকিশোর ও কমলেশকে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে সে তার ভাবভঙ্গী দিয়ে যে ভয়াবহ মূর্তি তৈরী করত, সেটাকেও অবহেলা করা যায় না। এই ভুতের জন্য আমার আত্নীয় স্বজন আমাকে পড়াশুনায় ব্যস্ত রাখতেন। এই ভুতই রাজকিশোরকে স্কুলে যেতে দেয় নি। সেই থেকে আমাদের একে অন্যের সঙ্গে দেখা হয় নি। কিন্তু সে এখনও আমার স্মৃতিতে আমার প্রিয় বন্ধু হিসাবে অমলিন থেকে গেছে।

- আমব্রিশ সনি।

পাঠ্য উপকরণঃ ২

অতিথি :

খুব গরম পড়েছে। তপ্ত হাওয়া (তাপ প্রবাহ) গত তিন চারদিন ধরে অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং মানুষ বিভিন্ন জায়গায় মারাও যাচ্ছে। রাস্তাগুলোও এত তপ্ত হয়ে উঠেছে যে সেগুলো চুলার মত তাপ ছড়াচ্ছে। ধনী লোকেরা দরজায় খাস (ঠান্ডা চিক) ঝুলিয়েছে এবং তাদের চাকরেরা সেই চিক ক্রমাগত জলে ভিজাচ্ছে। দোকানের পর্দাগুলো টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে। লোকেরা যারা ফুটপাথে বসত, দোকানে বিভিন্ন জিনিষ বা যারা লটারী টিকিট বিক্রী করত তারা সকলে ব্রিজের তলায় আশ্রয় নিয়েছে এবং বিকেলের জন্যে অপেক্ষা করছে। লোকেরা রিক্সায় উঠে বসেছে যেন তাদের কোন অঙ্গ রোদের তাপে ঝলসে না যায়।

ক্রমাগত ঘাম মুছতে মুছতে তাদের রাখালগুলো কালো হয়ে গেছে। গ্রামের লোকেরা গামছা দিয়ে বা একখন্ড কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে, দেখে মনে হচ্ছে ডাকাতের মত। পথচারীরা যাদের ছাতা নেই, তারা তাদের ব্যাগ মাথায় রেখে রোদ থেকে আড়াল করছে। কোন কোন লোক আবার তাদের রুমাল মাথায় বেঁধেছে। যে জল দোকানে ৫ পয়সায় বিক্রী হচ্ছিল তার দাম দশ পয়সায় উঠে গেছে।

এইভাবে মনে হচ্ছে যে শহরের আর্থ-সামজিক অবস্থা এই তাপ প্রবাহের অধীন হয়ে পড়েছে। স্বাধীন মানুষ হওয়া সত্বেও মানুষ যেন ক্রীতদাস হয়ে উঠছে। আর এটাও মজার যে তারা তাপদাহের কোন ক্ষতি করতে পারছে না। তাই তারা তাদের পকেটে পেঁয়াজ রাখছে যাতে তারা তাপদাহ থেকে বাঁচতে পারে এবং তাদের ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে পারে।

সালমান সাহেবের পকেটেও একটা পেঁয়াজ ছিল। সেটা তার স্ত্রী চুপিসারে তার পকেটে দিয়েছিলেন। যদিও সালমান সাহেব এটা জানতেন এবং তিনি তাঁর এই বিশ্বাসে স্থির ছিলেন যে পেঁয়াজ এবং গরম বাতাসের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

সালমান সাহেব একটা সুটকেশ হাতে নিয়ে সেই উতপ্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলছেন। কিন্তু তার ইচ্ছে করছিল যে তিনি তার মাথার ওপর কিছু যদি রাখতে পারতেন বা তাঁর মুখটা গামছা বা কোন কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে পারতেন তবে ভাল হ'তো। কিন্তু অসুবিধার জন্য তিনি কিছুই করতে পারলেন না। এছাড়া তিনি খুব শ্রীঘ্রই মিশ্রীলাল গুপ্তর বাড়ীতে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। তিনি একটা রিক্সাও পাচ্ছিলেন না। তিনি তার মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন এই চিন্তা করে যে তার বাসা ষ্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়। এটা তাকে মিশ্রীলালই বলেছিলেন। সালমান সাহেব মিশ্রীলালের সঙ্গে এই প্রথমবারের মত এই শহরে দেখা করতে এসেছেন। তিনি তাঁর গৃহের নম্বর জানতেন কিন্তু তার অবস্থান সম্বন্ধে জানতেন না। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মিশ্রীলাল গুপ্তকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করতে পারবেন।

একসময় মিশ্রীলাল তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। সে এমন একজন লোক ছিলেন যে, তিনি খুব শ্রীঘ্রই তার শহরে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই গুপ্ত পরিবারের যুবকদের মধ্যে প্রথম ছিলেন, যিনি মাংস খেতে এবং মুসলিমদের হোটেলে চা খেতে শুরু করেছিলেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুদের জন্য এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিমদের জন্য তাই শহরের হোটেলগুলো ছিল হিন্দুদের ও মুসলিমদের । এটা একটা ভিন্ন ব্যাপার যে মুসলিমরা হিন্দু হোটেলে যাবার জন্য বা হিন্দুরা মুসলমানদের হোটেলে যাবার জন্য কোন বাধ্যবাধ্যকতা ছিল না। কিন্তু ধার্মিক লোকেরা এই প্রথা পছন্দ করত না। জ্যাকি নামে একজন ছেলে সে সালমান সাহেবের প্রতিবেশী ছিল। সে সবসময় মুসলমান মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনত, কারণ শিবচরণ তার খাবার মানসম্মত রাখতে পারত না। শহরে তখন সেইসময় প্রত্যেক ছাত্রের সংস্কৃত অবশ্য পাঠনীয় ছিল। তাই সালমান সাহেবকে 'রামা, রামাও, রামাহু' শিখতে হয়েছিল, ফলস্বরূপ তিনি উর্দূ শিখতে পারেন নি। ঠিক একইভাবে গিরিধারীলাল গুপ্ত, মিশ্রীলালের পিতামহ তাঁর সময়ে শুধু উর্দূই শিখতে পেরেছিলেন। তিনি সংস্কৃত শেখার সুযোগ পান নি। তিনি বৈশ্য (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়ের ছিলেন।

আবার তখন মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ ছিল না। তাই সালমান সাহেবকে সংস্কৃত পড়তে হয়েছিল এবং তিনি যখন উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে যান তখন তাকে সংস্কৃতই পড়তে হল। তার আত্মবিশ্বাস ছিল যে তিনি কোন স্কুলে সংস্কৃতের প্রভাষক হতে পারবেন। কিন্তু এটাও সম্ভব হল না। এখন তিনি শহরে মাত্র কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া মডেল স্কুলে শিক্ষকতা করছেন।

মিশ্রীলাল যখন উচ্চ মাধ্যমিক পড়তেন, তখন সালমান সাহেব তাকে সংস্কৃত শেখাতেন। তাই মিশ্রীলাল তাকে শিক্ষক হিসাবে ভক্তি করতেন ও তাঁর পা ছুঁয়ে প্রনাম করতেন। তারপর তিনি তাঁর ডিগ্রী পড়া শেষ করলেন এবং চাকুরী প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। এটা তারই ইচ্ছা ছিল যে সালমান সাহেব যখনই শহরে আসবার সুযোগ পাবেন তখন তিনি তার বাড়ীতে আসবেন। মিশ্রীলালের এই আকাঙ্খা পূরণের জন্য তিনি মিশ্রীলালকে পূর্বে না জানিয়েই তার বাড়ীতে যাচ্ছেন। তিনি মিশ্রীলালকে হঠাৎ তার বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাকে অবাক করে দিতে চেয়েছিলেন।

সালমান সাহেব তাঁর এলাকার নামটা মনে রেখেছিলেন গোপালগঞ্জ, হ্যাঁ এটাই ঠিক নাম। বাড়ীর নম্বর ৫৬২, রাধারমন মিশ্রের বাড়ী। এটা ষ্টেশন থেকে আধা মাইল দূরে অবস্থিত। 'গোপালগঞ্জ কোথায় অবস্থিত?' তিনি একজন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, দোকানদার তার মুখে একটা পান রেখে তার রসে তার গলা ভেজা অবস্থায় জানালেন, যে তিনি কিছু আগে জায়গাটা ছেড়ে এসেছেন। তিনি আর একটু পেছনে গিয়ে ইলেকট্রিক পোষ্টের সঙ্গে লাগা রাস্তায় ঢুকলেই বাড়ীটা পাবেন।

সালমান সাহেব দোকানের মধ্যে থেকে বের হয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়ানো মাত্র তার গালদুটো তাপদাহে পুড়বার মত হল। তিনি সাথে সাথেই হাতের পাতা দুটো দিয়ে মুখটা ডেকে ফেললেন। ঠিক সেই সময় তার মনে পড়ল যে, তার পকেটে একটা পেঁয়াজ আছে তিনি একটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। হ্যাঁ, এইটাই সেই রাস্তা তিনি সেই ইলেকট্রিক পোষ্টের দিকে তাকালেন এবং তার সাথে লাগা রাস্তায় ঢুকলেন। তার দক্ষিণ দিকে ব্লক এ ছিল। সালমান সাহেব মনে করলেন, তাহলে ব্লক-বি নিশ্চয়ই বামদিকে হবে। কিন্তু সেই পাশে ব্লক-এইচ আছে। তিনি আর একটু এগিয়ে গেলেন, চিন্তা করলেন ব্লক-বি হয়তো আরও একটু দূরে হবে। কিন্তু এটাও ঠিক হল না। এ ব্লকের শেষে আসল ব্লক-এম। তার বাঁয়ে ব্লক-সি। তিনি একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন।

'আপনি কোথায় যেতে চান? একজন জিজ্ঞেস করল।

তিনি একটা খাটে ধাক্কা খেলেন যেটা ছারপোকা মারার জন্য বাইরে ছিল। হয়তো বা তিনি তার উদ্বেগ বুঝতে পারলেন। সালমান সাহেব তার জুতা দিয়ে একটা ছারপোকা মারলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন 'ব্লক-বি এর ৫৬২ নম্বর বাড়ীটা কোথায়?'

'ওহো মিশ্রজীর বাড়ী'? সেটা তো গোপালগঞ্জে। আপনি সোজা এগিয়ে যান, সামনের মন্দির থেকে দক্ষিণে যাবেন। আপনি যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই তারা বলে দেবে। সালমান সাহেব তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চললেন। যখন তিনি মন্দির পর্যন্ত এলেন এবং দক্ষিণ দিকে ফিরলেন। তিনি দেখলেন সেখানে ৪টা বা ৫টা মহিষ দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে এবং একটা মেয়ে একজন রুটিওয়ালাকে ডাকছে।

'এটা কি পুরনো গোপালগঞ্জ?'

কিন্তু মেয়েটি ভ্রুক্ষেপও করল না। সে রুটি বিক্রেতার রুটির দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছিল।

সালমান সাহেব সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি পুরনো ধরণের উঁচু বাড়ীগুলো খুঁজে পেলেন। বাড়ীগুলোর ছায়া রাস্তার ওপর পড়েছিল বলে রাস্তাগুলো অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা ছিল এবং উলঙ্গ ছেলেরা সেখানে লাফালাফি করছিল। সালমান সাহেব প্রথমে ভাবলেন সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। কিন্তু তিনি তার মন পরিবর্তন করলেন এবং দেরী না করে হেঁটেই চললেন।

একটা ছেলে তার সামনে সামনে দৌড়াতে লাগল এবং একটা মোটাসোটা ইঁদুর তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছিল। ছেলেটি একটা দড়ি দিয়ে ইদুরটির লেজ বেঁধেছিল এবং সে দড়ির অন্যপ্রান্ত ধরেছিল। সালমান সাহেব যেমন আশঙ্কা করেছিলেন ছেলেটি তার সঙ্গে ধাক্কা যেন না লাগে। এমনভাবেই এঁকে বেঁকে দৌড়ালেও তার সঙ্গে ধাক্কা লাগলোই।

'বি-৫৬২ নম্বরের বাড়ীটা কোথায়? তুমি কি মিশ্রজীর বাসা চেন?

ছেলেটি তার দিকে ফিরে তাকাল, একটা বাড়ীর দিকে আঙ্গুল তুলে নির্দেশ করেই ছেলেটি দৌড়ে পালিয়ে গেল। ইদুর তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছিল।

সালমান সাহেব স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং সেই বড় বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। দু'জন মহিলা একটা খাটিয়ায় বসে বসে তাদের নিজেদের উপায়ে পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছিল।

ও, বিত্তানের মা আমাদের ঠাকুরকে অনেক ধন্যবাদ দিই, যে আমরা ভারতে আছি। আমরা পাঞ্জাবে থাকলে আমাদের অনেক কষ্ট হতোড়

'এটা কি রাধাচরণ মিশ্রজীর বাড়ী?'

সালমান সাহেব আশা করেছিলেন যে, মহিলারা তাদের খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়াবে, যা শহরাঞ্চলে প্রচলিত আছে। কিন্তু তারা বসেই থাকল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটা সেইরকম শহর---।

'মিশ্রজী এখানে থাকেন না, তিনি জওহর নগরে থাকেন। শুধু তার ভাড়াটেরা এখানে থাকে'-এই খবর একজন মহিলা দিল এবং তারপরই তারা চুপ করে থাকল।

'আপনি তাকে খুঁজছেন কেন? আর একজন মহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করল এবং তার মাথা চুলকাতে শুরু করল।

'মিশ্রলাল গুপ্ত নামে একজন ছেলে এখানে থাকে। আমি তাকেই খুঁজছি।' 'আপনি ওপরে যান, সে সেখানে দ্বিতীয় ঘরটাতে থাকে।' যে মহিলাটি মাথা চুলকাচ্ছিল সে বলল এবং দাঁড়িয়ে উঠল।

সালমান সাহেব ঘরে ঢুকলেন। এখানে অন্ধকার এবং ওপরে সিঁড়িটা প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ঘরের কোনায় একটা ট্যাপ দেখলেন, তিনি সিঁড়িটাও দেখতে পেলেন। তিনি অতি সাবধানে ওপরে উঠতে থাকলেন। এই সময় তিনি কল্পনা করতে লাগলেন যে মিশ্রীলাল হয়তো ঘুমাচ্ছে এবং দরজায় টোকা দিয়ে আমাকে তাকে জাগাতে হবে। সে হয়তো তক্ষুণি উঠবে এবং দরজা খুলে চোখ কুঁচকে বাইরে তাকাবে। আমাকে তার সামনে দেখে আমার পা ছুঁয়ে প্রনাম করবে।

'আপনি কে?'

তিনি একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শুনলেন, যখন ওপরে উঠলেন এবং স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

'মিশ্রীলালজী আছেন?'

'দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।'

মহিলা কঠোর স্বরে বলল এবং সালমান সাহেব অনুভব করলেন যে মহিলা বোধ হয় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছে। তিনি দরজা ছাড়া ঘরটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং অন্য কিছু চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে একজন মধ্যবয়সী মহিলা একটা পেটিকোট ও অন্তর্বাস পরে আর একটা ঘরে দৌড়ে গেল এবং ব্লাউজ ও শাড়ী পরে বের হয়ে আসল।

'দয়া করে আসুন।'

মহিলার ডাক অনুসারে সালমান সাহেব ঘরে ঢুকলেন, যেন মনে হল তিনি কিছুই দেখেন নি। মহিলাও ঠিক সেইরকমই মনে করল এবং দাঁড়িয়েই থাকলো। সালমান সাহেব দেখলেন যে, একটা ভেজা শাড়ী বারান্দায় নালার পাইপের কাছে পড়ে আছে এবং সমগ্র বাতাস জয় সাবানের সুগন্ধে ভরে রয়েছে।

'মিশ্রীলালজী পাশের ঘরে থাকেন, কিন্তু এখন তিনি ঘরে নেই, আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন? দয়া করে বসুন? মহিলা অত্যন্ত কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করল এবং ঘরে গিয়ে আস্তে করে একটা খাটিয়া পেতে দিল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার প্লেট এ করে এক টুকরা গুড় ও একগ্লাস জল নিয়ে আসল এবং গ্লাসটা খাটিয়ার ওপর রেখে গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

'একগ্লাস জল খান। আজকে খুবই গরম।'

আমার দিকে তাকিয়ে কিছু চিন্তা করে সে আবার ঘরে ফিরে গেল। সে তারপর একটা হাতপাখা নিয়ে ফিরে এল এবং সেটা খাটের ওপর রাখল। সালমান সাহেব গুড়টা খেলেন, তারপর জল খেলেন এবং পাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করতে লাগলেন।

'মিশ্রী কি কোথাও গিয়েছে?'

'উনি হয়তো শহরের মধ্যে কোথাও গিয়েছেন। হয়তো সিনেমা দেখতে গিয়েছেন বা কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। প্রত্যেকদিন তিনি সাধারণত ঘরেই থাকেন, কিন্তু এখনি তিনি বাইরে গেলেন।

সালমান সাহেব তার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, তখন ৩টা বাজে। তিনি ক্লান্ত ছিলেন এবং খাটিয়ায় শুয়ে পড়লেন। মহিলা একটা বালিশ নিয়ে এল।

'দয়া করে একটু বিশ্রাম নিন, গুপ্তাজী সন্ধ্যার দিকেই ফিরে আসবেন'।

মহিলা সালমান সাহেবের মাথার পাশে বালিশটা রাখল এবং ভিজা শাড়ীটা একটা বালতিতে রেখে নীচে চলে গেল।

যখন সালমান সাহেব শুয়ে পড়লেন তিনি অনুভব করলেন যে পেঁয়াজটা তার পকেটে আছে। তিনি সেটা খাটিয়ার নীচে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন যে শিক্ষকদের মধ্যে খুব বিবাদ হয়েছে এবং হেডমাষ্টার সত্যনারায়ন যাদবকে খুব বকছেন। তার পক্ষ হয়ে যখন সব শিক্ষকরা তাকে আক্রমণ করল তখন সালমান সাহেব সকলের আগে সরে গেলেন।

তিনি জেগে উঠলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মনে হচ্ছিল যে রাত হয়েছে। ঘরের মধ্যে একটা বাল্ব ছিল এবং তার আলো বারান্দা পর্যন্ত আসছিল। বারান্দায় কোন আলো ছিল না। একজন মহিলা ষ্টোভে সবজী ভাজছিলেন। যে জায়গা থেকে এর আগে সাবানের সুবাস আসছিল সেখান থেকে এখন জিরার গন্ধ আসছে।

'মিশ্রীলাল এখনও আসেনি?'

'আমি কি করে বলব, যে তিনি আজ কোথায় গেছেন? তিনি সাধারনতঃ রোজই এই সময় বাড়ীতে থাকেন। মহিলা একটু চিন্তিত হয়ে একটা স্টীলের গ্লাস ভর্তি চা নিয়ে এল। 'আপনি এত ঝামেলা নিলেন কেন?'

'এটা কোন ঝামেলা নয়। আমরা এমনিতেই সন্ধ্যাবেলায় চা করে থাকি।' সালমান সাহেব গ্লাসটা হাতে নিলেন। মহিলা স্টোভের কাছে ফিরে গেল।'

একজন যুবক, তার শরীর একটা পাতলা চাদরে ঢেকে তার হাতে পৈতা জড়াতে জড়াতে ওপর তলায় এল এবং ঘরে ঢুকেই হনুমান চল্লিশ ভজন গাইতে লাগল। এখন সম্পূর্ণ আবহাওয়াটা জিরা ও আগরবাতির মিশ্রিত সুবাসে ভরে গেল।

সালমান সাহেব ঘরটির মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন যে, সাংসারিক নানারকম জিনিষ সাজানো রয়েছে এবং রাম, কৃষ্ণ, হনুমান, শংকর পার্বতী, লক্ষী, গনেশ ইত্যাদি দেবদেবীর ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো আছে। সেখানে একটা কাঠের ফলক দেয়ালের অপরদিকে টাঙ্গানো আছে। এটা একটা ফলক, যার ওপরে রাম মনোহর পান্ডে নামটা খোদিত আছে। লোকটা তার ডান হাতে আগরবাতি ধরে বাম হাতটা ডান হাতের কুনুই ধরে প্রত্যেক ছবির কাছে ঘুরাচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে সুবাস বিলাচ্ছে এবং গীতার শ্লোক সঠিক এবং ভুল উচ্চারণে গাইছে। একটা ছোট কিন্তু ময়লা পাখা সেই ঘরে ঘুরছে।

মহিলার সব্জী রান্না হয়ে গেছে এবং সে এখন চাপাতি (হাত রুটি) তৈরী করছে। সালমান সাহেব চিন্তা করলেন যে সেখান থেকে চলে গিয়ে যে কোনও হোটেলে উঠবেন এবং পরদিন সকালে মিশ্রীলালের সঙ্গে দেখা করবেন, কারণ এখন অনেক রাত হয়েছে এবং তার ফিরে আসার কোন নিশ্চয়তা নেই।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'আমি এখন যাব এবং ভোর বেলায় তার সঙ্গে দেখা করব।' তিনি তার ব্যাগটা তুলে নিলেন।

'আপনি কোথায় যাবেন?'

মহিলা সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'আমি যে কোন হোটেলে থাকব।'

'কেন ভাই সাহেব, আপনি হোটেলে থাকতে যাবেন? এখানে কি আপনার থাকার কোনও জায়গা নেই? খাবার প্রস্তুত, দয়া কের খান। তারাপর ওপরে যান এবং এখন ওপরেই ঘুমান। গুপ্তজী রাত্রে যখন আসবেন এবং যদি তিনি রাত্রে না আসতে পারেন, তবে আপনি সকালে চলে যাবেন। আমি আপনাকে এখন যেতে দেব না। আপনি আপনার জুতা খুলুন, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খান।

‘না ভাবীজী, আপনি ঝামেলা নিচ্ছেন কেন?’

সালামান সাহেব তাকে ভাবীজী বলে ডাকতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না।

‘কোনও অসুবিধা নেই। আপনি আসুন এবং খাবার খান।’

সালমান সাহেবের আর কোন উপায় ছিল না এবং তিনি তার জুতা খুলে ফেললেন। তারপর তিনি হাত মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ইতিমধ্যে পান্ডে তার স্তব আরাধনা করার পর কাঠের খাটিয়ায় বসলেন, এবং তার কাগজপত্র ওলটাতে লাগলেন। তিনি সালমান সাহেবকে কোন সম্ভাষণও করলেন না। তিনি অবশ্য একটু খারাপ বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু এত সময় কোন কথা না বলে এতক্ষণ পরে কোন সম্ভাষণ করার অর্থই ছিল না। তাই তিনি সরাসরিভাবে কথা বলা শুরু করলেন।

‘সাহেব আপনিও উঠে পড়েছেন?’

‘না, আপনি খান, আমি কিছুক্ষণ পরে খাব।’

তিনি সালমান সাহেবকে আন্তরিকভাবে কিছু বললেন না এবং তার দিকে না তাকিয়েই তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

‘আপনি বসুন, আপনি নিশ্চয় সারাদিন পরে খুব ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছেন। উনি পরে খাবেন। তিনি অফিস থেকে এসে জলখাবার খেয়েছেন। তখন আপনি ঘুমাচ্ছিলেন।’

মহিলা তাকে অনুরোধ করলেন একটা ছোট টুল এনে তার ওপর তার খাবারের প্লেট রাখলেন এবং একটা বড় গ্লাসে জল দিলেন।

সালমান সাহেব সেখানে বসলেন।

তিনি মনে মনে খুব খুশী হলেন। কারণ একজন ব্রাহ্মণ তার গোত্রের কথা না জেনেই তাকে খেতে দেয়। তার শহরে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখানে এটা সম্ভব হয়েছে কারণ এটা খুব বড় শহর নয়। তারা গ্রাম্য পরিবেশ থেকে এসেছে তবে এখন শহরবাসী হয়েছেন। এই অঞ্চলের লোকেরা ক্রমশ বর্ধিষ্ণু হচ্ছে। তাদের ছোট মন নয়। যদিও তারা ধর্মপরায়ন কিন্তু তারা ধর্মের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত।

সালমান সাহেব বেগুনের তরকারী খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছিলেন। টাটকা আমের চাটনী যদিও ঝাল ছিল কিন্তু খুব সুসাদু । চাপাতিগুলো (হাত রুটি) ঘি দিয়ে ভাজা হয়েছিল। এই ধরণের চাপাতি (হাত রুটি) সাধারণত এইভাবে তৈরী হয় না। যে রকম চাপাতি (হাত রুটি) তার বাড়ীতে তৈরী হয়, তা রুটি সেঁকবার পাত্র বড় করে তৈরী হয় এবং আধসেদ্ধ চাপাতিগুলো কাপড়ে জড়িয়ে তৈরী করা হয়।

মহিলা আর একটা চাপতি(হাত রুটি) যা একটু মোটা ছিল এবং গরম ছিল তা তার পাতে দিল। ‘আপনি কি গুপ্তজীর গ্রাম থেকে এসেছেন?

সালমান সাহেব তার মাথা উঁচু করলেন। পাণ্ডেজী তার কাজ ছেড়ে এখন আম কাটছিলেন। তার গলার স্বরে একটু কঠোরতা ছিল।

হ্যাঁ, প্লেট থেকে আচার নিয়ে চাটতে চাটতে বললেন।

পাণ্ডেজী ঈশারায় তার স্ত্রীকে ডেকে কাটা আমগুলো দিলেন।

মহিলা ঐ আমগুলো সালমান সাহেবের পাতে দিল।

সেই একই কঠোর স্বরে ‘তিনি আপনার ভাই, কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন।

সালমান সাহেব রেগে গেলেন।

‘না সে আমার ছাত্র’।

‘আপনি কি একজন শিক্ষক?’

‘হ্যাঁ’

‘আপনি কোথায় শিক্ষকতা করেন?’

‘আপনিও কি একজন গুপ্ত?’ ‘না’ ‘ব্রাহ্মণ?’

‘না, আমি একজন মুসলমান, আমার নাম মোহাম্মদ ‘সালমান’।

তিনি তার পূর্ণ পরিচয় দিলেন এবং তার চাপাতির শেষ টুকরোটা সব্জী দিয়ে মুড়াতে শুরু করলেন। পাণ্ডেজী তার চোখ তুলে তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, দেখলেন মহিলাও তার দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখে মনে হ’লো তারা উভয়েই কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু ভালভাবে ব্যাখ্যা করলেন না।

সালমান সাহেব আর এটা চাপাতি চাইলেন কিন্তু মহিলা চুলা ছেড়ে ভিতরে গেলেন। তিনি কিছু একটা খুঁজছিলেন।

সালমান সাহেব আম খেতে শুরু করলেন।

মহিলা যখন বাহিরে এলো তার হাতে সিরামিকের জলের পাত্র ছিল এবং তার চোখে ভয় ছিল।

সে ষ্টীলের জলের পাত্র তুলে নিল ও সিরামিকের গ্লাসটা রাখল।

সালমান সাহেব মনে করে দেখলেন, যে গ্লাসে তিনি জল খেয়েছেন এবং যে পাত্রে তিনি খাবার খেয়েছেন তা ষ্টীলের তৈরী। তিনি সেগুলো তুলে নিয়ে নিজে সেগুলো ধুতে লাগলেন।

মহিলা পিছন ফিরে তার দিকে দেখল এবং পরক্ষণেই তার কাজে ব্যাস্ত হল।

মিশ্রীলাল তখনও ফিরে আসেন নি।

-আব্দুল বিসমিল্লাহ

পাঠ্য উপকরণঃ ৩

ঠাকুরের কূপ :

জলের পাত্রটা মুখের কাছে আনা মাত্র জখু জলে একটা দুর্গন্ধ পেল। সে গাঙীকে বলল, 'এটা কেমন জল। এই দুর্গন্ধের জন্য কেউ এই জল খেতে পারে না। আমার গলা শুকিয়ে গেছে আর তুমি আমাকে এইরকম দুর্গন্ধযুক্ত জল দিয়েছ?

গাঙী প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় জল ভরত। কূপটি অনেক দূরে ছিল। সেখানে বার বার যাওয়া সম্ভব নয়। সে গতকাল জল এনেছে, তখন কোন দুর্গন্ধ ছিল না। আর আজ সেখানে দুর্গন্ধ থাকে কি করে! সে পাত্রে নাক ঠেকিয়ে শুকল, সেখানে সত্যিই দুর্গন্ধ আছে। নিশ্চয়ই কোন প্রাণী কূপে পড়েছে এবং মারা গেছে। কিন্তু এখন আমি টাটকা জল কোথা থেকে পাই? আমাকে কে ঠাকুরের কূপ থেকে জল আনবার অনুমতি দেবে? লোকেরা আমাকে দূর থেকেই গালাগালি দেবে। সাহুর কূপ হচ্ছে গ্রামের আর এক কোনায়। কিন্তু সেখান থেকে জল আনতেই বা আমাকে কে অনুমতি দেবে? গ্রামে আর তৃতীয় কোন কূপ নেই।

জখু অনেকদিন ধরে ভাল নেই। সে তার তেষ্টা দমন করে চুপ করে থাকল এবং তারপর বলল, এখন আমি আর তেষ্টা দমন করতে পারছি না। আমার জন্য শুধু কয়েক ফোঁটা টাট্‌কা জল ভাল কূপ থেকে নিয়ে আস। গাঙী অবাক হয়ে জখুর দিকে তাকিয়ে থাকল। জখু বলল-'তুমি এখন কোথা থেকে জল আনবে?

এখানে ঠাকুরের এবং সাহুর এই দু'টি কূপ আছে। তারা কি এক পাত্র জল আনতে অনুমতি দেবে? তারা তোমায় মারবে। এখানে শান্ত হয়ে বস। ব্রহ্মা তোমাকে বকবেন, ঠাকুর তোমায় লাঠি দিয়ে মারবে। সাহুজী কূপ থেকে আমাদের কখনও জল নিতে দেবে?

এই জলের মধ্যে সত্যই তিক্ততা আছে। গাঙী কোনও জবাব দিল না। কিন্তু সে সেই জল জখুকে খেতেও দিল না।

তখন রাত ৯ টা বাজে। ক্লান্ত মজুররা ঘুমিয়ে পড়েছে। যারা কাজ করছে না তারা ঠাকুরের দরজায় বসে আছে। এটা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস দেখাবার সময় নয়, সেরকম কোন সুযোগও নেই। তারা আইন সম্মত সাহস দেখাবার গল্প করছিল। ঠাকুর কিভাবে পুলিশ অফিসারের কোন একটা কেস এর ব্যাপারে ঘুষ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছিল। কেমন বুদ্ধি সহকারে কেস এ সিদ্ধান্তের একটা কপি যোগাড় করেছিল। সবাই বলত কেউ কেস এর সিদ্ধান্তের কপি পেতে পারে না। তারা টাকা পয়সা চাইবে, ঠাকুর কোন টাকা পয়সা না দিয়েই সেই কপি পেয়েছিল। মানুষের বুকের পাটা থাকা লাগে।

সেই সময় গাঙী সেখানে কূপ থেকে জল আনতে গেল।

মাটির প্রদীপের আলো কূপে পড়ছিল। গাঙী কূপের চারিপাশের দেয়ালের পিছনে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করছিল। গ্রামের সব লোকেরা এই কূপের জল খায়। শুধুমাত্র এই কয়েকজন হতভাগ্য মানুষ ছাড়া অন্য কারও এই জল নেয়ায় নিষেধ নেই।

গাঙীর বিদ্রোহী মন এইসব ঐতিহ্যকে আঘাত করতে শুরু করল। আমাদের কেন মানুষ নীচু চোখে দেখে এবং তারাই বা কেন উচ্চ বর্ণের বলে পরিগনিত হয়? এর কারণ কি তারা গলার চারিদিকে পৈতে ধারণ করে বলে? যে সব লোকেরা সেখানে উপস্থিত, তারা সাংঘাতিক লোক। তারা চুরি, প্রতারণা, মিথ্যা মামলায় জড়িত থাকে। কয়েক দিন আগে ঠাকুর গরীব রাখালদের মেষগুলি চুরি করেছিল এবং সেগুলি সব মেরে সে সব মাংস খেয়ে ফেলেছে। তাদের সারাবছর ধরে ব্রাহ্মণদের দর্শন দিতে হত। সাহুজী তেল মিশিয়ে ঘি বিক্রী করে। তারা আমাদের মজুর হিসাবে খাটায়। কিন্তু ন্যায্য মজুরী দেয় না। তাহলে কোন হিসাবে তারা আমাদের চেয়ে উপরে আছে। আমরা আমাদের উচ্চ পদমর্যাদায় থাকার জন্য রাস্তায় চিৎকার করে বেড়াই না। আমরা যদি গ্রামে বেড়াতে যাই তারা আমাদের দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকায়। যেন আমরা হিংসার পাত্র, যদিও তাদের উচ্চবংশীয় মনোভাব আছে।

সে একটা শব্দ শুনল, যেন মনে হল কেউ কূপের দিকে আছে। গাঙীর হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। সে চিন্তা করল যদি কেউ আমাকে দেখে ফেলে, তবে তারা একটা বিবাদের সৃষ্টি করবে। সে যেন কারও চোখেই না পড়ে। সে তার কলসী ও দড়ি হাতে তুলে নিল এবং নীচু হয়ে হাঁটতে শুরু করল। সে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। কখন তারা কারও জন্য দয়া অনুভব করবে। তারা মাহাতোকে এমনভাবে মেরেছে যে কতদিন ধরে তার মুখ থেকে থুথুর সঙ্গে রক্ত পড়েছে। কারণ সে বেতন ছাড়া কাজ করতে চায় নি। এ সত্বেও তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে।

কিছু মহিলা সেখানে জল নিতে এল। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল- 'যে মূহূর্তে আমরা খাবার খেতে যাব, তখন আমাদের টাটকা জল নিয়ে আসবার হুকুম হয়। তাদের কলসী কেনার পয়সা নেই।" 'পুরুষ মানুষেরা আমাদের বিশ্রাম নিতে দেখলে হিংসা করে। তারা কূপ থেকে জল ভরা কলসী আনতে কষ্ট পায়। তারা শুধুমাত্র হুকুম দেয়, জল নিয়ে যেতে, যেন আমরা তাদের চাকর।'

'তোমরা চাকর ছাড়া আর কি? তোমরা কি খাদ্য ও বস্ত্র পাও না? তোমরা যদি সুযোগ পাও, তোমরা ৫/১০ টাকা কেড়ে নাও না? তাহলে তোমাদের সাথে চাকরদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কি আছে? 'দিদি, তুমি লজ্জা পেয়ো না। আমরা বিশ্রাম নিতে চাই না। আমরা যদি অন্য কোথায়ও এই কাজ করতাম তবে আমরা খুব আরামে থাকতে পারতাম। আমরা যদি এই কাজ করতে করতে মরেও যাই, কেউ গ্রাহ্যই করবে না।

তারা জল ভরে চলে গেল। গাঙী গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে কূপের পাশে আসল। নির্লিপ্ত মানুষগুলোও সেখান থেকে চলে গেল। ঠাকুর দরজা বন্ধ করে বারান্দায় ঘুমাতে গেল। গাঙী কিছুক্ষণের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাই হোক সেখানে আর কোন বাধা রইল না। রাজপুত্র যখন এ্যালেক্সির চুরি করতে গিয়েছিল, তখনও সে এত যত্ন করে যায় নি। গাঙী আস্তে আস্তে কূপের ধারের দেয়ালের কাছে গেল। গাঙী এর আগে এরকম জয়ের আনন্দ অনুভব করে নি।

সে তার কলসীর উপরের দিকে দড়ি বাঁধল। সে আশেপাশে সাবধানে দেখল, ঠিক যেন মনে হ'ল একজন যোদ্ধা তার শত্রুর দূর্গে ঢুকতে যাচ্ছে। সে যদি এই সময় ধরা পড়ে যেত, তখন তার আর কোন সাহায্য পাবার আশা ছিল না। দেবদেবীদের স্মরণ করে যে কলসীটা সাহসভরে জলে ডুবালো।

যখন কলসীটা জলে ভরছিল তখন কোন শব্দও হল না। গাঙী দড়িতে কয়েকটা টান মারল আর কলসীটা কূপের ওপরে উঠে এল। এমন কি একজন অভিজ্ঞ মানুষও এত দ্রুত কলসীটা তুলতে পারত না।

গাঙী নীচু হয়ে কলসীটা ধরে কূপের প্রাচীরের ওপরে তুলে রাখল। ঠিক সেই সময় ঠাকুর সাহেবের ঘরের দরজা খুলে গেল। সিংহের মুখও বোধ হয় এর চেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর হয় না।

গাঙী দড়িটা ধরে রাখতে পারল না। কলসী সেই দড়িশুদ্ধ খুব জোরে শব্দ করে কূপের মধ্যে পড়ে গেল এবং সমগ্র পরিবেশ জলের ডেউ এর শব্দে পূর্ণ হল।

'ওখানে কে? ঠাকুর দৌড়ে কূপের কাছে আসতে আসতে প্রচন্ড চিৎকার করল। গাঙী লাফ দিয়ে কূপের দেয়াল থেকে নেমে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

বাড়ীতে পৌঁছে সে দেখল, জখু সেই গন্ধযুক্ত জলের পাত্র থেকেই নোংরা জল খাচ্ছে।

- মুনসী প্রেমচাঁদ

পাঠ্য উপকরণ: ৪

সদগতি:

দুখী চামার (চামড়া দিয়ে কাজ করে) তার ঘর-দোর ঝাড়ু দিচ্ছে। তার স্ত্রী ঝুরিয়া উঠানে গোবর দিচ্ছে। উভয়ে তাদের কাজ শেষ করার পর তার স্ত্রী ঝুরিয়া বললো- যাও, পাণ্ডে বাবা অন্য কাজে বের হয়ে যাবার আগেই আমাদের মেয়ের আশীর্বাদের জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে এসো।

দুখী- হ্যাঁ আমি এখুনি যাব। কিন্তু তুমি শুধু চিন্তা কর যে, তাকে বসতে দেবার জন্য আমরা কি দেব?

ঝুরিয়া- 'আমরা কি কোথাও থেকে একটা খাটিয়া আনতে পারি না, হয়তো বা ঠাকুরানীর কাছ থেকে'।

দুখী- মাঝে মাঝে তুমি এমন কথা বল, যা আমাকে অসুবিধায় ফেলে। ঠাকুরানীর পরিবার কি আমাদের খাটিয়া দেবে? সে কখনই তার বাড়ী থেকে বের হয় না। আর তারা কি করে আমাকে খাটিয়া দেবে! কেউই আমাদের এক পাত্র জলও দেবে না আমি যদি চাই। কে আমাদের খাটিয়া দেবে? কিন্তু যদিও আমাদের ঘুঁটে, খড়ি বা পশুর খাদ্য যথেষ্ট নাই, তবুও তা তারা এখান থেকে নিয়ে যাবে। এই ছোট খাটিয়াটা ধুয়ে ফেল, তার আসার আগেই সেটা শুকিয়ে যাবে।

ঝুরিয়া-'উনি আমাদের এই ছোট খাটিয়ায় বসবেন না। তুমি কি দেখনি তারা তাদের ধর্মের নিয়মকানুন কেমন কঠোরভাবে পালন করে?

বেশ চিন্তিত হয়ে দুখী বলল, 'হ্যাঁ সেটা অবশ্য ঠিক। আমি তাহলে মহুয়া গাছের পাতা দিয়ে একটা বড় থালা তৈরী করি। অনেক ধনী লোকও গাছের পাতার তৈরী থালায় খেতে পারে। সেটা পবিত্র। আমার লাঠিটা দাও, আমি গাছ থেকে কিছু পাতা পেড়ে আনি।

ঝুরিয়া-তুমি যাও, আমি সেটা তৈরী করে নেব। কিন্তু আমাদের তাকে কিছু রান্না করা খাবারও দিতে হবে। সেগুলো আমি আমার থালায় রাখতে পারি।

দুখী-ওটা করো না, তাহলে তোমার খাবারও ফেলে দিতে হবে। এমন কি তোমার থালটাও ভেঙে যাবে। বাবা তোমার থালা ভেঙে ফেলবেন। উনি খুব তাড়াতাড়ি রেগে যান। এমন কি তিনি তার স্ত্রীকেও বকাঝকা করেন, যখন তিনি রেগে যান। তিনি একবার তার ছেলেকে এত নিষ্ঠুরভাবে মেরেছিলেন, যে ছেলেটির হাত ভেঙে গিয়েছিল। আরও বেশী খাবার পাতার তৈরী থালায় দিও। হ্যাঁ, আর ওগুলো তুমি ছুঁয়ো না।'

ঝুরিয়া-'গন্দের মেয়েটাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। আর সব কিছু জিনিষ সাহুজীর দোকান থেকে কিনো। সেখানে অনেক শুক্‌নো খাবার পাওয়া যায়। তুমি এক কিলো ময়দা, আধা কিলো চাল, ২৫০ গ্রাম ডাল, ১২৫ গ্রাম ঘি, কিছু লবন এবং মশলা আনবে। থালার একপাশে চার আনা পয়সা রেখো। যদি তুমি গন্দের মেয়েটাকে না পাও তাহলে বুর্জিনকে তোমার সঙ্গে যেতে বলো। কিছু ছুঁয়ো না, নতুবা উনি রাগ করতে পারেন।'

সবরকম প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে দুখী এক টুকরো কাঠ হাতে নিয়ে এবং এক বোঝা ঘাস নিয়ে পন্ডিতজীকে অনুরোধ করতে গেল। সে কিভাবে খালি হাতে পন্ডিতজীর কাছে যেতে পারে? সে এক বোঝা ঘাস ছাড়া আর কি নিয়ে যেতে পারে? তার আর কিছু তো তাকে দেবার নেই। কিছু না নিয়ে গেলে পন্ডিতজী তাকে বকাঝকা করবেন। পন্ডিত ঘসীরাম ভগবানের এক বড় ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই তিনি প্রার্থনা করতে শুরু করেন। তিনি ৮.০০ টার সময় হাত মুখ ধোন। প্রকৃত প্রার্থনা তারপরেই শুরু হয়। এর প্রথম অংশ শুরু হয় ভাঙ তৈরী দ্বারা। তারপর প্রায় আধ ঘন্টা ধরে তিনি চন্দন কাঠ ঘষেন, এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কাঠের কাঠি দিয়ে কপালে তিলক কাটেন। দুই দাগ চন্দনের মাঝে একটা ছোট ফোটা থাকে। তারপর তিনি তার বুক ও হাতে চাকার মত গোল চিহ্ন দেন। তারপর ঠাকুরের মূর্তি বের করে তাকে স্নান করান, চন্দন লেপে দেন, ফুল নিবেদন করেন, স্তবস্তুতি করেন এবং ঘন্টা বাজান। তিনি তার প্রার্থনা

১০ টার মধ্যে শেষ করেন এবং ভাঙ খাওয়ার পর তিনি ঘর থেকে বের হন। এর মধ্যে কিছু লোক তাঁকে তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানাবার জন্য তার দরজায় অপেক্ষা করে। তিনি তার ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করার ফল সাথে সাথেই পেয়ে যান। এটাই তার আয়ের উৎস। তিনি তার ঠাকুর ঘর থেকে বের হযে এসেই দেখলেন যে, চামার দুখী এক বোঝা ঘাস নিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই দুখী দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর সামনে নত হয়ে প্রনাম করে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল। তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখে দুখীর মনে একটা শ্রদ্ধার অনুভুতি এল! তিনি যেন একজন স্বর্গীয় দেবমূর্তির মত। তিনি বেঁটে ছোট খাটো স্বাস্থ্যবান পুরুষ মাথা ভর্তি টাক, মাংসল গাল, তার উজ্জ্বল দুটি চোখ। চন্দনের ফোটা ও তিলক তাকে একটা স্বর্গীয় রূপ দিয়েছে। দুখীকে দেখে তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার দুখিয়া, কি চাও?' তার মাথা নীচু করে দুখী বলল, 'আমার মেয়ের বিয়ের আশীর্বাদের ব্যবস্থা করেছি মহারাজ। আমি চাই যে, সেই কারণে একটা ভাল দিন ধার্য্য করার প্রয়োজন। আপনার পক্ষে কবে আসা সম্ভব হবে?

ঘসী-'না, আজ দিনের বেলা সময় করতে পারব না। আমি সন্ধ্যে বেলা আসব।'

দুখী- মহারাজ, আর একটু আগে আসা কি সম্ভব? আমি সব আয়োজন করে ফেলেছি। আমি কি ঘাসের বোঝা এখানে রাখতে পারি?

ঘসী-'ওটা গরুর সামনেই রাখ এবং সামনের দরজার সামনেটা ঝাড় দিয়ে পরিস্কার কর। বৈঠক খানাটা অনেক দিন গোবর লেপা হয় নি। একটু গোবর লেপে দিয়ে যা। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার খাবার খাই। আমি একটু বিশ্রাম নেবো, তারপরে তোর সঙ্গে যাব। এই কাঠগুলো কেটে দে। মাঠ থেকে বাকী শষ্যগুলো নিয়ে আয় এবং গোলায় রাখ। দুখী তৎক্ষণাৎ ঘসীর আজ্ঞা পালন করতে শুরু করল। সে ঘরের সামনের দিকটা ঝাঁট দিয়ে পরিস্কার করল, বৈঠকখানা গোবর দিয়ে লেপে দিল। ইতোমধ্যে বিকেল হয়ে এসেছে। পন্ডিতজী খাওয়ার জন্য চলে গেছেন। দুখী সকাল থেকে কিছু খায় নি। তার খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু সেখানে খাওয়ার কিছু ছিল না। তার বাড়ী এখান থেকে এক মাইল দূরে। যদি সে সেখানে ফিরে যায় পন্ডিতজী হয়তো বিরক্ত হবেন। সে খিদে চেপে রেখে গাছের মোটা গুঁড়িটা কাটতে শুরু করল। সেখানে একটা খুব মোটা গাছের ঘুড়ি পড়েছিল এবং অনেক ভক্তই সেটা ফালি করার চেষ্টা করেছে। এখন গুড়িটা দুখীর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'ল। দুখী ঘাস কাটতে এবং ঘাস কেটে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার গাছের গুড়ি ফালি করার অভিজ্ঞতা ছিল না। ঘাসকাটা হয়তো দুখীর কাছে বেশী কঠিন ছিল না। সে জোরে জোরে কুড়াল দিয়ে গুড়ি কাটার চেষ্টা করল। কুড়ালের কোপও দিল, কিন্তু সেই কোপ গুড়ির ওপর কোন দাগ বসাতে পারল না। কুড়াল দিয়ে আর কাটা গেল না। সে ঘামে ভিজে গেল, নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল, ক্লান্তির জন্য সে বসে পড়ল। আবার সে উঠে দাঁড়াল। তার হাত তুলতে কষ্ট হচ্ছিল, তার পা কাঁপছিল, সে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারছিল না। তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসছিল, তার মাথা ঘুরছিল, সে দেখতে পাচ্ছিল না, তবুও সে কাজে ব্যস্ত ছিল। যদি সে একটা হুক্কা পেত তাহলে তামাক টানলে একটু চাঙা হ'ত।

সে চিন্তা করল আমি কিভাবে এখানে একটা হুক্কা পেতে পারি? এটা একজন ব্রাহ্মণের বাড়ী সেখানে নিশ্চয়ই নীচু বংশের লোকদের জন্য তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল সেখানে একজন গন্দ আছে, যে শহরে বাস করে। তার কাছে নিশ্চয়ই হুক্কা ও তামাক পাওয়া যাবে। সে তৎক্ষণাৎ তার বাড়ীতে গেল। তার এই চেষ্টা সফল হ'লো। সে হুক্কা ও তামাক দিল কিন্তু সেখানে কোন আগুন ছিল না। দুখী বলল, ভাই চিন্তা করো না আমি পন্ডিতজীর কাছে যাব এবং পন্ডিতজীকে আগুন দেয়ার ব্যবস্থা করতে বলব। তারা সেখানে খাবার তৈরী করছে। এই কথা বলে সে দুটো জিনিষই নিয়ে পন্ডিতজীর বাড়ীতে গেল। রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আমি যদি একটু আগুন পাই, তাহলে এই হুক্কাটা ব্যবহার করতে পারি।'পন্ডিতজী ভাত খাচ্ছিলেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটি যে আগুন চাইছে সে কে?

পন্ডিত- সেই বোকা দুখিয়া চামার। আমি তাকে কয়েকটা কাঠ টুকরা করতে বলেছিলাম। যদি তোমার কাছে আগুন থাকে তাকে একটু দাও।' তার স্ত্রী বলল 'তোমার কাজ করার সময় তোমার কোন ধর্মীয় জ্ঞান থাকে না। তুমি চামার, ধোপা, অচ্ছুৎদের ঘরে ঢুকতে দাও। মনে হয় যেন এটা কোন হিন্দুর বাড়ী নয়, একটা হোটেল মাত্র। তাকে এখান থেকে চলে যেতে বল, নতুবা আমি এই চিমটা দিয়ে তার মুখ পুড়িয়ে দেব। আমার কাছে তার আগুন চাওয়ার সাহস হয় কি করে?'

তাকে বোঝাবার জন্য পন্ডিতজী বললেন, 'যদি সে এখানে আসে তাতে তোমার কি অসুবিধা আছে? সে তোমার কোন জিনিষ স্পর্শ করেনি। এটা পবিত্র জমি। তুমি তাকে একটু আগুন দাও না। সে আমাদের কাজই করছে। যদি কোন চাকরকে এই কাঠগুলো টুকরো করে দিতে বলতাম, সে তার জন্য পয়সা নিত।'

তার স্ত্রী উচু গলায় চিৎকার করে বলল, সে ঘরের কাছে কেন এল?

তার পরাজয় মেনে নিতে পন্ডিত বললেন 'সে হতভাগ্য।'

তার স্ত্রী- আমি তাকে এইবারের মত আগুন দেব। কিন্তু এর পরেও যদি সে আবার আগুন চাইতে আসে, তাহলে আমি তার মুখ পুড়িয়ে দেব।'

দুখী এইসব কথা শুনছিল। সে অনুশোচনা করল যে, সে অযথাই সেখানে গিয়েছে। মহিলা তো ঠিকই বলেছে, একজন চামার কি করে পন্ডিতের বাড়ীতে আসতে পারে? তারা অত্যন্ত পবিত্র লোক, সেই জন্যেই সাধারণ লোক তাদের কাছে প্রার্থনা করে। তার জন্যই তারা এত গর্বিত। আমরা যে শুধু চামার তা নয়, ছোট জাত, গরীব। আমি এই গ্রামে থেকে বুড়ো হয়ে গেলাম, কিন্তু আমি এখনও পর্যন্ত এই জ্ঞান পাই নি। এই সময় পন্ডিতের স্ত্রী আগুন নিয়ে বের হয়ে এল। দুখী মনে করল এটা স্বর্গের দান। সে তার হাত জড়ো করে এবং মাটিতে কপাল ঠেকেয়ে বলল, পন্ডিতেন মা, আমি আপনার বাড়ীতে ঢুকে ভুল করেছি। এখন চামারের জ্ঞান হয়েছে। আমরা যদি এত ভীরু না হতাম, তাহলে আমরা লাথি খেয়ে মরতাম।

পন্তিতের স্ত্রী হাতে চিমটা ধরে তাতে আগুন নিয়ে এল। সে পাঁচ ফিট দূর থেকে আগুনটা দুখীর দিকে ছুঁড়ে মারল। একটা ছোট আগুনের টুকরো দুখীর কপালে গিয়ে লাগল। এক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে সে তার মাথা ঝাকুনি দিতে লাগল। সে মনে মনে বলছিল এটাই পবিত্র বাড়ী নোংরা করার পুরস্কার। দুখী ভাবলো, ঈশ্বর আমার অপকর্মের ফল এত শীঘ্রই দিয়ে দিলেন। এইজন্য পৃথিবী পন্ডিতদের এত ভয় করে। লোকেরা হয়তো টাকা ধার নিয়ে শোধ দেয় না, কিন্তু তারা কি ব্রাহ্মণদের প্রতি এরকম করতে পারে! এরকম করলে তার পরিবার তো ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পায়ে ক্ষত হতে পারে। সেখান থেকে বের হয়ে এসে দুখী হুক্কায় তামাক খেল এবং কুড়ালটা হাতে নিয়ে তার কাজ শুরু করল। তার কাঠ চেরাই এর শব্দ শোনা গেল। পন্ডিতের স্ত্রীর তার প্রতি কিছুটা দয়া হল, যখন সে জানল দুখীর কপালপুড়ে গেছে। পন্ডিতের স্ত্রীর খাওয়া শেষ হওয়ার পর পন্ডিত বলল, ঐ চামারটাকে কিছু খেতে দাও, 'সে অনেক্ষণ ধরে কাজ করছে। তার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।'

এই প্রস্তাবটাকে বাস্তবে পরিণত করার কোন চিহ্ন না দেখে পন্ডিত জিজ্ঞেস করল, কিছু চাপাতি আছে কি?

পন্ডিতের স্ত্রী কয়েকটি চাপাতিতে কি হবে? তার কম করে হলেও এক কেজি চাপতি লাগবে।'

পন্ডিতের স্ত্রী তার হাত নাড়িয়ে বলল, 'এক কিলো, রাখ তাহলে।' সিংহের মত পন্ডিতজী বলল, ময়দার সঙ্গে ভুষি মেশাও। মোটা মোটা চাপাতি বানাও, যাতে পেট ভরে। তারা পাতলা চাপাতিতে সন্তুষ্ট হয় না। তাদের অনেক খাবার লাগে।

পন্ডিতের স্ত্রী বলল, 'তাহলে ছেড়ে দাও, কে এখন এই প্রচন্ড গরমে রান্না করতে যাবে?

ধুমপান শেষ করে দুখী হাতে কুড়াল নিল। সে ধুমপান করার পরে একটু শক্তি পেয়েছিল। এরপর সে আধা ঘন্টা কাঠ কাটল। তারপর আবার ক্লান্ত হয়ে তার মাথা ধরে বসে পড়ল। ইতোমধ্যে সেই গন্দ (নাম চিকুরি) সেখানে এল। সে বলল, 'কেন তুমি ঐ গুড়িটাকে নিয়ে কষ্ট করছ, এগুড়ি কাটা তোমার কাজ নয়। এই অর্থহীন কষ্ট করো না। মাথার ঘাম মুছতে মুছতে দুখী বলল, 'আমার আবার শষ্যের অবশিষ্ট্য যা খেতে আছে, তা নিয়ে আসতে হবে।

'তুমি কি কিছু খেয়েছ? না, তারা শুধু জানে যে কি করে তাদের কাজ করিয়ে নিতে হয়। তুমি খাবার চাও নি কেন?
দুখী- চিকুরি, তুমি কি কথা বলছ, আমাদের কি ব্রাহ্মণদের চাপাতি হজম হবে?

গন্দ- যদি কেউ দেয় তাহলে হজম হবে। তারা তাদের গোঁফে চাড়া দিয়ে আরামের সঙ্গে ঘুমাতে গিয়েছে। তারা তোমাকে এই কাঠ কাটতে দিয়েছে। এমন কি জমির মালিকও কিছু খেতে দেয়। যদি একজন মালিক তোমায় কোন কাজ বিনা পয়সায় করায় তবুও তাকে তার শ্রমের জন্য অন্যভাবে মজুরী দেয়। এরা তাদের চেয়ে এক ধাপ বেশী যায়। কিন্তু নিজেদেরকে ধার্মিক লোক বলে।

দুখী- 'আস্তে কথা বল, তারা যদি শুনতে পায় তাহলে আমাকে বকাবকি করবে।

এইকথা বলে দুখী তার কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটতে শুরু করল। চিকুরির তার জন্য মমতা হল। সে কুড়ালটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিল এবং প্রায় আধা ঘন্টা ধরে তাতে কোপ বসাল। কিন্তু কাঠের গুড়ির কোন পরিবর্তন হল না। তারপর সে কুড়ালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই কথা বলে চলে গেল যে, তুমি মরে গেলেও এই গুড়িটা টুকরো করতে পারবে না।

দুখী- চিন্তা করতে শুরু করল, কেন পন্ডিত বাবা এই গুড়িটা এখানে ফেলে রেখেছেন। আমি সব রকম চেষ্টা করেও একটা ফালিও বার করতে পারলাম না। আর কতক্ষণ ধরে আমি কাঠ কাটব? এখনও প্রচুর কাজ আছে। এটা একটা আচার-রীতি নিয়মের বাড়ী, এখানে সব সময় একটা না একটা জিনিষ প্রয়োজন। এর জন্য চিন্তার কি দরকার? আমি এখন অবশিষ্ট শস্যগুলি মাঠ থেকে আনি। আমি পন্ডিতজীকে বলব, বাবা আমি আজ কাঠটা কাটতে পারলাম না। আমি আগামীকাল এসে কাঠটা কেটে দেব। সে কুড়ালটা তুলে নিয়ে শস্য আনতে লাগল। শস্যের মাঠটা এখান থেকে দুই ফারলং দূরে অবস্থিত। যদি সে ঝুড়ি পুরা ভর্তি কওে, তাহলে কম সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারবে। কিন্তু তাহলে কে ঝুড়িটা তার মাথায় তুলে দেবে? সে একা ঝুড়িটা মাথায় তুলতে পারবে না। তার জন্য সে অল্প অল্প

করে শস্য নিতে লাগল। বিকেল ৪টার সময় সে কোন মতে সব শস্য নিয়ে আসতে পারল। পণ্ডিতজী ঘুম থেকে উঠেছেন। সে তার মুখ ধুয়ে একটা পান মুখে দিয়ে বাইরে আসলেন। তিনি দেখলেন দুখী ঝুড়িটা মাথায় রেখে ঘুমাচ্ছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'দুখিয়া' তুই ঘুমাচ্ছিস? কাঠগুলো তো এখনও কাটা হয় নি। এতক্ষণ ধরে কি করেছিস? তুই শস্য ঘরে নিয়ে আসতে অনেক সময় নিয়েছিস। এখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এছাড়াও তুই ঘুমাচ্ছিস। কুড়াল তুলে নে, আর গুড়িটা কাটতে শুরু কর। এতক্ষণে এটুকু কাঠ কাটতে পারলি না? তাহলে, তোকে ঠিক সেই রকম খারাপ সময় দিতে হবে তোর মেয়ের আশীর্বাদের জন্য। আমাকে এর জন্য দোষ দিতে পারবি না। সে জন্যই কথায় বলে নীচু জাতের লোকেরা কিছু খেতে পেলে তাদের জীবনযাত্রা পালটে যায়।

দুখী আবার কুড়ালটা তুলে নিল। তার মনে পূর্বে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে সে একেবারে ভুলে গেল। তার পেট একেবারে খালি। সে সকাল থেকেই এক চুমুক জল পর্যন্ত খায় নি। সে একেবারে সময়ও পায় নি। তার উঠে দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছিল। তার হৃদপিণ্ড থেমে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে তার মনকে সান্তনা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দুখী ভাবলো, তিনি পণ্ডিত, তাই হয়তোবা তার মেয়ের আশীর্বাদের জন্য ভুল সময় নির্ধারণ করতে পারেন। তাহ'লে তার মেয়ের বিবাহিত জীবন অভিশাপে ভরে যেতে পারে। সেজন্য লোকেরা তাদের এত সম্মান করে। তাই, মেয়ের বিয়ের জন্য পণ্ডিতের কাছে থেকে শুভ সময় পাওয়া দরকার। তিনি হয়তো কারও ক্ষতি করতে পারেন, ভুল সময় নির্ধারণ করে।

পণ্ডিতজী, কাঠের গুড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। ভালভাবে কুড়ালের কোপ দাও, জোরে জোরে কোপ দাও, দেখে মনে হচ্ছে তোমার হাতে জোরই নেই। যখন দাঁড়িয়েছিলে, তখন কি চিন্তা করছিলে? কাঠটা একবারে ভেঙে যেতে বসেছে, একই জায়গায় কোপ দাও। দুখীর তখন আর জ্ঞান ছিল না। কোন গোপন শক্তি তার হাত চালাতে বাধ্য করছিল। ক্লান্তি, ক্ষুধা, দুর্বলতা সব ক্ষয়ে এসেছে। সে নিজেই তার হাতের শক্তি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। যখনই সে কোপ দিচ্ছিল, তখনই খুব জোরে দিচ্ছিল। সে কোপ দিয়েই যাচ্ছে এবং প্রায় আধাঘন্টা সে জোরের সঙ্গে কোপ দেবার পর কাঠের টুকরাটি মধ্যে থেকে কেটে বেরিয়ে এল এবং কুড়ালটা তার হাতে থেকে পড়ে গেল। ঠিক সেই সময় সেও মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল। তার ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত দেহ কোনও উত্তর দেবার পর্যায়ে রইল না।

পণ্ডিতজী জোরে জোরে ডেকে বললেন, আরো কয়টা কোপ দাও, যাতে এই কাঠটা টুকরো হয়ে পড়ে।

দুখী মাটি থেকে উঠলো না। পণ্ডিতজী তাকে আর কষ্ট দিতে চাইলেন না। তিনি ভিতরে গেলেন, ভাঙ খেলেন, টয়লেটে গেলেন, স্নান করলেন এবং পণ্ডিতের পোষাক পরে বাইরে বের হয়ে এলেন! দুখী তখনও সেইখানেই শুয়েছিল।

তিনি চিৎকার করে ডেকে বললেন, 'দুখি তুমি কি শুয়েই থাকবে, চলো যাই, আমি তোমার ঘরে যাচ্ছি। সেখানে সব ঠিক আছে তো। দুখী শুয়েই থাকল। তখন পণ্ডিতজীর সন্দেহ হ'ল। তিনি তার খুব কাছে এসে দেখলেন, সে মারা গেছে। তিনি পাগলের মত ভিতরে দৌড়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, 'মনে হচ্ছে দুখিয়া মরে গেছে।' তার স্ত্রীও বিব্রত হ'ল, সে বলল- সে তো এখানে কাঠ কাটছিল।'

পণ্ডিত-'সে কাঠ কাটতে কাটতেই মারা গেছে। এখন কি হবে? কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার স্ত্রী বলল, "তার স্ত্রীকে বল লাশ নিয়ে যেতে। কূপে যাবার পথও এটাই ছিল, এবং তাদের মধ্যে একটাই প্রশ্ন উঠেছিল যে, তারা কি করে কূপের জল নিতে যাবে! আর কে জল আনতে যাবে, যেখানে একজন চামারের মুতদেহ পড়ে আছে। একজন বৃদ্ধা মহিলা পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কাউকে মৃতদেহটা অন্য জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে বললেন না কেন? আমরা কেমন করে ঐ জল খাব?

গন্দ চামারদের কলোনীতে গিয়ে বলে এল, কেউ যেন ঐ মৃতদেহ সরাতে না যায়। পুলিশ এখন খোঁজ খবর করবে। একজন দরিদ্র মানুষকে মেরে ফেলা মজার কোন ব্যাপার নয়। পণ্ডিতজী নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ীতে কিছু রেখেছেন। তোমরা যদি মৃতদেহ তুলে নাও, তোমাদেরও পুলিশ ধরবে। তারপর পণ্ডিতজী তাদের গ্রামে গেলেন, কিন্তু গ্রামের কেউই মৃতদেহ কলোনীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে গেল না। দুখীর মেয়ে ও স্ত্রী সেখানে গেল এবং পণ্ডিতজীর বাড়ীর বাইরের দরজায় পৌঁছে কাঁদতে লাগল। অন্য চামারদের স্ত্রীরাও তাদের সঙ্গে ছিল। কেউ কাঁদছিল, কেউ তাদের সান্তনা দিচ্ছিল, কিন্তু সেখানে কোন পুরুষ চামার ছিল না।

পণ্ডিতজী ভয় পেয়ে গেলেন এবং চামারদের অনুরোধ করতে লাগলেন মৃত দেহটা সরিয়ে নিতে। কিন্তু চামাররা পুলিশের ভয়ে পিছিয়ে গেল। কেউ প্রস্তুত ছিল না। তারা দুঃখিত হয়ে ফিরে গেল।

দুখীর মেয়ে ও স্ত্রীর কান্না মধ্য রাত্রি পর্যন্ত চলল। পাড়ার সব ব্রাহ্মণদের এর জন্য ঘুমাতে কষ্ট হল। চামারদের কেউই মৃতদেহ সরাতে এল না এবং ব্রাহ্মণরাইবা কি করে চামারের মুতদেহ স্পর্শ করে। এটা কি কোন ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে? কেউ কেউ বলল, চামারের মুতদেহ স্পর্শ করা যায়, কোথায় লেখা আছে তা আমাদের দেখান। নির্বোধের মত পণ্ডিতের স্ত্রী বলল, এই শয়তানগুলো আমাদের মাথা শূণ্য করে দিয়েছে। তাদের গলার স্বর ক্লান্তও হয় না।"

পণ্ডিত বললেন, তাদের কাঁদতে দাও, তারা যতক্ষণ পারে ততক্ষণ কাঁদুক। সে বেঁচে থাকার সময় কেউ তার খবর নিতে না। এখন, যখন সে মারা গেছে, সবাই চিৎকার করছে।'

পণ্ডিতের স্ত্রী বলল- চামারদের কান্না একটা খারাপ লক্ষণ।'

পণ্ডিত- 'হ্যাঁ এটা সত্যিই একটা খারাপ লক্ষণ। গন্ধও আসতে শুরু করেছে।"

পণ্ডিতের স্ত্রী- 'ওখান থেকে আসলেই খারাপ গন্ধ আসতে শুরু করেছে।'

পণ্ডিত- 'সে চামার হোক বা না হোক। চামাররা কিছু চিন্তা করছে না, কি করা যায় বা কি করা যায় না।'

পন্ডিতের স্ত্রী- 'তারা কোন ঘৃনাও অনুভব করছে না।'

পণ্ডিত- সবাই সমান।

রাত ঘনিয়ে এল কিন্তু কোনও চামার সেখানে গেল না। মহিলা চামাররা কান্না শেষ করে তাদের বাড়ীতে ফিরে গেছে। খারাপ গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পণ্ডিতজী একটা দড়ি নিলেন। একটা ফাঁস তৈরী করে তিনি সেটা মৃত দুখীর পায়ের ওপর ছুঁড়ে দিলেন এবং ফাঁসটা টেনে শক্ত করে লাগালেন। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। পণ্ডিজী মুতদেহটা দড়ির সাহায্যে টেনে নিয়ে গেলেন গ্রামের বাইরে। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি স্নান করলেন, দূর্গার প্রার্থনা করলেন এবং বাড়ীতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন।

দুখীর দেহটা মাঠে শিয়াল, শকুন, কুকুর ও কাকেরা খেয়ে ফেলল। এটাই ছিল জীবনভা নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আত্মনিবেদনের পুরস্কার।

- মুনশী প্রেমচাঁদ।

নোটসমূহ ঃ

অনুশীলন- ৭ : আমি ও আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব।

উদ্দেশ্য: আমাদের পরিচয়ের বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন- আমাদের বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ এবং অঞ্চলভেদে পার্থক্য দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের জন্য আমাদের অভিজ্ঞতায়ও ভিন্নতা দেখা যায়। এ অভিজ্ঞতা ভাল কিংবা খারাপ হতে পারে। আমরা যে এই সামজিক টানাপোড়ন ও বিরোধ দ্বারা প্রভাবিত হই এই অনুশীলনটি তা অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রক্রিয়াঃ

অংশগ্রহণকারীদের এই সেশনের জন্য একটি হলে বসাতে হবে যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম অনুভব করে।

- অংশগ্রহণকারীদের আলাদাভাবে বসতে বলুন;
- অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের খাতা-পত্র, কলম, মোবাইল, ক্যামেরা ইত্যাদি দূরে রাখতে বলুন;
- অংশগ্রহণকারীদেরকে সেশন চলাকালীন সময় একে অপরের সাথে পাশাপাশি যেন কথা না বলে তা বলুন।

১. সহায়ককে এই সেশনের আলোচনার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যাতে অংশগ্রহণকারীগণ এই পয়েন্টগুলির সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে;

২. যেহেতু অংশগ্রহণকারীগকে তাদের অতীতের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে তাই সহায়ককে এই সেশনটি কার্যকারভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।;

৩.সহায়ককে আলোচনার বিষয়গুলো স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার সাথে কণ্ঠস্বরের উঠা-নামার মাধ্যমে বলতে হবে যাতে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় একাত্ম হতে পারেন ও তাদের চিন্তার উদ্রেক ঘটাতে পারেন।

- এটি একটি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক সেশন এবং অংশগ্রহণকারীরা যে কোনো সময় প্রশিক্ষণ হল ছেড়ে যেতে পারেন।
- এই সেশনটি অংশগ্রহণকারীদের জন্যই তৈরীকৃত এবং আপনার সহযোগিতা ছাড়া কেউই আপনার অনুভূতি অনুধাবন করতে পারবে না।
- সেশনের পয়েন্টগুলো ব্যাখ্যা করার সময় সহায়ককে পুরো হল ব্যবহার করতে হবে এবং হাটতে হবে; অংশগ্রহণকারীদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া উচিত যাতে সহায়কের কথা পরিষ্কারভাবে সকল অংশগ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছায়।

আলোচনা সমাপ্তির পর অংশগ্রহনকারীদের বলুন অনুশীলনটি শেষ হয়েছে। অংশগ্রহনকারীদেরকে তাদের জায়গায় বসতে বলুন বা কর্মশালা যেখানে চলছে সেখানে যেতে বলুন। পরবর্তী অনুশীলনটি শুরু করার আগে দেড় ঘন্টা বা দুই ঘন্টা বিরতি দিন।

সময়ঃ

২ - ৩ ঘন্টা

গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার (রিফ্লেকশন) জন্য গাইড লাইন

আপনারা নিশ্চয়ই নিজেকে ভালবাসেন, জীবনকে ভালবাসেন, নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে চান। তাই আমি ধাপে ধাপে আপনাদেরকে আপনাদের মনের বাড়িতে নিয়ে যাব। এখন থেকে কিছুক্ষণ আমি আপনাদেরকে যা বলব, আপনারা তাই করবেন। আমি যা বলব তাই ভাববেন। যা কল্পনা করতে বলব, শুধু তাই কল্পনা করবেন। তাহলে অনায়াসে আপনি আপনার মনের বাড়িতে পৌঁছে যাবেন। আপনি টেনশন মুক্ত হয়ে অনুভব করতে পারবেন অনাবিল প্রশান্তি।

আপনারা মেঝেতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দু'টো শরীরের দুই পাশে সোজা করে রাখুন। হালকাভাবে চোখ বন্ধ করে লম্বা দম নিন। নাক দিয়ে দম নিন এবং আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। এমনভাবে দম নিন যাতে বুকের নিচের অংশ এবং পেটের উপরের অংশ ফুলে ওঠে। লম্বা দম নিন এবং আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নিতে নিতে ভাবুন, প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রান শক্তি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে এবং শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেড়িয়ে যাচ্ছে। গভীরভাবে দম নিন এবং দম নিতে নিতে ভাবুন, প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রান শক্তি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে এবং শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেড়িয়ে যাচ্ছে। নাক দিয়ে দম নিন এবং আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নিতে নিতে ভাবুন, প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রান শক্তি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে এবং শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেড়িয়ে যাচ্ছে। দম নিতে নিতে ভাবুন, প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রান শক্তি আপনাকে সজীব ও প্রানবন্ত করে তুলছে এবং শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেড়িয়ে যাচ্ছে।

এখন দম স্বাভাবিক হতে দিন। নাক দিয়ে দম নিন এবং নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। আপনার চোখ বন্ধই আছে। এক মুহূর্তে আপনি আপনার শরীরে নজর বুলিয়ে যান। মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত নজর দিন। এবার মনযোগ দিন মাথার তালুর পেশীতে। মনে করুন এবং অনুভব করুন সেখানে রক্ত চলাচল বাড়ছে। একটু গরম গরম লাগছে, সেখানে শির শির করছে। মনে করুন মাথার তালুর পেশী শিথিল হয়ে গেছে, পেশী ভারী হয়ে গেছে।

এবার কপালে মনযোগ দিন। মনে করুন এবং অনুভব করুন আপনার কপালে রক্ত চলাচল বাড়ছে। একটু গরম গরম লাগছে, সেখানে শির শির করছে। মনে করুন কপালের পেশী শিথিল হয়ে গেছে, পেশী ভারী হয়ে গেছে।

এবার চোখ ও চোখের পাতায় মনযোগ দিন। মনে করুন এবং অনুভব করুন সেখানে রক্ত চলাচল বাড়ছে। একটু গরম গরম লাগছে, চোখের পাতায় শির শির করছে। চোখ বুজে আসছে, পেশী শিথিল হয়ে গেছে, পেশী ভারী হয়ে গেছে।

এবার ঠোঁট ও জিহ্বায় মনযোগ দিন। মনে করুন এবং অনুভব করুন আপনার ঠোঁট ও জিহ্বায় রক্ত চলাচল বাড়ছে। একটু গরম গরম লাগছে, সেখানে শির শির করছে। মনে করুন ঠোঁট ও জিহ্বার পেশী শিথিল হয়ে গেছে, পেশী ভারী হয়ে গেছে।

এবার মুখমন্ডলে মনযোগ দিন। মনে করুন এবং অনুভব করুন আপনার মুখমন্ডলে রক্ত চলাচল বাড়ছে। একটু গরম গরম লাগছে, সেখানে শির শির করছে। মনে করুন মুখমন্ডলের পেশী শিথিল হয়ে গেছে, পেশী ভারী হয়ে গেছে।

অনুভব করুন শিথিলতা মাথার তালু থেকে আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামছে। আপনি এখন নিজেকে বরফের তৈরী মানুষ বলে মনে করুন। ভাবুন বরফের গায়ে একটু তাপ লাগার ফলে তা আস্তে আস্তে গলছে। বরফের গা বেয়ে পানি যেমন নীচের দিকে গড়িয়ে যায়, তেমনি শিথিলতা আপনার মাথার তালু থেকে পায়ের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

আপনার চোয়ালে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। আপনার গলায় উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। আপনার ঘার ও কাঁধে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। আপনার বুকে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। আপনার পিঠে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। আপনার মেরুদণ্ডে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। আপনার বাম ও ডান হাতে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। আপনার পেট ও পাকস্থলিতে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। অনুভব করুন আপনার কোমর শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনার নিতম্বে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। অনুভব করুন আপনার উরু শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনার হাটুতে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। আপনার পায়ে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। আপনার গোড়ালিতে উষ্ণ শিথিলতা অনুভব করুন। অনুভব করুন আপনার পায়ের পাতা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। অনুভব করুন আপনার হাতের আঙ্গুল শিথিল হয়ে যাচ্ছে। অনুভব করুন আপনার পায়ের আঙ্গুল শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

অনুভব করুন এই শিথিলতা শ্রোতের মত, বরফ গলা পানির মত আপনার মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পড়িয়ে যাচ্ছে (২)। আপনার শরীর শিথিল ও নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। এবার ধীরে ধীরে দম নিয়ে বেশ সময় ধরে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়ার জন্য একটু বেশী সময় নিন। ধীরে ধীরে দম নিন এবং ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। (২)

এবার দম স্বাভাবিক হতে দিন। আপনি এখন দম খেয়াল করুন। অনুভব করুন বাতাস নাক দিয়ে ফুসফুসে ঢুকছে, আবার বেড়িয়ে আসছে। আপনার পুরো মনযোগ নাকে দিন। অনুভব করুন শিথিলতা শ্রোতের মত, বরফ গলা পানির মত আপনার নাক দিয়ে ঢুকছে এবং গরম বাতাস বেড়িয়ে যাচ্ছে (২)। আপনার শরীর শিথিল ও নিস্প্রভ হয়ে আসছে।

এবার ধীরে ধীরে দম নিয়ে বেশ সময় ধরে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়ার জন্য একটু বেশী সময় নিন। ধীরে ধীরে দম নিন এবং ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। (২)

অনুভব করুন আপনার শরীর ভারী লাগতে শুরু করছে। আপনি এবার অনুভব করুন মধ্যাকর্ষণ শক্তি আপনাকে নীচের দিকে টানছে। আপনি অনুভব করুন আপনার মাথার ওজন বেড়ে গেছে। মাথা উপরের দিকে তুলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। আপনার হাত, পা ও নিতম্বের ওজন বেড়ে গেছে, তা আপনি খেয়াল করুন। অনুভব করুন, শরীর ভারী হ'তে হ'তে তা জড় পদার্থে পরিনত হচ্ছে। অনুভব করুন, আপনার দেহের কোষগুলো আর জৈব কোষ নেই। আপনার দেহের কোষগুলো পরিনত হয়েছে বালু কনায়।

কল্পনা করুন আপনার শরীরের প্রতিটি কোষই এখন বালুকনায় পরিনত হয়েছে। এখন আপনি অনুভব করুন, আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বালুকণাগুলো ঝরে পরতে শুরু করেছে। আপনার হাত, পা, উরু, পেট, বুক, মাথা সব শুকনো বালুর মত ঝড়ে পরে যাচ্ছে। আপনি অনুভব করুন, আপনার শরীর সূক্ষ বালুকণার স্তুপে পরিনত হয়ে মেঝেতে পরে আছে। আপনি এখন একটি সূক্ষ বালুকণার স্তুপ।

এবার আপনি অনুভব করুন, উত্তর দিক থেকে শীতল বাতাস আসছে। বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাস ঝড়ে রূপ নিচ্ছে। ঝড় আপনার শরীরের বালুকণাগুলো চার দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখন আপনার শরীর বলতে আর কিছু নেই। শুধু আছে আপনার চেতনা আর মন। আপনি এখন পুরোপুরি শিথিল। শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে গেছেন আপনি। আপনি এখন মনের বাড়িতে পৌঁছে গেছেন।

চেতনা আর মনের বাড়িতে বসে আপনি এখন আপনার স্মৃতি দিয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন। যা আপনার এই কম্পোজিট হেরিটেজ প্রশিক্ষণে সবার সাথে সেয়ার করতে পারবেন। যদি আপনি তা চান।

- **প্রথম কবে আপনার মনে হলো আপনার বিশেষ কিছু পরিচিতি রয়েছে?**
  - আপনি কখন বুঝতে পারলেন যে আপনি একটি নির্দিষ্ট বর্ণ/ধর্ম/জাতির অন্তর্ভূক্ত?
  - কখন এবং কত বছর বয়সে আপনি অনুভব করেছেন যে, আপনি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত?
  - কোন ঘটনাটির প্রেক্ষিতে আপনার এই অনুভূতি তৈরী হয়েছিলো?
  - আপনি কিভাবে এটি অনুভব করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

এটা সম্ভব যে, আপনি ধীরে ধীরে কোন জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

- **এই আত্মিক সম্পর্কের কারণগুলো কি ছিল?**
  - এই আত্মিক সম্পর্কে আপনার আচরণে কোন প্রভাব ফেলেছিলো কি?

- **আপনি কি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কের কারণে গর্ববোধ করেছিলেন?**
  - কেন আপনি সে রকম মনে করেন?
  - আপনি কিভাবে এ গর্বের অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন?

- **আপনার কি কোনো বিশেষ কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করার কারণে হীনমন্যতায় ভূগেছিলেন কিংবা খারাপ অনুভূতি হয়েছিল?**
  - কেন আপনি তা অনুভব করেছেন?
  - আপনি কিভাবে এই খারাপ অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন?

- **আপনি কি অন্য কোন সম্প্রদায়ের দ্বারা অপমানিত হয়েছেন?**
  - কেন আপনি তা অনুভব করেছেন?
  - আপনি কিভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন?
  - এটা কেন ঘটেছে তা কি কখনো ভেবে দেখার চেষ্টা করেছেন?

- **আপনার অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ জন্মেছিল বা কোন সম্প্রদায় থেকে দুরে থাকার ঘটনা ঘটেছিলো?**
  - আপনার ঘৃণা বা দূরত্ব বজায় রাখার কারণ কি ছিল?
  - তারপর আপনি কি করেছিলেন?

- আপনি কি সেই সময়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন?
- কি কারণে আপনি অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে বিরত ছিলেন?

- **অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার কি সহানুভূতিশীল অনুভূতি ছিল?**
  - আপনার এই সহানুভূতিশীল অনুভূতি কেন ছিল?
  - সেই সময়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

উপকরণঃ

মার্কার, পোষ্টার পেপার, মাসকিন টেপ

সহায়কদের জন্য নোটঃ

এই অনুশীলনটি খুবই সংবেদনশীল। এ প্রক্রিয়ার সাথে অনেক আবেগীয় বিষয় জড়িয়ে আছে এবং এটা অংশগ্রহণকারীদের আবেগকে আরও নাড়া দিবে এবং মাঝে মাঝে তার বহিঃপ্রকাশও হবে। কোন অংশগ্রহণকারীকে তাদের জীবনের সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং বিরক্তিকর কোন ঘটনা মনে করা কিংবা অনাকাঙ্খিত অতীত স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া কোন সহজ কাজ নয়। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি না করে যদি সহায়ক এই অনুশীলনটি পরিচালনা করে তবে এর উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। যদি সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে এবং অংশগ্রহণকারী নিজেদেও মধ্যে কোন আস্থা না থাকে তহলে অনুশীলনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসতে অনিচ্ছা ব্যক্ত করতে পারে। অনুশীলনটি পরিচালনা করার আগে ও পরে সহায়ককে নিম্নলিখিত কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে।

অনুশীলনের পূর্বে ঃ

এই অনুশীলনটি করার জন্য ব্যবহৃত স্থানটি অন্যান্য অনুশীলন বা প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত স্থান একই হওয়া উচিত নয়। সহায়ককে অংশগ্রহণকারীদের বসার জন্য খোলামেলা আরামদায়ক বড় হল বা স্থান নির্বাচন করতে হবে যাতে তারা আরামে বসতে পারে এবং রিফ্লেকশানের কাজটি করতে পারে। এমন একটি খোলামেলা আরামদায়ক বড় রুম বা স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে কোন আসবাবপত্র নেই এবং অংশগ্রহণকারীগণ মেঝেতে বসে অনুশীলনটি করতে পারে। যে হলরুমের আলো খুব উজ্জ্বল নয় এমন হলরুম হলে ভালো হয়। সহায়ক চাইলে হালকা সুমধুর কোন মিউজিক ব্যবহার করতে পারেন। যদি সহায়ক মিউজিক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন তবে তা অবশ্যই কোন হালকা মিউজিক হতে হবে, যা রিফ্লেশনের প্রক্রিয়াকে ব্যহত করবেনা। এটি একটি আরামদায়ক ও নির্দোষ পরিবেশ তৈরীর জন্যই করা হবে। তবে সহায়ককে মনে রাখতে হবে যে, মিউজিকটি অবশ্যই যেন বাদ্য যন্ত্রের হয়। সহায়ককে খেয়াল রাখতে হবে যেন অংশগ্রহণকারীগণ একে অপরের থেকে যথেষ্ঠ দুরত্বে বসেন। এই রিফ্লেশনশন প্রক্রিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে কাগজ, কলম এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে তাই এই প্রক্রিয়া শুরুর সময় অংশগ্রহণকারীগণ যেন তাদের লেখার সব উপকরণ ফেলে আসে তা নিশ্চিত করতে হবে।

অনুশীলনী চলাকালীন সময়ঃ

অনুশীলনী চলাকালীন সময় অংশগ্রহণকারীগণ যেন কোন ধরনের ভয়-ভীতি ও আশঙ্কা অনুভব না করেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই অনুশীলনটির প্রেক্ষিত ঠিক করার সময় সহায়ককে অবশ্যই পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে যে, এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত পয়েন্টগুলো আমাদেরই সামাজিক সমস্যা যা আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজের মধ্যে থেকেই মোকাবেলা করি। এগুলো ব্যক্তিগতভাবে নেয়া ঠিক হবে না। প্রতিফলনের জন্য পয়েন্টগুলি উপস্থাপনের সময়, সহায়ক যেন খুব তাড়াহুড়া না করেন কিংবা খুব বেশী সময় না নেন যাতে অংশগ্রগনকারীগণ রিফ্লেকশানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এইক্ষেত্রে সহায়ককে পয়েন্টগুলো উপস্থাপনায় কত সময় লাগবে তা ঠিক করে নিতে হবে।

পরিশেষে, পয়েন্টগুলো উপস্থাপনায় বিষয়ের প্রকৃতি এবং আবেগগুলোর উপর নির্ভর করে কণ্ঠস্বরের বিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সহায়কের কণ্ঠস্বর নরম ও শ্রুতি মধুর করার পাশাপাশি তার কণ্ঠস্বরেরও উঠা-নামা থাকবে। অতএব সেশন শুরুর আগে সহায়ককে নিজে-নিজেই এই পয়েন্টগুলো অনুশীলন করতে হবে।

সেশন পরবর্তী সময়ে করণীয়ঃ

এই সেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের মনঃস্তাত্তিক যাত্রা এবং রিফ্লেকশান প্রক্রিয়া পরিমাপ করা, তাই ইচ্ছে হলে তারা বড় দলে তাদের চিন্তা শেয়ার করতে পারেন। এরজন্য সহায়কের উচিত একটি উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা। মনে রাখতে হবে যে, এই অভিজ্ঞতা খুব সংবেদনশীল। এই প্রক্রিয়ায় এমন কোন ধরণের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা উচিত নয় যা অংশগ্রহণকারীগনের জন্য বেদনাদায়ক।

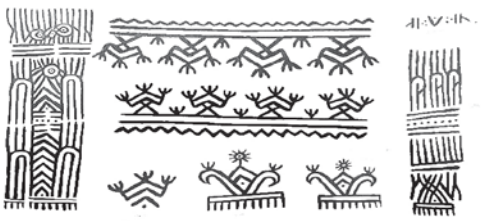

নোটসমূহ ঃ

অনুশীলন ৮: বিমিশ্র ঐতিহ্য বা কম্পোজিট হেরিটেজের (অভিষ্ট অর্জনে) সক্ষমতা

উদ্দেশ্য:
অংশগ্রহণকারীগণ সংঘাতপূর্ণ সমাজে ঐক্য স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে সমন্বিত ঐতিহ্যের সক্ষমতা অনুধাবন

প্রক্রিয়া:

- ছোট দলে আলোচনা (অঞ্চল ভিত্তিক দল ভাগ)
- উপস্থাপনা
- সহায়কের ইনপুট।

আলোচ্য পয়েন্ট:

- **বিমিশ্র** ঐতিহ্যের (কম্পোজিট হেরিটেজ) এমন একটি ঘটনা মনে করুন যা সামাজিক দ্বন্দ্বপূর্ণ সমাজে সংযোগকারী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে;
- এমন একটি অভিজ্ঞতা মনে করুন যার মাধ্যমে দ্বন্দ্বেলিপ্ত সম্প্রদায়গুলো যেকোন **বিমিশ্র** ঐতিহ্য (কম্পোজিট হেরিটেজ) রক্ষায় একত্রিত হয়েছিল;
- এমন একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় **বিমিশ্র** ঐতিহ্য (কম্পোজিট হেরিটেজ) রক্ষার্থে এবং জনপ্রিয় করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

উপকরণ:
মার্কার, পোষ্টার পেপার, মাসকিন টেপ

সময় :
৩ ঘন্টা।

সহায়কদের জন্য নোট:

অংশগ্রহণকারীগণ সাধারনতঃ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। এটা সম্ভব যে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরণের **বিমিশ্র** ঐতিহ্যের (কম্পোজিট হেরিটেজ) উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। তারা যাই স্মরণ করার চেষ্টা করুক না কেন সহায়ক তাদেরকে যে সমস্ত পয়েন্টের উপর রিফ্লেকশন করার কথা বলেছেন সেগুলোরই উত্তর তারা দিবেন।

এটি হওয়ার কারণ, অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ স্মরণ করার চেষ্টা করেন।

উদাহরণস্বরূপ, **বিমিশ্র** ঐতিহ্যের (কম্পোজিট হেরিটেজের) একটি পর্ব উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বিবাদমান সম্প্রদায়গুলোর অভিজ্ঞতা এক রকম নাও হতে পারে। এক অর্থে এটি একটি সুবিধা যে, ভিন্ন ভিন্ন সমন্বিত ঐতিহ্যের বিভিন্ন উদাহরণ এবং তাদের ফলপ্রসূতা দ্বন্দ্বপূর্ণ সমাজে শান্তি ও একতা ফিরিয়ে আনার উপায় হিসেবে কাজ করে।

সহায়ককে মনে রাখতে হবে যে, এই অনুশীলনটি পরবর্তীতে **বিমিশ্র** ঐতিহ্যের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুশীলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এই অনুশীলনটির মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা তৃণমুল পর্যায়ে কৌশল প্রণয়নে অংশগ্রহণকারীদের মনে আরও ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

কম্পোজিট হেরিটেজের ধরন অনুযায়ী এই অভিজ্ঞতাগুলোকে সহায়ক সহজেই শ্রেণীবিন্যাস করবেন। সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে এমন সমন্বিত ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতাসমূহ থাকবেই। এ সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারনার জন্য সহায়ককে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আরও বেশি অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করবেন।

আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীগণ একমত হতে পারে যে, **বিমিশ্র** ঐতিহ্য (কম্পোজিট হেরিটেজ) মানুষের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার পরিবর্তে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, আবার কখনো কখনো তাদের দ্বিধা বিভক্ত করতে পারে। এটি সর্বত্র দেখা গেছে যে, দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারীরা তাদের মিশনে সফল হওয়ার জন্য প্রথমে সম্প্রদায়গুলোর সেতুবন্ধনগুলোকে আক্রমন করে। যেহেতু **বিমিশ্র** ঐতিহ্য (কম্পোজিট হেরিটেজ) সকল সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী সেতু বন্ধনের উপাদান তাই এই উপাদানগুলো সহজ টার্গেটে পরিনত হয়।

যদি সহায়ক সফলভাবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই বিষয়টিকে কার্যকরভাবে আলোচনা করতে পারে তবে এটি অংশগ্রহণকারীদেরকে শুধুমাত্র সংবেদনশীল করে তুলবে না বরং তাদের প্রত্যাশিত ফলাফল দিবে। এটি শুধু দ্বন্দ্বপূর্ণ সমাজে **বিমিশ্র** ঐতিহ্য (কম্পোজিট হেরিটেজ) ব্যবহার করতেই অনুপ্রাণিত করবেনা বরং তা ঐক্য রক্ষা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি হতিয়ার হিসাবে কাজ করবে ।

এই অনুশীলনটি যদি কাঙ্খিত ফলাফল সরবরাহ করতে সক্ষম হয় তবে তা শান্তি-সম্প্রীতি পুনঃস্থাপন করার জন্য বিমিশ্র ঐতিহ্য (কম্পোজিট হেরিটেজ) ব্যবহারের কৌশল পরিকল্পনা সম্পর্কে পরবর্তী অনুশীলনটি করতে আরও বেশী অগ্রহী করে তুলবে। এটি তৃণমূল পর্যায়ে যে কোন কৌশল বাস্তবায়ন করতে তাদেরকে তৈরী করবে ।

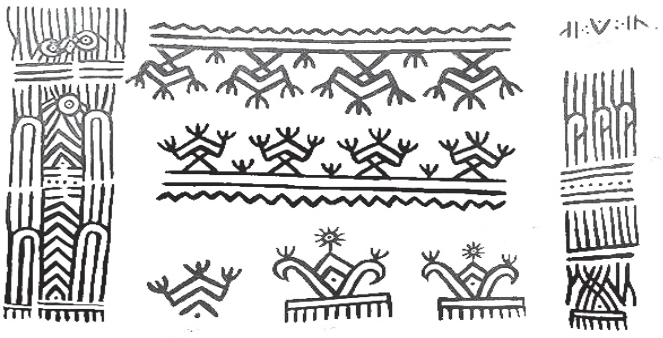

উদাহরণঃ

গাজীপুর (উত্তর প্রদেশ):

গাজীপুর (উত্তর প্রদেশ) - শ্রাবণ মাসে নাগপঞ্চি উৎসবের উপলক্ষে রাজাপুরের গ্রামবাজারে বহু দশক ধরে একটি বড় মেলার আয়োজন করা হয়। এখানে বিনোদন এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে সব শ্রেণীর, জাতি ও ধর্মের লোকজন অংশগ্রহণ করে। কারিমুদ্দীনপুর নামে অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও এতে অংশ নিতেন। কিন্তু, স্থানীয় উদ্বেগের (ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা) কারণে, তারা দুটি মেলার আয়োজন শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে কিছু লোক দ্বিধান্বিত হয়েছিল কারণ তারা কোন উৎসবে যাবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলনা। যারা মেলায় উপস্থিত ছিলেন তারা তাদেরই নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজন। এই পরিস্থিতিতে উভয় কমিউনিটির মধ্যে একটি আলোচনা করা হয় এবং ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়। এই আলোচনার কারণে, মেলাটি পুনরায় সংগঠিত করা হয়েছিল একই জায়গায় এবং এতে সবাই খুব আনন্দিত হয়েছিলো।

বাঘেলখন্ড (মধ্য প্রদেশ) - ঘটনাটি ২০০৭ সালে সাতানা জেলার একটি গ্রামের পঞ্চায়েতের নির্বাচনের। এই গ্রামের নির্বাচনের আসন অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর/শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। ওই গ্রামে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর/শ্রেণীর প্যাটেল বর্ণের্র কর্তৃত্ব ছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নাইয়া বর্ণ থেকে একজনকে অনুরোধ করেছিলেন। ফলে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর/শ্রেণীর সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। প্যাটেল ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কোন ধরণের কথোপকথন বন্ধ হয়ে যায়। উভয় সম্প্রদায় একসঙ্গে উৎসব পালন বন্ধ করে দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করা হয়। উভয় সম্প্রদায়কে ফোক/পটের গান গাইতে বলা হয় (হোলির উৎসবে প্রচলিত একটি লোকসঙ্গীত)। উভয় সম্প্রদায় একসাথে গানে অংশগ্রহণ করতে রাজি ছিল না। কিন্তু, ধীরে ধীরে বরফ গলতে শুরু হয় এবং উভয়েই পুরো রাতের জন্য গান গেয়েছিল। বিরোধের আগে উভয় দলের যুবকরা একসঙ্গে ক্রিকেট খেলত এবং প্রতিযোগিতার সময় একসঙ্গে চলাফেরা করত। কিন্তু, বিরোধের পরে, এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। লোকসঙ্গীত গাওয়ার পরে, তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঝাড়খণ্ড- গ্রামে বসবাসরত দুইটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। ঝাড়খণ্ড এর খুন্তি জেলা। উভয় সম্প্রদায়ের উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কিছু কারণে, দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উত্তেজনা চরম শিখর পৌঁছে। ঐ সময় বৃষ্টি শুরু হয়। তারা তাদের যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে পারতো কিন্তু তারা তা করেনি কারণ এতে তারা সারা বছর এর ফসল ধ্বংস করবে। তারা যদি তাদের চাল এবং বাছুর বা অন্যান্য কৃষি দ্রব্য উৎপাদন না করতে পারে তবে তারা অনেক সমস্যায় পরবে। তাছাড়া, যদি ফসল উৎপাদনে ব্যহত হয় তবে তাদের জীবিকা নির্বাহে তারা ব্যর্থ হবে কেননা ফসল উৎপাদন তাদের জীবনের একমাত্র উৎস, তা ব্যতীত তাদের জীবন অচল। যে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল তা বৃষ্টি শুরু হতেই রাতারাতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

নাটি: নাটি হিমচল প্রদেশের প্রধান লোক নাচ। নারী -পুরুষ উভয়ে এই নৃত্য পরিবেশন করে যখন তারা আনন্দিত থাকে। বাহু এবং ভুমিয়া নামের দুটি গ্রাম আছে, সেখানে দিভালী নামে একটি পারস্পরিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যার কারণে লোকজন একে অপরের সাথে কথা বলতো না। তা সত্ত্বেও, মানুষ নাগনি মেলার পরিদর্শন করতো। উভয় গ্রামের মানুষ একে অপরকে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু, নাটি নাচ ছিলো মেলার প্রধান আকর্ষণ, যখন মেলায় এ নাচ শুরু হতো মানুষ একে অপরের কাছাকাছি চলে আসতো, যা তাদের মধ্যের পারস্পরিক সংঘাতকে কমিয়ে আনে।

ঝাড়খণ্ড কোয়েলকারো সংগ্রাম - আদিবাসি ও বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে সর্বদা একটি তীব্র উত্তেজনাপূর্ন পরিস্থিতি বিরাজ করে। কিন্তু নদীর উভয় তীরবর্তী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে কোয়েলকারো নদী একটি বিমিশ্র ঐতিহ্য। যখন এটির উপর একটি বাধ তৈরীর পরিকল্পনা শুরু হয়, তখন উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ কেবল নিকটবর্তীই হয়নি বরং একত্রিত হয়ে এই পরিকল্পনাটির বিরোধিতা শুরু করে। এই নেতিবাচক পরিকল্পনা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে কাছাকাছি এনেছিলো।

ঝাড়খণ্ড - গরিদীহ জেলায় পঞ্চমবা নামে একটি মেলার আয়োজন করা হতো। এই মেলাটি সাধারনত: আট দিন ধরে চলে। এখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করে। সেখানে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এতে নিহত হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে সেখানকার মেলা প্রশাসন ঐ বছর মেলা আয়োজনের না করার সিদ্ধান্ত নেয়। অত:পর উভয় সমাজের মানুষ

মেলা প্রশাসন এর কাছে সুপারিশ করে ঐ মেলাটি আয়োজন করার জন্য। এটি একটি সফল মেলা ছিল এবং একই সাথে তাদের মধ্যাকার ঘৃণাও অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আলোচনার জন্য কিছু পয়েন্ট (একটি চার্ট তৈরি করুন এবং তা দেয়ালে টানিয়ে রাখুন)

- এমন একটি ঘটনা মনে করার চেষ্টা করুন যেখানে সমন্বিত ঐতিহ্যের মাধ্যমে বিবাদমান পরিস্থিতিকে একত্রিত করেছে।
- এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে করার চেষ্টা করুন যেখানে সমন্বিত ঐতিহ্যে মাধ্যমে বিবাদমান ২টি দলকে একত্রিত করেছে।
- এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে করার চেষ্টা করুন যেখানে দ্বন্ধ সংঘাতময় দলগুলো সমন্বিত ঐতিহ্য রক্ষায় কাজ করেছে।
- এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে করার চেষ্টা করুন যেখানে দ্বন্ধ সংঘাতময় দলগুলো একত্রিত হয়ে সমন্বিত ঐতিহ্যকে উৎযাপন করেছে ।
- এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে করুন যেখানে এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে যৌথভাবে সমন্বিত ঐতিহ্য রক্ষায় কাজ করছে
- এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে করুন যেখানে সমন্বিত ঐতিহ্য মানুষকে বিভক্ত করেছে, যদি তাই হয় তবে তাহলে মানুষ একে অপরের বিরূদ্ধে যেতে বাধ্য করে এমন সেখানে কোনো বাহ্যিক প্রভাব কাজ করেছিলো।
- এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে করুন যেখানে সমন্বিত ঐতিহ্যকে বিতর্কিত ও বিভক্ত করার জন্য জড়িতদের প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মানুষ একত্রিত হয়েছে।

এই পয়েন্টগুলো হ্যান্ডবুক এর প্রথম সংস্করণ প্রশিক্ষক এবং অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হয়েছে। সহায়ক পরিস্থিতি অনুযায়ী এই পয়েন্ট ব্যবহার করতে পারবেন।

নোটসমূহ ঃ

অনুশীলন- ৯ : "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যের" হুমকি

উদ্দেশ্য: বিমিশ্র ঐতিহ্যের উপর হুমকি সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে জানা।

প্রক্রিয়া:

- সহায়ক অনুশীলনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে পরিস্কার ধারণা প্রদান করবেন।
- ভৌগলিকগত কারণে এলাকাভেদে নানা ধরণের হুমকি এবং হুমকিসমূহের পিছনে নানা শক্তি কাজ করে থাকতে পারে তাই দল গঠনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে দল গঠন করা।
- বিমিশ্র ঐতিহ্যের উপর শুধু হুমকিগুলোকে চিহ্নিত করা নয় বরং হুমকি সৃষ্টির পেছনের শক্তিগুলোকেও যাতে তারা চিহ্নিত করতে পারে, তার জন্য অনুশীলনীটির বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া।
- এসময় সহায়ক দলে সবাইকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণা দলে আলোচনা করতে বলবেন। সহায়ক প্রত্যেক দলে ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম সরবরাহ করবেন। দলীয় আলোচনার জন্য ১ ঘন্টা সময় দেয়া হবে।
- সহায়ক ছোট দলের সমন্বিত ধারণা ফ্লিপচার্টে লিখতে বলবেন।
- এরপর সহায়ক ছোট দলের সমন্বিত ধারণা বড় দলে উপস্থাপন করতে বলবেন।

আলোচনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ:

- বিমিশ্র ঐতিহ্যের কোন ধরনগুলো হুমকির মধ্যে রয়েছে?
- বিমিশ্র ঐতিহ্যের হুমকিগুলো কি?
- কাদের থেকে বিমিশ্র ঐতিহ্যের হুমকিগুলো আসে?

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

চার্ট, মার্কার, স্কেচ পেন, টেপ

সময়:

২ঘন্টা।

সহায়কদের জন্য নোটঃ

এই অনুশীলনের উদ্দেশ্যের দু'টো দিক রয়েছে। প্রথমটি হলো সমন্বিত ঐতিহ্যের উপর হুমকির ধরণ কি এবং দ্বিতীয়টি হলো হুমকির পেছনে শক্তিগুলোকে চিহ্নিত করা। বেশ কিছু অনুশীলনী করার ফলে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে সমন্বিত ঐতিহ্যের হুমকির ধরণ কি এবং হুমকিগুলোর পেছনের শক্তি বা দায়ী ফ্যাক্টরগুলো চিহ্নিত করতে খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীরা উপস্থাপনা তিনটি কলামে বিভক্ত করবেন, সহায়ক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সময় তা পরিস্কার করবেন। প্রথম কলামে যে ধরনের বিমিশ্র ঐতিহ্যগুলো হুমকির মধ্যে আছে সেগুলো উল্ল্যেখ করবেন।

দ্বিতীয় কলামে সংশ্লিষ্ট বিমিশ্র ঐতিহ্যের উপর হুমকির প্রকৃতি নিধারণ করতে হবে এবং শেষ কলামে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সমন্বিত ঐতিহ্যের হুমকির পিছনে করা দায়ী তা পরিস্কার করে চিহ্নিত করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের আরো সহজ করার লক্ষ্যে সহায়ক নির্দিষ্ট কিছু সমন্বিত ঐতিহ্যের হুমকির গতি প্রকৃতি এবং হুমকির পিছনে দায়ী শক্তিগুলোকে চিহ্নিত করার উদাহরণ দেবেন, যাতে অংশগ্রহণকারীগণ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য পূরণে সঠিক পথে কাজ করতে পারেন। অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে সহজ হবে, যদি বলা হয় যে, সমাজে ধর্মান্ধ শক্তিগুলো সমন্বিত ঐতিহ্যের নানা ধরণগুলোকে উপড়ে ফেলছে, ফলে জনগোষ্ঠীর মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ বসবাসের জন্য বিদ্যমান মেলবন্ধগুলো তেমন আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু দেখা যায় যে, যারা বিমিশ্র ঐতিহ্যের সব ধরণ ধবংস কিংবা বিকৃত করেই চলেছে সে শক্তিগুলোকে আমরা সচেতনভাবে উল্লেখ করি না, শুধু বলিযে এর জন্য ধর্মান্ধ শক্তিগুলোই দায়ী।

বলতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের শক্তির উৎস বিমিশ্র ঐতিহ্যগুলোকে উদাসীনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ আর অবহেলার দৃষ্টি নিয়েই দেখা হয়। বিমিশ্র ঐতিহ্যের প্রতি কখনও কখনও আমাদের মনোভাবও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এভাবেই হয়ত বিমিশ্র ঐতিহ্যগুলো হারিয়ে যায়, যার জন্য আমাদের কিছু কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমরাও সমানভাবে দায়ী। ফলে আমরা কখনও কখনও বিমিশ্র ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়াই।

নিজেদের কাজের মূল্যায়নের পাশাপাশি নিজেদেরকে বিমিশ্র ঐতিহ্য সব ধবংস হয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী হিসেবে দেখতে চাওয়াটা খুবই কঠিন একটি কাজ। আমরা আমাদের সম্ভাব্য সকল উপায়গুলো নষ্ট করে ফেলছি অথচ যা দিয়ে হুমকির শক্তিগুলোকে পরাজিত করা যেতো, যারা কিনা সমাজের ঐক্য সংহতি সম্প্রীতিগুলোকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিশ্বব্যাপী কিছু কিছু পরিবর্তন সরাসরি আমাদের কিছু কিছু সমন্বিত ঐতিহ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব রাখে। প্রত্যেক নতুন নতুন ব্যবস্থা বা পদ্ধতির নিজস্ব কিছু কাঠামো এবং নতুন সংস্কৃতি তৈরী করে। এই নতুন নতুন কাঠামো বা সংস্কৃতিই সমাজে বেঁচে থাকার একটি অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদ এবং বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি একটি নিজস্ব ভোক্তা সংস্কৃতি তৈরী করেছে যেখানে সমন্বিত ঐতিহ্যের প্রয়োজন নেই অথচ এখনও পর্যন্ত মানুষের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখার উপায় হিসেবে দেখি। সমন্বিত ঐতিহ্যের কিছু কিছু উপাদানকে সামন্তপ্রথা এবং সামন্ত যুগের বলে এমনভাবে ব্রান্ডেড বা চিহ্নিত করেছি যা আপনা-আপানি বিলুপ্ত হয়েছে। এখন নিত্য নতুন নানা উৎসবের নাম জানি সেগুলো আমরা আগে কখনো শুনিনি, দেখিনি। উদাহারণ হিসেবে পনেরো বছর আগে আমরা কতজনে ভ্যালেন্টাইন ডে এর নাম শুনেছি? এটা বলা কঠিন যে নতুন উৎসব ভাল কি মন্দ।

এখানে নতুন উৎসবগুলোর বিচারের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, যেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো নিত্য নতুন উৎসব গজাচ্ছে। প্রশ্ন হলো কেন যুগের পর যুগ ধরে পালন করে আসা উৎসবগুলোর জায়গায় নতুন নতুন উৎসবগুলো জায়গা দখল করে নিচ্ছে? যে উৎসবগুলোতে বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা এক কাতারে সামিল হয়ে উৎসব পালন করতো এবং উপভোগ করতো। সমাজে নানা পরিবর্তন প্রতিকূলতার পাশাপাশি নিত্য নতুন শিল্পের মাঝেও বাংলার লোক শিল্প, সাহিত্য, গান (লালন) এর শৈল্পিক দিক এখনো টিকে আছে। যা এখনো এসব ঐতিহ্য/ সংস্কৃতি আগের মতই মানুষের হৃদয়ে বহমান। কিন্তু পুরোনো লোক শিল্পেকর্মের বদলে যদি নতুন কিছু শিল্পকর্মকে গ্রহণ করি তা হবে সেই বিমিশ্র ঐতিহ্যের জন্য হুমকি। তখন এটি আমরা প্রাকৃতিক ভাবে হুমকি না বলে একটি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে হুমকি তৈরী করছি বলে ধরে নিতে হয়। একই সাথে আমাদের বুঝতে হবে যে, কিছু বিমিশ্র ঐতিহ্য যুগের পর যুগ পালিত হতে হতে এক সময় স্বাভাবিকভাবে মৃত্য ঘটে। সুতরাং কেউ চাইলেই হারিয়ে ফেলা ঐতিহ্যকে ফিরে আনতে বা সংরক্ষণ করতে পারে না যদি না সেই চর্চা সমাজে বিদ্যমান না থাকে। যদি আমরা চেষ্টা করিও জনগণ সেই সংস্কৃতির সাথে নিজেদেরকে মেলাতে পারবে না। তাই আমাদের যে সকল বিমিশ্র ঐতিহ্য আছে এবং বিমিশ্র ঐতিহ্যের উপর যে সব হুমকিগুলো কাজ করছে তা আমাদেরকে প্রতিহত করতে হবে এবং পরাজিত করতে

হবে। সেই দায়িত্ব যদি পালন করতে চাই আমাদেরকে সকল ধরনের হুমকিগুলোর পাশাপাশি হুমকির জন্য দায়ী শক্তিসমূহকে জানতে হবে।

নোট ১: এই বিষয়ে আরো ভালোভাবে বোঝার ও জানার জন্য সহায়কের জন্য পাঠ উপকরণ ১-৮ (পৃষ্ঠা ৯১-১১৪) পড়া যেতে পারে।

নোট ২: ফিল্মসমূহ : Poison on the Platter, Story of Stuff ইত্যাদি দেখানো যেতে পারে।

পাঠ্য উপকরণ: ১: বাংলাদেশে বিশ্বায়নের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাতসমূহ:

মইনুল ইসলাম রচিত "পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ঢেউ বাংলাদেশের সমাজেও পরিবর্তনের সুবাতাস বয়ে এনেছে নিঃসন্দেহে। আবার, বৈদেশিক অভিবাসন যেহেতু বিশ্বায়ন পর্বে ক্রমশ বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তার অভিঘাতও এ দেশের গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন নির্বিশেষে সমাজকে আলোড়িত করে চলেছে। সরকারী তথ্যসূত্রগুলিতে যদিও বলা হয় যে, বাংলাদেশের ৪০ লাখ মানুষ প্রবাসে বসবাস করছেন ও কর্মরত রয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত অভিবাসীর সংখ্যা ঐ সংখ্যার দ্বিগুনেরও বেশী হবে বলে বহুল প্রচলিত ধারণা রয়েছে। বৈধ চ্যানেলসমূহের মাধ্যমে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ৩০৫ কোটি ডলার রেমিট্যান্স বাংলাদেশে প্রেরিত হয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলসমূহের মাধ্যমে (প্রধানত হুন্ডি চ্যানেল) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আরও বেশী মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ও পণ্য প্রবাহিত হচ্ছে বলে বিভিন্নর জরিপে প্রমান মিলছে।

পণ্য রপ্তানি আয়ের চাইতে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত আয় পরিমানগত দিক থেকে বেশী গুরুত্বের দাবিদার হলেও সমাজে এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকারের প্রভাব ও ফলাফল রয়েছে। গ্রমীন সমাজে উৎপাদন সম্পর্কসমূহে ও সামাজিক সম্পর্কসমূহে বড়সড় পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে এই অভিবাসীরা। কৃষি জমির মালিকানা ব্যবস্থায়, ভূমিসত্ব ব্যবস্থায়, ভূমিহীনতা বৃদ্ধিতে, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসারে, কৃষি-বহিভূত কর্মকান্ড ও পেশার বিস্তারে, গ্রামীণ সেবা ও বানিজ্য খাতের বিস্তারে অবদান রাখছে বৈদেশীক অভিবাসন। আবার গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, বসতবাটি উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনেও এর অবদান অনস্বীকার্য। গ্রামীণ জীবনে আধুনিকতার বাহকও হয়ে উঠেছে প্রবাসীরা।

রপ্তানিমূখী গার্মেন্স, নিটওয়্যার, চিংড়ি বা চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদনের দ্রুত প্রসারের ফলে নারী শ্রমীকদের ব্যাপক কর্মসংস্থান শিল্পায়নের মাধ্যমেও বড়সড় সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান আমলে গড়ে তোলা ঐতিহ্যবাহী আমদানী-বিকল্প পণ্যের শিল্পগুলোতে রুগ্ন অবস্থা এবং পাট খাতের মরন দশা অর্থনীতিতে বেকারত্ব বাড়াচ্ছে। বিরাষ্ট্রীকরণ ও প্রাইভেটাইজেশনের চলমান ধারা এবং বিশ্বায়নের পর্বে আভ্যন্তরিন উৎপাদন ক্ষেত্রগুলোতে ক্রমবর্ধমান সংকট সামাজিক সংঘাত এবং প্রত্যক্ষ ক্ষতির সম্মূখীন জনগণের দুর্গতি বৃদ্ধি করছে। বানিজ্যনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক প্রতিপত্তি বেড়েছে। চোরাচালান জেঁকে বসায় চোরাচালান-সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের অপারেটর ও মাঠকর্মীদের সামাজিক প্রতাপ বেড়েছে।

বিভিন্ন স্তরের বণিক চেম্বারগুলো রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। দেশের ব্যবসায়ী সমাজের সাথে উন্নত বিশ্বেও পুঁজিবাদী কেন্দ্রসমূহের প্রিন্সিপাল এজেন্ট সম্পর্ক বিশ্বায়ন পর্বে দৃঢ়তর হয়েছে। সফল ব্যবসায়ীদের সামাজিক মর্যাদা তুঙ্গে উঠেছে। সামাজিক মূল্যবোধের বিচারে বৈধ-অবৈধ যেন-তেন প্রকারে বিত্তবান হওয়ার প্রতিযোগিতায় জয়ীরাই সমাজিক নেতৃত্বে মর্যাদাবান বিবেচিত হচ্ছে। সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোতেও বনিক গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি বাড়ছে।

সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনে বিদ্যমান বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ধনীদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। দারিদ্রের নানা পরিমাপের ভিত্তিতে অনুপাত হিসেবে দারিদ্রের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমছে বলে দাবী করা হলেও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পায়নি। বরং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দারিদ্র সৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলোকেই উসকে দিচ্ছে।

দেশের নগরায়ন প্রক্রিয়ায়ও বিশ্বায়ন বিকৃতি ঘটিয়েছে। যাবতীয় উন্নয়ন প্রয়াসের রাজধানী-কেন্দ্রিকতা ঢাকা মহানগরীর বিস্ফোরণমূলক জনপ্রবৃদ্ধির পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। বানিজ্যনির্ভর পুঁজিপতি ও দুর্নীতির ফায়দাভোগী রাজনীতিক- সামরিক, আমলা-সিভিল, আমলা এবং অভিবাসী ধনাঢ্য পরিবারগুলোর ঢাকা কেন্দ্রিকতা নগরায়নের এহেন কেন্দ্রিকরণের জন্য বহুলাংশে দায়ী। রাজধানী ঢাকার ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি দেশের বাকী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম থেকে নগরে অভিবাসন প্রক্রিয়াও সারা দেশে বেগবান হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ বানিজ্য খাতের অতি সম্প্রসারণ এবং অভিবাসীদের শহুরে জীবনের আকর্ষণের কল্যাণে। টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক প্রসার বাংলাদেশের জনজীবনকে দ্রুত স্বস্তিকর করে তুলছে। টেলিভিশন, রেডিও, নানাবিধ ইলেক্ট্রনিক গেজেট্স সাধারণ জনগণকে আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দের স্বাদ পোঁছে দিচ্ছে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন দেশীয় ও বিশ্ব-সংস্কৃতির যোগাযোগ, আদান প্রদান এবং নানা সংস্কৃতির সম্পর্কে জ্ঞান ও চেতনা বৃদ্ধির সুযোগকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিপ্লব বিশ্বের সবার ঘরে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে আকাশ সংস্কৃতি, ইন্টারনেট, টেলিভিশন এবং উপগ্রহ সম্প্রচারের কল্যাণে। নানা জাতি সত্তা, নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, নানা জীবনাচরণ, নানা ভৌগলিক বৈচিত্র, নানা বিশ্বাস, সংস্কার- কুসংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ছে, চেতনা বাড়ছে, ভুল ধারণার অবসান ঘটছে। পাশ্চাত্য-প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক বিভেদ, নানা দেশের মানুষের জীবনযাত্রার প্রভেদ, ধর্মভিত্তিক এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন, জাতিগত ও বর্ণগত বিদ্বেষ, সংঘাত ও হানাহানি নিরসনের পরিবেশ ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে।

অন্যদিকে, বাজার সম্পর্কের দ্রুত সম্প্রসারণ অর্থ-বিত্ত ও ভোগবাদী জীবতের প্রতি আকর্ষণকে বৃদ্ধি করে পরিবার ও সামাজিক সংহতিকে বিপন্ন করে তুলছে। পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ক্রমশঃ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। সমাজে মাদকদ্রব্য, অস্ত্র ও পেশীশক্তির প্রকোপ বাড়ছে। নারী আরও বেশী করে বাজারের পণ্য হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদের মুনাফাচালিত যান্ত্রিকতা ও বৈশ্যিকরণ এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিপর্যস্ত করতে উদ্যত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পণ্য ও সেবা বানিজ্যের উদারীকরণ বিভিন্ন দেশের জনগণের ভোগ বৈচিত্রকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিবাহিত করে জীবনাচরণের পার্থক্য হ্রাস করছে। একে অপরের কাছ থেকে শেখার ও গ্রহণ করার সুযোগও বাড়ছে। অভিবাসনও এ ধরণের সাংস্কৃতিক সংহতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হয়ে উঠছে। ব্রিটেনে বাংলাদেশী রন্ধনপ্রণালীর জনপ্রিয়তা কিংবা পাশ্চাত্যে ভারতীয় সিনেমার দর্শকপ্রিয়তা এ ধরণের সাংস্কৃতিক লেনদেনেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এর অপর পিঠে আমাদের স্বীকার করতেই হবে, পাশ্চাত্যেও সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশকে আমাদেও জীবন থেকেও ঝেড়ে ফেলা অসম্ভব হয়ে পড়ছে দিন দিন। খাদ্যাভস বদলাচ্ছে, পোশাক-পরিচ্ছদ বদলাচ্ছে, সঙ্গীতের রুচি বদলাচ্ছে, আচার-অনুষ্ঠান বদলাচ্ছে, বিনোদন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের সুস্পষ্ট অভিঘাত অনুভূত হচ্ছে। সমাজে বিত্তবান এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ এখন গ্রামেও পরিসঞ্চালিত হয়ে গেছে। বিদেশ ভ্রমন, বিদেশে পড়াশোনা, বিদেশে চিকিৎসা, বিদেশে অভিবাসন আকাঙ্খা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

পাঠ্য উপকরণঃ ২ : চাকরীর বুনিয়াদ ভঙ্গ

বেকারত্ব শুরু হয়েছে সেই সব শিল্পগুলিতে, যেখানে সবচেয়ে বেশী চাকুরীর সম্ভাবনা ছিল, সেইগুলো শেষ হয়ে যাবার পর, যেমন, তাত শিল্প, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এবং বনজ শিল্প - যেগুলি বন জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল। যদিও শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের কারণে চাকুরীর সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে, যেখানে কম মূলধন প্রয়োজন। যে আইন এই মত পোষণ করে সেটা সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উৎপাদন নীতির অধীনে সেখানে মাত্র কুড়িটা বিষয় বাকী আছে। ১৯৭৭ সালের জনতা সরকার ৮০৭ টি বিষয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে তার নীতি অনুসারে, যাতে এগুলি বড় বড় শিল্প উৎপাদন করতে না পারে।

এই নীতি বিশ্ব ব্যাংকের শর্তে বাধা প্রদান করেছে, যার জন্য যে সকল বিষয় এই তালিকাভুক্ত সেগুলি ১৯৯১ সালের পর কমে এসেছ। এটা একটা পূর্বশর্ত ছিল যে, এখানে উৎপাদনের পরিমানের ওপরে একটা বাধা থাকবে বিদেশী অর্থদানের ক্ষেত্রে এবং জমা খরচের স্থিতির 'সংস্কারের' ওপর। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা কর্তৃক আরোপিত শর্ত অনুযায়ী ৬৪৩ টি দ্রব্য সংরক্ষিত তালিকা হ'তে ২০০০ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এ বছরে যে সমস্ত দ্রব্য তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে সে দ্রব্যগুলির দিকে চেয়ে দেখুন, যার জন্য এগুলি অস্তিত্ববিহীন হয়ে গেছে। এর মধ্যে আছে আচার, বনরুটি, সরিষার তেল, কাঠের আসবাবপত্র, নোট বই, খাতা, রেজিষ্টার খাতা, মোমবাতি, আগরবাতি, বাজি, ষ্টেইনলেস স্টীলের বাসনপত্র, গৃহকার্যে ব্যবহারযোগ্য এ্যালুমিনিয়ামের বাসন, চুড়ি, লোহাড় আলমারী, লোহার চেয়ার টেবিল, সবরকমের লোহার আসবাবপত্র, গড়ানো খড়খড়ি, ডাল, কাপড়, ধোয়ার সাবান এবং ম্যাচকাঠি। এইসব ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে বড় বড় মূলধন গিলে ফেলেছে, আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনগুলি দেশীয় ও বিদেশী খেলোয়াড়রা মানুষের তৈরী ছাড়া মেশিনে তৈরী জিনিষগুলিকে প্রাধান্য দেয়, এই কারণেও এটা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে প্রস্তুত জিনিষগুলি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের ক্রয়নীতিকে অকেজো করে দেবার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শর্তগুলির দিকে লক্ষ্য করুন। বড় বড় শিল্পপতিদের পক্ষে পরিবর্তিত আইনগুলির কথা চিন্তা করুন। তাদের প্রিয় শিল্পপতিদের সমর্থন করার বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায় আম্বারী গ্রুপকে কংগ্রেস সমর্থন করেছিল, যার ফলে বিদেশ থেকে কাচামাল এনে কৃত্রিম কাপড় তৈরী হয়েছিল। এর মাধ্যমে চেষ্টা চালানো হয়েছিল যেন দেশীয় তাতে বোনা বিভিন্ন ধরণের সূতার তৈরী কাপড় সংরক্ষণ করা নীতিকে অকেজো করে দেয়া যায়। এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে সূতীর কাপড়, যা দেশজ সেগুলি বড় বড় শিল্পপতিদের করা কৃত্রিমভাবে তৈরী কাপড়ের চেয়ে সস্তা। এর ফলে যে সমস্ত লোক দেশজ তাঁতে কাজ করত তারা বেকার হয়ে গেল। প্রথমদিকে যন্ত্রচালিত তাঁতে সাদা কাপড় তৈরীর অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং হস্তচালিত তাঁতে বিভিন্ন নকশাচালিত কাপড় তৈরী করতে পারত।

এই আইন ১৯৮৫ সালে পাশ হয়েছিল। সেই সময় ২২ ধরণের কাপড় সংরক্ষণ করা হ'তো হস্তচালিত তাঁতের জন্য। যন্ত্রচালিত তাঁত তখন কিছু আইনত বাধা সৃষ্টি করল এবং যখন এই আইন কার্যকর হ'ল তখন এই সংরক্ষিত তালিকায় সংরক্ষিত ২২ ধরণের কাপড় ১১ ধরণের কাপড়ে নেমে এল। খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষায় এটা প্রকাশিত হয়েছে যে প্রায় ৭০% কাপড়, যেগুলি হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত বলে চলছে, তা আসলে যন্ত্রচালিত তাঁতে প্রস্তুত হচ্ছে।

প্রায় ৩০ লক্ষ লোক তথ্য ও প্রযুক্তিখাতে চাকুরী করছে কিন্তু ২০০ লক্ষ লোক হস্তচালিত তাঁতের সঙ্গে যুক্ত আছে। ফ্র্যাংকেট. ডি বেরার্ড ল্যাভেল একজন ফরাসী পর্যটক এই তথ্য দিয়েছেন যে, দক্ষিণ আফিকা থেকে চীন পর্যন্ত অঞ্চলের লোকদের গায়ে ভারতীয় তাঁতের কাপড় দেখা যায়। পূর্বভারতের একটা বন্দর থেকে পাঁচ মিলিয়ন টন ডাচ কাপর রপ্তানী হয়।

২০০০ সালে গুজরাটের গণহত্যার পর এটা কনফেডারেশ অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাষ্ট্রিজের রাহুল বাজাজ, আজিম প্রেমজী এবং গোদরেজের মত শিল্পপতিদের দ্বারা সমালোচিত হয়। এর বিরুদ্ধে আরও কিছু শিল্পপতি মিলে 'রিসারজেন্ট' গুজরাটে যেটা গুজরাটের মূখ্যমন্ত্রী মিঃ নরেন্দ্র মোদি কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল এই রকম একটা দল তৈরী করলেন। এই 'রিসারজেন্ট' গুজরাট আদানী গ্রুপের গৌতম আদানী এবং টরেন্ট কোম্পানী অব ম্যানুফ্যাকচারস অব মেডিসিন কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই শর্তের অপব্যবহার করে মেহেতা কোম্পানী মূল্যমান পরিচালনা করা থেকে পাঁচ বছরের অব্যহতি পেয়েছিল।

বিশ্বের বেশীরভাগ ব্যাংকই গৌতম আদানীকে অষ্ট্রেলিয়ার কয়লাখনির জন্য ঋণ দিতে অস্বীকার করেছিল। ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া তখন সেই উদ্দেশ্যে ৬০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল। এটাই ছিল কোন বিদেশী প্রকল্পের জন্য সর্ববৃহৎ ঋণ। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর আদানী গ্রুপ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ যার পরিমান টা ৫৫,৩৬৪.৯৪ কোটি টাকা এবং স্বল্প মেয়াদী ঋণ ১৭,২৬৭.৪৩ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে পেয়েছিল, যেটা পরবর্তীতে ৭৫,৬৫৯ কোটি টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।

আদানী গ্রুপকে একটা জমি দেয়া হয়েছিল প্রতিবর্গমিটার এক রুপি থেকে ১৬ রুপি হারে কচ্ছ দ্বীপের মূদ্রায়। এটা বন্দর তৈরী করার জন্য দেয়া হয়েছিল, যেটা ছিল বাজার দর থেকে একটু বেশিই কম দরে। কন্ট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে ২৫,০০০ কোটি টাকা নিয়ম বহির্ভুত ছিল। এর মধ্যে অবাঞ্চিত লাভ ছিল ১,৫০০ কোটি। আদানী গ্রুপ গুজরাট পাইপলাইন গ্যাস এবং সি.এন.জি লাইন পরিচালনা করছে।

রাজ্য সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন যে, ৩৪৩,০০০ হেক্টর বনভূমি ২০০৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে নানারকম প্রকল্পের জন্য খালি করে দেয়া হয়েছে। এর সাথে একটা সম্পূরক প্রশ্ন ছিল যে, এই 'বনভূমির ওপর কতগুলি পরিবার নির্ভরশীল ছিল'।

বর্তমান সরকার (এই প্রবন্ধ ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে) সম্প্রদায় ভিত্তিক উৎপাদনে বিশ্বাসী নয়, এটা ব্যাপক উৎপাদনে' বিশ্বাসী। 'মাস' ইংরেজী এই শব্দটির একমাত্র অর্থ 'দলবদ্ধ লোকেরা' এবং যখন উৎপাদনের কথা আসে তখন তাকে বলা হয় 'ব্যাপক উৎপাদন'। এই নীতিটি গান্ধীর দর্শনের এক বিপরীতধর্মী গবেষণামূলক প্রবন্ধ যেখানে বলে, দলবদ্ধ লোক মিলে যে উৎপাদন হয়, এটা 'মাস প্রডাকশন' নয়। বর্তমান গ্লোবালাইজেশনের যুগে (হয়তো ইউপিএ বা রাজাত) তারা হয়তো এই বিষয়ে একই নীতি অনুসরণ করে।

দলের বাঁধা বুলি 'ভারতে তৈরী' কথাটি এসেছে এই কারণে যে এটা বিদেশী কোম্পানীগুলিকে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায় যেন তারা এসে এখানে উৎপাদন করে, যার জন্য এটা প্রয়োজন যে পরিকল্পিত উপায়ে যাতে দলবদ্ধ লোকদের দ্বারা ব্যাপক উৎপাদনে সমাপ্তি আনা যায়। শ্রম আইনে এইসব সরকার দ্বারা যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা অমানবিক এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যাতে শ্রমিকদের শোষণ করে উৎপাদন বাড়ানো। এটা মনে হয় যে এই প্রস্তাবিত 'সংস্কার' এর মাধ্যম ভারতীয় শ্রমিকদের মত একইরকম হয়।

অগ্রগতির অনুপাত অনুসারে চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে গেলে শ্রমিকদের পরিবেশ চীনের শ্রমিকদের মত হতে হবে। চীনে এই বন্দোবস্ত আছে যে চাইনিজ শ্রমিকদের একসংগে ক্রমাগত ৩ থেকে ৪ দিন পর্যন্ত কাজে লাগাতে হবে।

এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের ফ্যাক্টরীতে যে সময়ের জন্য কাজের শর্ত হয়েছে সেই সময় পর্যন্ত থাকতে হবে এবং তাদের খাওয়ার সময় এবং নিত্য নৈমিত্তিম কাজের জন্য সময় দিতে হবে। এই শর্ত অনুযায়ী কাজ করার জন্য শ্রমিকদের মুত্যুহার যথেষ্ট বেড়ে গেল। আমেরিকা চীনে তার বড় ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করল, সেই শ্রমিক শোষনের কথা কিন্তু তাদের মনে ছিল। ফেক্সিকল কোম্পানীর ১৪ জন কর্মচারী যারা 'চায়না এ্যাপল কোম্পানী' যেটা আমেরিকার এ্যাপল একটা শাখা, যারা কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোন তৈরী করছিল, তারা আত্মহত্যা করল। কারণ তারা ২০১০ সালের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিল না। বি বি সি কয়েকজন রিপোর্টারকে এই কোম্পানী এবং যারা তাদের সেই সব শ্রমিক সবররাহ করেছিল সেখানে পাঠাল। তার ফলে প্রকাশ পেল যে কর্মীদের অবিরত ১৮ দিন ধরে ১৬ ঘন্টা অবিরত কাজে আটকে রাখা তরুন তরুনীরা যারা মাত্র ১৩/১৪ বছর বয়সী এবং তাদের ওভারটাইম কাজ করেত হয়েছি বলেই এই ঘটনা ঘটেছি।

শ্রমনীতির প্রস্তাবিত সংস্কারে এই নিশ্চয়তা দিল যে বড় কোম্পানীগুলো চাইনিজ কর্মীদের নিয়মনীতি এবং আইন প্রয়োগ করেছে। সরকার এই শ্রমনীতির সংস্কার আনার যে প্রস্তাব করেছিল যেটা বিগত ৬ দশক ধরে শ্রমিকদের সমর্থন করেছে। আমরা যদি ১৯৪৮ সালের শিল্প আইনে যে পরিবর্তনের 'প্রস্তাবগুলির' দিকে তাকাই তাহলে দেখব সেখানে বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য দিনে ৯ ঘন্টা কাজ করা, যার মধ্যে ৫ ঘন্টা পর আধ ঘন্টা বিশ্রামের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

এইসব তথ্য মনে রেখে ১৯৪৮ সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী ওভারটাইমে সীমাবদ্ধ সময় দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেখানে নীতিগুলিতে স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে কোন মৌলিক যুক্তিই দেখানো হয়নি। সম্প্রতি ৩ মাসের মধ্যে ৫০ ঘন্টা ওভারটাইম দেয়া হয়েছে কিন্তু সরকার এটা ১০০ ঘন্টা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে বেশীরভাগ কাজ কম শ্রমিক দ্বারা করা হবে।

এখন পর্যন্ত নারী ও শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হবে না, কিন্তু সংশোধিত শ্রম আইনে এটা প্রস্তাব করা হয়েছে যে অন্তঃসত্তা নারীরা এবং পঙ্গু লোকেরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হবে না। এটা এই তথ্য প্রকাশ করে যে সরকার অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং নারীদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে মেক এন ইন্ডিয়া'কে অন্ধভাবে অনুকরণ দ্বারা পুনস্থাপিত করা হয়েছে। বহুজাতিক কর্পোরেশনের ভিত্তি স্থাপন করার দিকে বেশী মনোযোগ দেবার জন্য হস্তনির্মিত তাঁতশিল্প, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের এবং শ্রকিদের কবর খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে।

- আফলাতুন।

পাঠ্য উপকরণঃ ৩ : কোথা থেকে জুতা আনা হয়?

আপনি হয়তো বলতে পারেন, এটা কি একটা প্রশ্ন হল? জুতো দোকান থেকে আনা হয়। কিন্তু এই প্রশ্নটা এভাবে করা হয়েছে যে, জুতো কোথা থেকে দোকানে নিয়ে আসা হয়?

যাইহোক প্রশ্নটা আমেরিকাতে অবস্থিত 'নর্থ ওয়েষ্ট ওয়াচ' এর খুব পছন্দ হয়েছে। সেই জন্য এটা জানা খুব প্রয়োজন যে সাধারন লোক যে জুতা পরে সেগুলো কোথা থেকে আসে? এই প্রশ্নটি এই প্রতিষ্ঠান সারা পৃথিবীর চারিদিকে জোর ছড়িয়ে দিয়েছে। কিভাবে----

আসুন আমার জুতোর যাত্রা শুরু করি।

একজোড়া জুতার দৃষ্টান্ত দিই, যাতে আমেরিকার একটা বিখ্যাত কোম্পানীর ছাপ মারা আছে। কিন্তু এই জুতো জোড়া এই কোম্পানী তৈরী করে নি। এই কোম্পানী একটি অজানা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করেছে। গবেষকদের এই অজানা কোম্পানী খোঁজার জন্য বেশ কিছু সময় ব্যয় হল। এটা অত্যন্ত কষ্টের কাজ কারণ এটা ছিল অনেক দূরে- তারা এর জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছাল। এই ক্লান্তিকর যাত্রা সত্ত্বেও তারা খুশী হল এই ভেবে যে, এই একজোড়া জুতোর গল্প শেষ। কিন্তু তার কুফল এইটাই গল্পের শেষ নয়।

এটাই গল্পের শুরু ছিল। এমনকি দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানী এই জুতো তৈরী করে নি। এরা ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থিত একটা অজানা কোম্পানীকে অর্ডার দিয়েছিল। এই কাম্পানী শহরের একটা শিল্প অঞ্চলে অবস্থিত। এই জায়গার নাম- ড্যানজেয়্যাঙ।

সবচেয়ে মজার ব্যাপর হল জুতোর সম্পূর্ণ কাজ এখানে হয়নি। আরও মজার ব্যাপার হলো যে, জুতোর এই উঁচু নকশা তাইওয়ানের একটা অজানা কোম্পানী কম্পিউটারে তৈরী করেছে।

এই নকসার তিনটি অংশ আছে। এর প্রথম অংশ হচ্ছে - উঁচু দিকটা, যা পায়ের পাতা ঢাকে। দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে - জুতোর ভেতরের অংশ। তৃতীয় অংশটি হল - জুতোর তলা যেটা আমার হাঁটার সময় মাটি ছুঁয়ে থাকে। এখন এগুলোই কিন্তু জুতোর সাধারণ অংগ নয়। অতঃপর প্রধান অংগগুলো ২০ টি অংশে বিভক্ত।

এই জুতোর প্রধান উপাদান হল- চামড়া। এটা গরুর চামড়া। এই গরুগুলোকে আমেরিকার টেক্সাসে শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই আনা হয়। এই গরুগুলোকে মারা হয় কসাইখানায়, যেখানে আধুনিক প্রযুক্ত বিদ্যায় তৈরী মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই চামড়া গরুর দেহ থেকে অত্যন্ত সূক্ষরূপে ছাড়ানো হয়। এই চামড়ার কোমলতা বজায় রাখার জন্য নানা রকম কেমিক্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিক্রয়াজাত করা হয়। তারপর এটা লবন জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে সেই চামড়ার টুকরাটা ৭৫০ টি ওষুধের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা হয়।

অতঃপর এই ধরণের চামড়া মালবাহী ট্রেনে করে আমেরিকার লস এঞ্জেলেসএ পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়াজাত চামড়ার যাত্রা শুরু হয় সমুদ্র পথে। এই বান্ডিলগুলি দক্ষিণ কোরিয়ার 'পুশানে' নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে আরও ভালভাবে এটা পরিস্কার করা হয়।

আমেরিকাতে পরিবেশ সংক্রান্ত অত্যন্ত কঠিন আইন আছে। কোন দূষিত জল পরিস্কার না করে নদীতে ফেলে দেওয়া যাবে না। তারা সর্বদাই পরিস্কার জল ও বাতাস রাখার জন্য নির্ধারিত কঠোর বিধি পালন করে। যদি কখনও এতে কোন ভুল হয়, তার জন্য তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হয়। এই কাজের জন্য তারা বেশী বেতন পেয়ে থাকে। এছাড়াও তারা যেহেতু চামড়া সংক্রান্ত কাজ কওে, সেইজন্য তাদের নীচু চোখে দেখা হয়। আমেরিকানরা এই বিপদ থেকে পালাবার জন্য ময়লা এশিয়া মহাদেশের যে কোন দেশে ফেলে দেয়। এইসব কাজও প্লেনে করে নিয়ে যাওয়ার কাজ ব্যয়সাপেক্ষ, তাই এটা আমেরিকায় করলে এটাতে খরচ কম হয়। এছাড়াও আমেরিকানরা এভাবে জুতো থেকে আরও বেশী লাভ পেতে পারবে।

জুতোয় রং করা এবং পালিশ করা সুন্দরভাবে শেষ করার কাজ সব পুসানের ফ্যাক্টরীতে করা হয়। এই কারণে চমড়ার প্রতিটি টুকরো ২০ রকমের রাসায়নিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে পার করাতে হয়। এই সময় চামড়ার ময়লা, ধূলা, খারাপ গন্ধ, উপরের স্তর সব দূর করে দেয়া

হয় এবং এইসব ধ্বংসশীল জিনিষগুলি নারকটং নদীতে ফেলা হয়। এই হাল্কা, অত্যন্ত মূল্যবান এবং বিশুদ্ধ চামড়া আকাশপথে জাকার্তায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এখন চামড়ার কথা ছেড়ে দিয়ে আসুন আমার জুতোর নীচের অংশের কথা বলি। যে ফোম যা জুতোর নীচের দিকে দেয়া হয়-সেই হাল্কা এবং টেকসই ফোম আমাদের পা কে গরম এবং ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে। এই ফোম সৌদী আরব থেকে তৈরী হয়। এখন আসি জুতোর তলার কথায়। এটা স্টারিন নিউট্রিন রাবার থেকে এবং কিছু অংশ সৌদি আরবের পেট্রোল থেকে এবং শেষে বেন্‌জিন কোটালার খনি থেকে নিঃসৃত নেজিন থেকে তৈরী হয়। যে ফ্যাক্টরী থেকে বেন্‌জিন নিঃসৃত হয় তা তাইওয়ানে উৎপন্ন আনবিক শক্তির বিদ্যুতের সাহায্যে।

নীচের বাইরের দিকের পাশটাও তৈরী করা হয়। এখন যেটা বাকী থাকল তা হল এক জোড়া জুতো সমান আকারে কিছু বিভিন্ন মাপে কাটা, যেটা ছাঁচের মাধ্যমে করা হয়। এইগুলি উচ্চচাপ বিশিষ্ট এবং উত্তপ্ত ছাচের নীচে রাখা হয়, যেন জুতোগুলো আকাঙ্খিত আকার পায়। এর পরে এই অংশগুলো জুতোর বাকী অংশের সঙ্গে সাঁটিয়ে দেয়া হয়।

ছোট করে বললে বলা যায়, ইতোমধ্যেই আমরা জানতে পারলাম যে, সমস্ত বিখ্যাত কোম্পানীর জুতোগুলো এই স্থানগুলিতে হয়। এই জুতোগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু নামের ছাপের মধ্যে- ব্র্যান্ডের নামের মধ্যে। এই জুতোগুলোতেই বড় বড় কোম্পানীর নামের ছাপ থাকে।

জুতোর এই যে দীর্ঘযাত্রায়- প্রানীগুলোকে নিষ্ঠুরের মত মারা হয়, পরিবেশ দূষণ হয়, জুতা তৈরী করে যে শ্রমিকেরা তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং তাদেও দুর্মূল্য জীবনীশক্তি গিলে খায়। এই যাত্রা বানানো শেষ হবার পরও শেষ হয় না।

জুতোগুলোকে পাতলা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয় সেটা নিরক্ষীয় অঞ্চলে সুমাত্রা দ্বীপের জংগলে উৎপন্ন একরকম গাছ থেকে তৈরী হয়। পূর্বে যে বাক্সতে জুতো পাঠানো হত, তা কার্ড বোর্ড থেকে তৈরী হত। এখন জুতো প্রস্তুতকারক অনেক কোম্পানী পরিবেশ রক্ষা করার চিন্তা করছে। এই বাক্সগুলো পুরানো রিসাইকেলড কাগজ দিয়ে তৈরী করা হয়।

জুতোর এই সামান্য যাত্রার সময় লাগে ৩ সপ্তাহ। কেউ এই প্রশ্ন যেন না করে যে পদচারীরা, যে জুতো এই দীর্ঘ যাত্রা শেষ করে আসে তা কতদিন ব্যবহার করে।

জুতোর এই যাত্রা শুধু কোন বিশেষ দেশের জন্য নয়। জুতো তৈরীর কারখানা সারা পৃথিবী জুড়ে, যেমন কানাডা, ইংল্যান্ড, অষ্টেলিয়া সব জায়গাতেই অমেরিকার জুতোর এই যে গল্প, সেই একই ঘটনার সৃষ্টি হয়।

আমার যদি এই ব্যাপারে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হই আমরাও সেই একই ফলের সম্মুখীন হব। আমাদের জুতোর সেই মূল্য দিতে বাধ্য থাকব।

-অনুপম মিশ্র

পাঠ্য উপকরণঃ ৪ : রাবণ রামায়ণ আবৃতি করেন

সনাতন ধর্মের চেয়ে পুরাতন এক ধর্ম আছে। এটাকে বলা হয় নদীর ধর্ম। গঙ্গানদীর রক্ষাকর্তাদের প্রথমেই এই ধর্মগ্রহন করতে হয়।

চিন্তা করুন প্রাকৃতিক ক্যালেন্ডার এবং ক্যালেন্ডার, যা আমাদের অফিস এবং বাড়ীতে টাঙ্গানো থাকে। এগুলো সম্পূর্নভাবে ভিন্ন ব্যাপার। ক্যালেন্ডারের পাতা একবছরে বারো বার উল্টানো হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক ক্যালেন্ডারের পাতা বছরে হাজার বার বা লক্ষবার উল্টানো হয়। আমারা এখানে একত্রিত হয়েছি গঙ্গা নদীর বিষয়ে আলোচনা করতে, তাই আমরা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক ক্যালেন্ডারের কথা এবং ভৌগলিক ক্যালেন্ডারের কথা যেন ভুলে না যাই।

যেহেতু আমি আপনাদের লক্ষ বছরের ক্যালেন্ডারের কথা স্মরণ করতে বলছি, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের বর্তমান কর্তব্য ভুলে যাব। এটা নিশ্চয়ই সর্বদা মনে রাখতে হবে। গঙ্গা নদীর জল দূষণ হয়েছে। এখন সেই জল পরিস্কার করার প্রয়োজন হয়েছে। অতীতে অনেকবার পরিস্কার করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। কিন্তু হাজার বা লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু তার ফল হয় নি কিছুই। তাই আমাদের শুধুমাত্র আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে কোন পরিকল্পনা নেয়া উচিত নয়। যার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হলেও তাতে কোন ফল হয় নি।

ছেলেমেয়েরা হয়তো বা জেদী হয়। আবার দুষ্ট ছেলেমেয়েরাও আছে। কিন্তু আমাদের দেশে বলা হয় যে কুমাতা হয় না। একটু চিন্তা করুন যে সন্তানেরা যারা গঙ্গা পরিস্কার করতে চেয়েছিল, তাহলে গঙ্গানদী পরিস্কার হল না কেন? আমাদের মা কি এত জেদী? সাধুদের দল, সামাজিক সংস্থাগুলি, বিজ্ঞানীর দল, বিশ্ব ব্যাংকের পুঁজিবাদীরা, গঙ্গা শুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু মা গঙ্গা বিশুদ্ধ পরিস্কার হতে প্রস্তুত নন। হয়তো আমাদের এই বাঁধা বুঝতে হবে।

এটা ভাল কি মন্দ জানি না। প্রত্যেক যুগই নিজেদের চিন্তা বা পতাকা তুলে রাখতে চায়। এর রংএ এত যাদু যে, তা অন্যান্য সব পতাকার রংকে ছায়ায় ডেকে ফেলতে চায়। সে এই পতাকা তিন রংয়েরই হোক বা ২ রংয়েরই হোক। লাল বা গাঢ় পীত বর্ণেরই হোক, সব পতাকাই তাকে স্বাগতম জানায় এবং তার সুরে নাচতে থাকে। এমনকি বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী লোকেরাও সেটাকে গ্রহন করে নেয়। লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে সবটুকু সমর্থন করে, কেউ কেউ কিছু না বুঝে অন্ধভাবে তা সমর্থন করে। এখন এই যুগ যা গত ৬০ বছর বা ৭০ বছরের মধ্যেকার সময়কে উন্নয়নের যুগ বলে মনে করে। সকলেই এই দেশকে পশ্চাদপদ বলে মনে করে এবং উন্নয়ের অঙ্গীকার করে। 'উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ' এক কথাটিকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

আসুন আমরা আবার গঙ্গার ব্যাপারে ফিরে আসি। পুরাতন ধর্মগ্রন্থ এবং ভৌগলিক তত্ত্ব এই কথা প্রকাশ করে যে, গঙ্গানদী মানুষের দ্বারা তৈরী হয়নি। এ বিষয়ে নানা ধরণের কাকতালীয় ব্যাপার আছে এবং গঙ্গা সমভূমিতে প্রবেশ করল কিন্তু এটা জন্মগ্রহন করে নি। ভৌলিক এবং ভূতাত্বিক বিষয় এই তত্ত্ব প্রকাশ করে যে, এর আবির্ভাব হিমালয়ের জন্মের সঙ্গে যুক্ত- একটা প্রাকৃতিক গ্রাহ্য বস্তু যা ২৩০ মিলিয়ন বছর আগে ঘটেছিল। এর সঙ্গে আসুন আমরা দেয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেন্ডরের কথা চিন্তা করি। এটা মাত্র ২০১৩ বছরের তৈরী।

আসুন, আমরা এই লম্বা সময়ের বিষয় ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র এটুকু চিন্তা করি এটাকে পরিপূর্ণ করতে, প্রকৃতি এটাকে বৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলবে না। আমাদের মাত্র ৪ মাস ব্যাপী বর্ষাকাল। এই ঋতু আমাদের হেমন্ত ঋতু এবং এই জল বরফে পরিনত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত। যাতে এই জল অস্পৃষ্ট থাকে। আজকের সভার নাম দেয়া হয়েছে উচ্চ পর্যায়ের গঙ্গার অধিবেশন। আমি এই তত্ত্বের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, প্রকৃতি গঙ্গোত্রী এবং গোমূখ নামে স্থান দু'টি এত উচ্চতায় সৃষ্টি করেছে বা এত ঠান্ডা যে এখানে বরফ গলে না এবং সারাবছর ধরে যেখানে বরফ থাকে। বর্ষার শেষে বরফ গলা জল গঙ্গার স্রোত অব্যাহত রাখে।

আমাদের সমাজ গঙ্গাকে 'মা' হিসাবে গন্য করে এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ভোজপুরীতে শ্লোক, সঙ্গীত এবং লোকগীতির মধ্যে ধরে রেখেছে। সমাজ তার ধর্মের সাহায্যে এটাকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। এটা মনে রাখা দরকার যে সনাতন ধর্মের পূর্বেও একটা

প্রাচীন ধর্ম ছিল। যেটা নদীর ধর্ম বলে প্রচলিত ছিল। নদীর উৎস থেকে একটা পথ ধরে সমুদ্রে পড়ার মধ্যে যে একটা উপত্যকা এবং প্রবাহ থাকে তার মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে।

কিন্তু কেউই জানে না কেন উন্নয়নের ধর্ম নামে একটা নূতন পতাকা ওড়ানো হয়েছে। এই আলোচনা হয়তো মন্দ মনে হতে পারে কিন্তু কাউকে বলতেই হবে যে এই পতাকার তলে লোকেরা বাঁধ নির্মান শুরু করেছে। এক উপত্যকা থেকে আর এক উপত্যকায় জল নিয়ে যাবার ব্যাপারে, নদীর ধর্ম ভাঙা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এটা বড় বড় পরিকল্পনার মাধমে গ্রহন করেছে। ভাগীরথী, গোমতী, গঙ্গা নদী যেগুলি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, যখন এই পতাকাতলে সমবেত হয়েছে, সেগুলি কোন বিশেষ রাজ্যের মাতা হবার পরিবর্তে জীবন রক্ষার জন্য ব্যবহৃত দড়ির মত ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে তৈরী বাঁধগুলো মনোযোগ আকর্ষনকারী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে যেখানে যে কোন প্রকৃত অর্থপূর্ণ আলোচনা শেষ হতে পারে। বাঁধ নির্মান এবং জল বিভাগ সমস্যা যদি দুই রাজ্যের এক সরকারও থাকে তবুও বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সব ধনী লোক এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা এই বাঁধের সঙ্গে যুক্ত আছে। সকলেই চিন্তা করতে শুরু করেছে যে নদীগুলো একত্রিত হবার প্রয়োজন আছে কিনা। এরা আসল কথাটাই ভুলে গেছে যে প্রকৃতি এই নদীগুলিকে সেই সময়কার চাহিদা অনুযায়ী যোগ করে দেয়। এই জন্য হাজার বছর ধরে প্রার্থনার ফলে গঙ্গা ও যমুনা নদীর একত্র বহিবার কারণ খুঁজে পেয়েছি। শুধুমাত্র তখনই ধনী সমাজ গঙ্গার এই সংগম স্থলগুলোতে তীর্থস্থান বলে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এই পথেই প্রকৃতি এই নদীকে কয়েকভাগে ভাগ করেছে। কোনও নদী না ভেঙ্গে অন্য নদীর সঙ্গে বা সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না।

আমরা উন্নয়নর নামে কৃষি ক্ষেত্রে জল সেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প কারখানা পরিচালনার জন্য নদী থেকে পরিস্কার জল নেওয়া শুরু করেছি। জলের অবশিষ্টাংশ দ্রুত উন্নতশীল শহরগুলিতে জল সরবরাহের জন্য ব্যবহার করছি। যখন আমরা তা করছি আমরা ভুলে যেতে পারি যে এই শহরগুলির মধ্যে বড় বড় নালা আছে। এই নালাগুলো বর্ষার জল ধরে রাখে এবং বন্যা প্রতিরোধ করে থাকে এবং জলের লেভেল উঁচুতে রাখে। এই জল পরবর্তী ৮ মাস মানুষের পিপাসা ও জলের প্রয়োজন মিটায়। এখন এই সমস্ত স্থানের জমি পাথুরে। গৃহ নির্মানকারীরা, নেতারাও উচ্চপদস্থ অফিসাররা এইসব খালের অস্তিত্ব টিকিয়ে না রাখতে যৌথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ এবং পুনা ও মুম্বাইতে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল অতিরিক্ত বর্ষণের কারণে। ইন্দ্রের সমার্থক পুরান্দ্রা যার অর্থ হচ্ছে ছোট ছোট শহরগুলিকে ধ্বংস করা এবং দুর্গগুলিকে ভাঙার বিশেষজ্ঞ স্বরূপ। আমার যদি আমাদের বন্ধু ইন্দ্রকে বন্ধ করতে বাধ্য না করি তাহলে বন্যা হবেই। এই জল যদি বয়ে চলে যায়, তাহলে আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হব।

আসুন আবার গঙ্গা আলোচনায় ফিরে যাই। উত্তরাখন্ড বা গঙ্গায় বন্যা সম্বন্ধে টিভির খবরের কথা স্মরণ করুন। আমরা মন্দির এবং হোটেল নির্মান করি নদীর ধর্মের কথা মনে না রেখেই। এই বন্যা তার স্রোতের সঙ্গে এই লিখিত আইন অনুসরণ করে।

আমরা নদীর থেকে জল নিয়ে উন্নয়নের নামে ব্যবহার করি, খালগুলি ধ্বংস করি, জমির দাম অনুসারে শহরের ও কৃষির আবর্জনা নদীতে ফেলি এবং তারপরে একটা পরিকল্পনা করার চিন্তা করি যে কি করে নদী পরিস্কার করব। নদী ততদিনে নালার আবর্জনা দিয়ে ভরাট হয়ে গেছে এবং এই আবর্জনা পরিস্কারের কোন রাস্তা নেই। আপনি ভারুচে যান এবং সেখানে দেখুন। সেখানে নর্দমা নদী কিভাবে উন্নয়নের নামে রাসায়নিক পদার্থে পূর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। নদীগুলি এইভাবে পরিস্কার হবে না। সব সময় আমরা বিরক্ত হই।

আমাদের কি কোন আশা নেই? শুধু একটি আশা আছে, আমাদের উপযুক্তভাবে নদীর ধর্মকে বুঝতে হবে। আমাদের মনে কোনও বিদ্বেষ না রেখে আমাদের উন্নয়নের আকাঙ্খা পরীক্ষা করতে হবে। কেউই চুপিসারে গঙ্গা বা হিমালয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে না। এরা আমাদেরই লোক। উন্নয়ের সমস্যা, জি ডি পি, নদী একীকরণ, বড় বড় বাঁধ নির্মান ইত্যাদির কথা আছে- এটা এই দল করবে বা ঐ দল করবে। উন্নয়নের পতাকাতলে, শাসনকারী দল বিপক্ষদলের মধ্যে পার্থক্য থাকবে কিন্তু সেগুলিকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। মারাঠী ভাষায় একটা সুন্দর কথা আছে: 'রাবণ তণ্ডী রামায়ন' যার অর্থ রাবন নিজে রামায়নের গল্প বলছেন। আসুন সেইরকম রাবন হই।

- অনুপম মিশ্র

পাঠ্য উপকরণঃ ৫ (এ)ঃ জল একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

আমি একবার দিল্লীতে একটা স্কুলের কিছু শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'জল কোথা থেকে আসে?' তারা উত্তর দিয়েছিল 'ট্যাপ থেকে' 'কোথা থেকে ট্যাপে জল আসে?' তারা বলল, 'টিউবয়েল থেকে।' কেউ কেউ এটা হ্যান্ড পাম্প থেকে,' কিছু শিক্ষার্থী নদীর কথাও বলল। এটা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের ব্যাপার নয়। আমি এই একই প্রশ্ন কিছু কিছু যুবক এবং সাধারণ লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা সকলেই সেই একইভাবে উত্তর দিল। কিন্তু কিছু অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত নারী যারা মধ্য হিমালয় অঞ্চলে এবং যারা পশু খাদ্যের জন্য ঘাসকাটে, তাদের জলের উৎস সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা আছে। তারা এই ব্যাপারে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে। বনজঙ্গলে পাখীর কিচির মিচির তাদের গাড়োয়ালী গান 'বানজু বান্দার' গানে এই প্রতিধ্বনি হয়,- 'বুঝেল, বাড়ীও কুন ঠাণ্ডু পানি ইক চাইলা বানজ কি জাগিত্ত কুন--- আমার প্রিয় বকু কাঠের টুকরার চেয়ে বানজ শিকড়ের বেশী স্বাদ আছে। ঠিক সেই একই উপায়ে 'লীয়ন ওয়ানডো পানি বানজ কী জারেন কো, লীযন ঠাণ্ড পানি জেথ বৈশাখ।

ধন শ্যাম শাইলা, এই আন্দেলনের বিখ্যাত কবি এই গান শিখেছেন ও গেয়েছেন-বান্জ ন্বুরাশ সি কুলায়কি ডালি, না-কাটা-না কাটা ইয়ন বাথা যাগভাগি, পাটিয়ন মা চা দুধ কি ঝারিয়ন মা পানি- ইয়ন বান্জ বুরাশকন ইয়ন ঠাণ্ডু পানি---' এর অর্থ যে বান্জ বুরাশের জঙ্গল কেটো না, সেগুলো বাঁচাও ও রক্ষা কর। যখন তার পাতা জীবজন্তু খায়, তখন আমরা দুধ পাই কিন্তু এর চেয়েও বেশী হল এর শিকড় ঠাণ্ডা জল দেয়। যদিও পাহাড়ের গ্রামগুলোতে ট্যাপের মধ্য দিয়ে জল পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন কালে গ্রামগুলো জলের উৎস ঘিরেই গড়ে উঠেছিল।

বান্জ এটা চিরসজুব গাছ যেটা ৪০০০ থেকে ৮০০০ ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের মধ্য অংশে জন্মে থাকে। বান্জ কখনই পাইন গাছের মত একটা করে জন্মায় না। বানজের একটা শক্তিশালী মিশ্রিত সমাজ আছে। কারণ বান্জের সঙ্গে শত শত রকমের লতানো গাছ, ঝোপ এবং ঘাস জন্মায়। এর মধ্যে বুরাশ, কাফাল, কিংগর, আয়ার, খাকশী রয়েনস ইত্যাদি জন্মায়। যেখানে বান্জ জন্মায় তারই নীচে জলের উৎস থাকে। এটা এত সুস্বাদু এবং পরিপাকের সাহায্যকারী যে, একবার যে এই জল খেয়েছে, সে এর স্বাদ ভুলতে পারবে না।

গবেষকেরা সেই সব গাছ চিনেছে, যা বান্জের সঙ্গে জন্মায়। এর মধ্যে ভাঙ্কারেট, উটিস, হিনসর, কাফাল, কুঞ্জ-জঙ্গল, গোলাপ, বীরু ইত্যাদি। জলের উৎস শুধু জলের উৎস নয়, কিন্তু এটার বিভিন্ন নাম আছে এবং বিভিন্ন আকারে যা মাটির মধ্য থেকে বের হয়ে আসে। এগুলি ধারা নাউলা, সালডানি, মাগরা, রিজারভয়ার, কূপ, খাল, পোখর, প্রপাত এবং ছোট ও বড় নদী- প্রত্যেকটির পরিচিতি আছে'।

- বিজয় জয়ধারি

পাঠ্য উপকরণঃ ৫ (বি) : শাসন তন্ত্র, জলনীতি এবং সাম্প্রতিক জল সমস্যা।

যে কোন মানুষই জল সমস্যার কথা বুঝতে পারবে, যদি সে ২০১৬ সালের ৬ই এপ্রিলের সুপ্রীম কোর্টের একটা মতামত সম্বন্ধে জানে যেখানে, কোর্ট ভারত সরকারকে বলেছে যে তার দশটা রাজ্য দুর্ভিক্ষের কবলে আক্রান্ত হয়েছে। পারদ যেখানে ৪৫° ডিগ্রীতে উঠেছে। সেখানে লোকেরা পানীয় জলের অভাবে আছে। তাদের সাহায্য করুন। পরিস্থিতি এই তথ্য প্রকাশ করেছে যে মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, কর্নাটাক, উরিষ্যা, উত্তর প্রদেশ, তেলেঙ্গা, রাজস্থান এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এই কয়টি রাজ্য দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। মহারাষ্ট্রের প্রায় ২০,০০০ গ্রাম দুভিক্ষের কবলে কষ্ট পাচ্ছে। মানরাঠাওয়ারার অবস্থা এত খারাপ যে তারা জেলখানা এবং হাসপাতাল সড়াতে বাধ্য হয়েছে। সৌরাষ্ট্রের জলের রিসারভয়ার দুই মাস ধরে জলের প্রয়োজন মিটাতে পারছে না। লোকেরা বুন্দেলখনণ্ড থেকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। জল পাহারা দেয়া হচ্ছে। এটা চিন্তা করা হচ্ছে যে, ট্রেনের সাহায্যে জলের ব্যবস্থা হচ্ছে সেইসব স্থানগুলিতে যেখানে জলের স্বল্পতা রয়েছে। দেশের ৭০০ লোক এই দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিখ্যাত ৯১ টি জলের রিজারভয়ার গুলোতে ২৫% জল অবশিষ্ট আছে। সামনের গ্রীষ্মে জলের রিজারর্ভরগুলোর জলের কি অবস্তা হবে এবং তার ফল কি হবে?

- কৃষ্ণগোপাল ভায়াস

পাঠ্য উপকরণ: ৬ : তৃতীয় বিশ্বের চলমান আধুনিকিকরণ প্রক্রিয়া এবং একটি গণমুখী বিকল্প উন্নয়ন ভাবনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর অনেক ধরণের পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তির উন্নয়ন, সর্বোপরি উন্নয়নের উপর তাদের যে আশাতীত উচ্চাকাঙ্খা ছিল তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এই সময় তৃতীয় বিশ্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়েছে। নতুন রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহ যে আশা- আকাঙ্খা করেছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। যারা (জনগণ) স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছিল তাদের হতাশা পর্বতসম। উন্নয়নের প্রকৃত রূপ হারিয়ে গেছে, ফলে একটি বিকল্প উন্নয়ন ভাবনা একান্ত প্রয়োজন।

২০ শতকের শেষের দিকে সদ্য সার্বভৌম এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিসমূহ তাদের জাতীয় উন্নয়নের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় খুবই উচ্চ স্বপ্নের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিশেষজ্ঞদের ব্যববস্থাপত্র অনুযায়ী তারা ধারণা করেন এতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো ঘষা দেয়া মাত্র উন্নয়নের সুফল চলে আসবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে যে উন্নয়ন তা জনগণের সকল সমস্যার সমাধান করে দেবে এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় মাত্র দুই দশক পর। তখন ধারণা করা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহকে যদি পুনরুজ্জীবিত করা না যায় এবং তা জাতীয় রাজনীতিতে চর্চা না করা হয় তবে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ সময় তৃতীয় বিশ্বের অনেক বিশেষজ্ঞগণ এমনও ধারণা করেন যে এই বিদেশী বিশেষজ্ঞ নির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমাজ পরিবর্তন তথা প্রকৃত উন্নয়নের অন্তরায়ও বটে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নকে বিবেচনা করা হয় ধনী এবং ক্ষমতাবান জাতির পক্ষে এবং তারাই উন্নয়নের বেশীর ভাগ সুফল ভোগ করে। ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে তাদের একটি ঔপনিবেশিক সম্পর্ক তৈরী হয়। এই সম্পর্কে ধনী দেশসমূহ আজ্ঞা দেয় এবং দরিদ্র দেশসমূহ আজ্ঞা বহন করে। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের এই প্রক্রিয়ায় সীমাহীন বৈষম্য হওয়াই স্বাভাবিক। ঔপনিবেশবাদ উঠে গেলেও অন্য এক রকম নতুন ঔপনিবেশবাদ তৈরী হয়েছে, যা আরও শক্তিশালী। তা উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতি ও অর্থনীতি আধিপত্য কেন্দ্রিক ক্ষমতার আওতায় চলে যাচ্ছে। ফলে এই ধরণের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজের দুর্বল অংশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে উন্নয়নের নামে যে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয় তার শর্ত খুবই অমানবিক এবং তা জনগণের চাহিদা নির্ভর নয়। তা উন্নত দেশসমূহের জাতীয় স্বার্থ বা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চাপিয়ে দেয়া হয়। এর পেছনে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে উন্নত দেশ সমূহের উৎপাদিত পন্যের বাজার তৈরী করার একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য থাকে। এর পর তারা যে উন্নয়ন সহায়তা দেয় তা প্রথম বছর অনুদান হলেও দ্বিতীয় বছর থেকে ঋণে পরিণত হয় এবং এই ঋণের দায় এসে পড়ে জনগণের ঘাড়ে। যা বছর বছর বাড়তে থাকে। ফলে জাতি চিরজীবনের জন্য উন্নত দেশের কাছে মাথা অবনত করে রাখতে বাধ্য হয়। উন্নত দেশসমূহের সাথে উন্নয়নশীল দেশসমূহের যে বাজারনীতি প্রণীত হয় তা খুবই শোষণমূলক ও বৈষ্যম্যমূলক। এতে উন্নত দেশসমূহ তাদের দেশীয় পণ্য উন্নয়নশীল দেশসমূহে অবাধে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লুটে নেয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের নিজস্ব পণ্য বাজার পায় না। বছর বছর শিল্প কারখানা ক্ষতির হিসাব কষতে কষতে অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়। উন্নত দেশসমূহ কখনও এসব দেশ থেকে পণ্য ক্রয় করে না। তারা খুবই কম দামে কাঁচামাল কিনে নেয়।

উন্নয়শীল দেশসমূহের উন্নয়নের আর একটি অন্তরায় হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া। যেহেতু বিদেশী সাহায্য নির্ভর বাজেট তৈরী করা হয়, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দাতাগোষ্ঠীর প্রভাবই বেশী প্রধান্য পায় এবং তা হয় ধনীদের অনুকূলে। যার ফলে দরিদ্রদের চাহিদাকে দারুনভাবে অবজ্ঞা করা হয়। এই ধরণের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জিএনপিকে সূচক হিসেবে ধরা হয়। যে দেশে সম্পদ বন্টনে সীমাহীন বৈষম্য থাকে, অর্থাৎ যে দেশে খুবই কম সংখ্যক লোক জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করে এবং অধিকাংশ লোক খুব কম সম্পদ ভোগ করে, সে দেশে এঘচ বৃদ্ধি পেলে মূলতঃ ধনীদেরই লাভ হয়। গরীবরা এর সুফল পায় না। তাছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কখনও জনগণের সার্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পুরণ করে না। ফলে তা অধিকাংশ জনগণের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করে না। সুতরাং সময় এসেছে জিএনপি এর পরিবর্তে জিএনডব্লিউকে উন্নয়নের সূচক হিসেবে ভাববার । যার উদ্দেশ্যসমূহ হবে-

- ব্যক্তি বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর চাইতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া।
- মানবিক চাহিদা ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ করা।
- অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার জন্য বর্তমান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশলকে সংস্কার করা।
- সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার জন্য জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহ পুনর্বিন্যাস করা এবং প্রতিষ্ঠান ও জনগণ পর্যায়ে মূল্যবোধ চর্চার কৌশল উদ্ভাবন করা।
- সমাজ পরিবর্তনের ধারা এবং অগ্রগতি মূল্যায়নের সূচক নির্ধারণ করা।
- টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মাত্রা পরীবিক্ষণ করার জন্য একটি যুৎসই কৌশল/পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাইরের প্রভাব এর সাথে সাথে রাজনীতিবিদদেরও একটি গণবিমুখী প্রভাব থাকে, যদিও তারা জনগণের প্রতিনিধি। পরিকল্পনাবিদদের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা করেই জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। রাজনীতিবিদরা জনগণের স্বার্থের চাইতে নিজেদের ক্ষমতা ও দলীয় স্বার্থই বিবেচনা করে বেশী, ফলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না। জাতীয় নীতি নির্ধারণও করা হয় দলীয় স্বার্থ বিবেচনা করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আধুনিকিকরণ প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন ভাব্নার কুফল ঃ

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আমাদের দেশের মত তৃতীয় বিশ্বে যে উন্নয়ন ধারণা বা মতবাদ এসেছে তা মূলতঃ বস্তুবাদী ধারণা প্রসূত। এখানে মানবিক উন্নয়নের চাইতে বস্তুগত উন্নয়নের প্রতিই বেশী নজর দেয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য ধারনা থেকেই এই উন্নয়ন ধারণা বা মতবাদটি এসেছে। এই মতবাদে এ জনগণের মাথাপিছু আয়, এঘচ, গাড়ী, বাড়ি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দ্রব্য সামগ্রীর প্রাচুর্য্য, জীবনযাত্রার স্ট্যাটাস ইত্যাদিকে সূচক হিসেবে ধরা হয়। ফলে সঙ্গত কারণেই মানুষের মৌলিক চাহিদা, ভালোবাসা, স্নেহ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, প্রীতি, প্রভৃতি সামাজিক মূলধণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে গেছে। আধুনিক উন্নয়ন ধারণা বা মতবাদে মানুষের যে মৌলিক চাহিদা- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদিকে উপকরণ হিসেবে দেখা হয়েছে।

আধুনিকিকরণ প্রক্রিয়ায় কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য কোন প্রকার গবেষণা ছাড়াই বিদেশ থেকে রাসায়নিক সার, কীট নাশক, উন্নত জাতের বীজ, ট্রাক্টর, ইত্যাদি আনা হলো। অর্থাৎ বিদেশী সাহায্য নির্ভর দেশগুলো তা আনতে বাধ্য হলো। ফলে নিজস্ব প্রযুক্তি বা দেশীয় উন্নয়নের ধারা ব্যহত হলো। প্রথম প্রথম হয়তো উৎপাদন বাড়লো কিন্তু ক্ষতি হলো চরম। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমি তার উর্বরা শক্তি হারালো, মৎস সম্পদ প্রায় ধ্বংসের পথে, সাপ, ব্যাঙ, কীট-পতঙ্গ, ছোট পাখি মরে গেল। এসকল প্রানী পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে ভারসাম্য রক্ষা করতো তা প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। ট্রাক্টর পেয়ে প্রথমে কৃষকরা খুশীই হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে আবার তারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চাইছে। কারণ ট্রাক্টর মেরামত করার বিদ্যা ও তা চালানোর মত জ্বালানী খরচ তাদের কাছে সব সময় থাকে না। আধুনিকিকরণের ফলে উন্নত জাতের যে বীজ কৃষকরা পেল তাও কম সমস্যার জন্ম দেয়নি। মাটি পরীক্ষা, পোকা দমন, ইত্যাদিতে এখন বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হয়, যা তাদের পূর্বে প্রয়োজন হতো না নিজেরাই করতো।

আধুনিকিকরণের ফলে আমরা অনেক কিছুই হারিয়েছি। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিয়ে উৎপাদিত ফসল খেয়ে আমরা নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছি। আমরা আমাদের সৃজনশীলতাকেও হারাতে বসেছি। জমির খন্ডায়ন হচ্ছে, পরিবার ছোট হয়ে যাচ্ছে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ বাঁধছে। এসবই আধুনিকিকরণের ফলাফল।

আমাদের মত গরীব দেশগুলোতে যেহেতু সম্পদের সুষম বন্টন নেই, তাই এই ধরণের আধুনিকিকরণ প্রক্রিয়া পুঁজিবাদকেই স্বাগত জানায়। কারণ যার সম্পদ বেশী সে এই প্রক্রিয়া আরও বেশী সম্পদের মালিক হয়। সমাজে তার আধিপত্যই বেশী থাকে। ফলে গরিব হয় শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও আরও গরিব।

আধুনিকিকরণ বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারণা যাদের নিকট থেকে এসেছে তাদের হয়তো এই সম্পর্কে ভালো ও পরিষ্কার ধারণা আছে। কিন্তু যাদের উপর এই মতবাদ বা ধারণা চাপানো হয়েছে তারা এই সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিবহাল নয়। তাদের কাছে হঠাৎ করেই এই মতবাদ বা ধারণাগুলো আসে। ফলে তারা তা হজম করতে পারে না। আবার নিজেদের যে চিরাচরিত অভ্যাস তাও পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং সংকট উভয় দিকেই।

আধুনিকিকরণ বা উন্নয়ন প্রক্রিয়া নগরায়ন, শিল্পায়ন প্রভৃতিকে চৎড়সড়ঃব করে। এসবের ফলে মানুষ হয় শহরমুখী। খুবই কম জায়গায় অধিক লোকের বসবাস। ফলে পরিবেশ হয় দষিত। শিল্প ও কলকারখানার বর্জ্য পদার্থতো আছেই। আধুনিকিকরণ বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে খারাপ দিক হলো এতে মানুষকে খুব বেশী মূল্য দেয়া হয় না। মানুষের চার পাশে যে দ্রব্যসামগ্রী আছে তার মূল্যই যেন বেশী। যেমন মানুষ কম্পিউটর তৈরী করে এবং ব্যবহার করে। কম্পিউটরের জন্য এয়ার কন্ডিশনড্ রুম দরকার হয়, কিন্তু মানুষের জন্য এসি রুম ততটা বিবেচনায় আসে না।

আধুনিকিকরণ বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জন্য যেহেতু বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শ প্রয়োজন বা নিতে হয় তাই আমাদের নিজেদের যে প্রথাগত ঐতিহ্য যা বাপ-দাদাদের মধ্যে ছিল তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফলে আমাদের মধ্যে পরনির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হচ্ছে।

এর ফলে আমরা যেন প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমরা ধীরে ধীরে আত্মকেন্দ্রিক ও অন্তর্মূখী হয়ে যাচ্ছি। সন্তানরা বাবা মা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আমরা বড় বেশী যন্ত্র নির্ভর হয়ে পরছি। আগে অনেক বড় বড় হিসাব মানুষ মুখে মুখে করতো, এখন ক্যালকুলেটর বা কম্পিউটরের প্রয়োজন হয়। প্রতিভারই যেন অবনতি ঘটছে। আগে একই ব্যক্তি কৃষি কাজ করতো, বিনোদনের জন্য বাঁশি বাজাতো, গান গাইতো, গান রচনা করতো। এখন তার বিনোদনের জন্য অনেক মাধ্যম আছে, গান রচনা করতে হয় না। আমরা আমাদের প্রথাগত বিদ্যা, জ্ঞান প্রায় সবই হারাতে বসেছি।

এস.সি দুবে তার "মর্ডানাইজেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট" বইয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য যে বিকল্প ধারণা প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ সার্বিক উন্নয়ন এবং এর আনুষঙ্গিক উপাদানসমূহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের পূর্ব শর্ত তবে এর সুষম বন্টন নিশ্চিত করা আবশ্যক। অধিকাংশ মানুষের ও সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহকে জোর বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় অর্ধেক লোক দরিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করে। উন্নয়নের লক্ষ্য হবে তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও মৌলিক চাহিদা পূরণ। এতে অবশ্যই প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণকে বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। এমন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না যা অর্জন করা সম্ভব নয়, তবে অবশ্যই তা হতে হবে গণমুখী ও টেকসই।

দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশসমূহের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্রতা দূরীকরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। দরিদ্রতা হচ্ছে কতকগুলো সমস্যার কারণের মূল কারণ। বর্তমানে যে সমাজ কাঠামো বিদ্যমান তা দরিদ্রদের শোষন, শাসন ও বঞ্চনার রসদ জুগিয়ে ধনীদের আরও শক্তিশালী করছে। এই ধরণের সমাজ কাঠামোর মধ্যে থেকে দরিদ্রতা দূরীকরণ প্রায় অসম্ভব। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনায় বর্তমান সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের যুৎসই কৌশল সর্বাধিক বিবেচনায় রাখতে হবে। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল হবে নমনীয়, যাতে তা প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়।

তৃতীয়তঃ সাধারণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্রদের মৌলিক অধিকার, উন্নয়ন ধারণা ও উন্নয়নে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ সাধন করতে হবে। তাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যদি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তবে তা কল্পনাশ্রয়ী না হয়ে হবে বাস্তবসম্মত। আর তা হলে ধনী ও প্রভাবশালীদের অনুকূল সমাজ কাঠামো অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়বে।

চতুর্থতঃ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণে সকলের বৈষম্যহীন ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় নীতি ও উন্নয়ন কৌশলে অবশ্যই সমাজের শোষিত অংশ এবং বিশেষ করে নারীদের সকল বিষয়ে বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। এমন একটি কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে যাতে নীতি নির্ধারণ বা পরিকল্পনায় সমাজের পরভূক ধনী শ্রেণী প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ না পায়।

পঞ্চমতঃ জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর নিবিড় ও বিশ্লেষণাত্মক পর্যবেক্ষণ ও গুরুত্ব দিতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে পাশ্চাত্ব ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই ভেঙ্গে পড়েছে। যা আছে তা বিভ্রান্তিকর কাঠামো নিয়ে টিকে আছে এবং তারা শুধু সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের সামাজিক প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য ধাঁচের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও গবেষণার বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। পরিকল্পনা তৈরি করা হয় খুব সূক্ষ্ম ও প্রণালীবদ্ধভাবে কিন্তু প্রকল্প প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয় খুবই জটিল প্রক্রিয়ায় এবং গবেষণা থাকে অকার্যকর। ফলে উন্নয়নের ঐ ঔপনিবেশিক কাঠামোকে অবশ্যই পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে উন্নয়ন চাহিদা ও নীতি নির্ধারণে তারা আরও সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল হতে পারে। ব্যাবস্থাপনা প্রশাসনকে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী পুণর্গঠন করতে হবে এবং বিশেষ করে প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টগুলোকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত করতে হবে।

ষষ্ঠতঃ উন্নয়নের বিশ্বপ্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২১ শতকের দারপ্রান্তে এসেও ধনী ও দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে সম্পদের বন্টনে সীমাহীন বৈষম্য। হয়তো এটা চলতেই থাকবে, কিছুই করার নেই। বলা হয় আমরা পৃথিবীর মানুষ, একই প্রকৃতিক পরিবেশ ও গ্রহে বাস করছি। এটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানবতার প্রশ্নে আমাদের ভাববার সময় এসেছে। কেউ ভোগ করবে পৃথিবীর সিংহভাগ সম্পদ আর কেউ না খেয়ে মরবে, তা ঠিক নয়। ফলে ধনী দেশের সাথে আমাদের ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এই বৈষম্যমূলক সম্পর্ক নিয়ে অন্তত উন্নয়নের অংশীদার হওয়া যায় না।

সপ্তমতঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে রিজিওনাল ও সাবরিজিওনাল ভিত্তিতে আন্তঃসমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। এই সমন্বয় শুধুমাত্র ব্যবসা ও শিল্পের প্রসারের জন্য না হয়ে সার্বিক উন্নয়ন ও আন্তঃ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য হওয়া উচিত। মানবিক সম্পদ ও অর্থসম্পদ বিনিময়ের মাধ্যমে সায়েন্স ও টেকনোলজির উন্নয়ন ও প্রসার ঘটিয়ে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ব্যবধান কমানো যেতে পারে।

এই বিকল্প উন্নয়ন ধারণার জন্য অপরিহার্য মূল্যবোধসমূহ ঃ

জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আত্মমর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা, সুষম বন্টন, আত্মপলব্ধি, অহিংসা, সাম্যতা, সমতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অংশগ্রহণ, মানবতা, কৃচ্ছতা সাধনের মানসিকতা, সামাজিক সংঘবদ্ধতার মানসিকতা, সমন্বয় সাধন করার মানসিকতা, নৈতিকতা, শ্রদ্ধাবোধ, গনতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রন ও নিরপেক্ষতা।

-ভাবানুবাদ ও সংকলন ঃ কালীপদ সরকার।

পাঠ্য উপকরণ: ৭ : শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার পেছনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ পলাশী যুদ্ধের পর

(প্রভাতাংশু মাইতি রচিত ভারত ইতিহাস পরিক্রমা এবং সেলিনা হোসেন রচিত তিতুমীর গ্রন্থ থেকে সংকলিত) সংকলন ঃ কালীপদ সরকার।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয় লাভের পর বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। এই যুদ্ধ জয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা পলাশীর লুণ্ঠন আরম্ভ করে। স্বয়ং ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার শিংহাসনে বসিয়ে ২,৩৪,০০০ পাউন্ড উপঢৌকন গ্রহণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্যরা প্রত্যেকে ৫০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা উপঢৌকন পান। কোম্পানী ২৪ পরগনার জমিদারী স্বত্ব পায়। এই জমিদারী থেকে কোম্পানী প্রজাদের চাবুক মেরে বছরে দেড় লক্ষ পাউন্ড নীট মুনাফা আয় করতে থাকে। ক্লাইভ পরে পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে কবুল করেন যে, তিনি যে আরও বেশী অর্থ নেননি, এজন্য পরে তিনি নিজেই আশ্চর্য্যবোধ করেছেন। আসলে ক্লাইভ প্রভৃতির অনুমান ছিল যে, মুর্শিদাবাদের কোষাগারে ৪০ মিলিয়ন ষ্ট্যালিং পরিমান অর্থ মজুদ আছে। আসলে বাস্তবে মাত্র দেড় মিলিয়ন ষ্ট্যালিং কোষাগারে পাওয়া যায়। বাকী টাকা ক্লাইভ মীরজাফরকে রাজস্ব আদায় করে পরিশোধ করতে বাধ্য করেন।

ডঃ এন কে সিংহের মতে ঠিক কত পরিমান টাকা কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা লুট করে তা সঠিকভাবে জানার সম্ভাবনা নেই। উঁচু পদের কর্মচারীরা মীরজাফরের কাছ থেকে উপঢৌকন আদায় করায়, নীচু পদের কর্মচারীরা সাধারণ নাগরিক, জমিদার, কৃষক ও দেশীয় বনিকদের উপঢৌকন দিতে বাধ্য করে। ফলে এদের মধ্যে দৃশ্যত অশান্তির ছায়া নেমে পড়ে।

পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা বিনাশুল্কে ব্যাপক বানিজ্য চালাতে থাকে। বাংলার আভ্যন্ত রিন ও বৈদেশিক বানিজ্য-কোম্পানী, কোম্পানীর কর্মচারী ও ইংল্যান্ড থেকে আগত বেসরকারী বনিকদের একচেটিয়া অধিকারে চলে যায়। এর ফলে বাংলার বনিকদের একাংশ প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে বানিজ্য ছেড়ে মূলধনের টাকা জমিদারী ক্রয় ও কোলকাতায় গৃহ নির্মানে লগ্নি করে। বাঙালীরা বানিজ্য লক্ষ্মীর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। বাংলার বনিকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ইওরোপীয় বনিকদের গোমস্তা, সরকার, বেনিয়ান হিসেবে টিকে থাকে। তবে এই কাজে তারা ইংরেজ বনিকদের ভৃত্য বা সহযোগী হয়ে যায়।

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পর্বে বাঙালী নেতাদের চারিত্রিক অবক্ষয় ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির প্রেক্ষিতে প্রকট হয়েছিল। এজন্যই তারা সিরাজকে গদিচ্যুত ও মীরজাফরকে সিংহাসন পেতে সহায়তা করে। এই যুগে কলিকাতায় অবস্থিত ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যেও নৈতিক অবক্ষয় ভীষণভাবে দেখা দেয়। বাঙালী জাতীকে প্রেরণা দেয়ার মত শক্তি এসব ইংরেজদের মধ্যে ছিল না। তাদের মধ্যে খ্রীষ্টিয় নীতিবোধ ও ইংরেজ জাতি-সুলভ মহত্বের নিতান্ত অভাব দেখা দেয়। ক্লাইভ নিজে নির্লজ্জ অর্থলোভ ও লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এর প্রভাব পরে সাধারণ দরিদ্র মানুষের উপর। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অশান্তি চরম আকার ধারণ করে।

ঐতিহাসিক এসসি হিল সিরাজের পতনের জন্য তৎকালীন হিন্দু বিরোধিতাকে দায়ী করেন। তার মতে হিন্দুরা মুসলিম শাসন থেকে মুক্তি চাইছিল। এই ধারণা অনেকের কাছে পুরোপুরি ঠিক নয়। সিরাজের বিরুদ্ধে কোন কোন অভিজাত হিন্দু কর্মচারী ও জমিদার অসন্তষ্ট ছিল, এতে সন্দেহ নেই। এদের মধ্যে রায় দুর্লভ, জগৎ শেঠ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির নোম করা যায়। আলিবর্দি খাঁর আমল থেকে ক্ষমতা ভোগ করে তারা উচ্চাকাঙ্খীও হয়তো হয়েছিল। কিন্ত সাধারণ হিন্দুরা নবাবের বিরোধী ছিল এমন কোন প্রমান নেই। তারা মুসলিম শাসন থেকে মুক্তি চেয়েছিল তারও তেমন কোন প্রমান নেই। তাহলে সিরাজের বির□দ্ধে তারা অপর এক মুসলিম অভিজাত মীরজাফরকে পরবর্তী নবাব হিসেবে বেছে নিত না। তাই এই নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে অসম্প্রীতি তা কোন দুষ্টচক্রের অসৎ পরিকল্পনার ফল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। সে দুর্ভিক্ষে এদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাংলার মাটি ছিল স্বর্ণপ্রসবিনী। সবুজ শ্যামল এদেশের কালো মানুষের সুখ ছিল, স্বস্তি ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাকে বার বার ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। তবু কোটরগত চোখের তারায় ঝলসে উঠেছে আশার আলো। মানুষ অপরিমেয় মনোবল নিয়ে মেকাবেলা করেছে দুর্যোগের। তারা বিপর্যস্ত হয়েছে, কিন্ত হার মানেনি। মানুষের এই অজেয় মনবলে প্রবল আঘাত হেনেছে মানুষের তৈরী আইন। শোষণ ও নিপীড়ন ভেঙ্গে দিয়েছে তার মেরুদন্ড।

সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কিছুকাল আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে। যার ফলে আইনগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার অধিকার। এর সাথে মদদ যোগায় দেশীয় প্রভূরা, যারা ছিল ইংরেজ বনিকদের পদলেহী ক্রীতদাস। ওদের প্রধান কাজ ছিল ইংরেজদের খুশি করা। জ্বী হুজুর ছাড়া আর কোন ভাষা ওরা জানত না। কোম্পানীর ইচ্ছে-অনিচ্ছে ছিল ওদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে। দেওয়ানী লাভের পরই ইংরেজ এবং দেশীয় রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের দিকে নজর দেয়। যেভাবেই হোক মুনাফা অর্জন করতে হবে- চাই বাংলার শশ্যগোলা লুণ্ঠন করে নিজ দেশকে ঐশ্বর্যশালী করা। ফলে কঠোরভাবে ভূমিকর আদায় করার ব্যবস্থা নেয়া হলো। এমন দৃষ্টান্ত দেওয়ানী আমলের আগে ছিল না। মুসলমানদের শাসনের সময় যে রাজস্ব আদায় করা হত, তা দেশেই থাকতো। জনসাধারণের ব্যাপক উপকার না হলেও সাধারণ মানুষ কোন না কোনভাবে সে সম্পদ থেকে ন্যূনতম সুবিধা ভোগ করতো। বড় ধরণের ব্যক্তিগত সুবিধা সাধারণ মানুষ পায়নি, কিন্ত দেশের সম্পদ দেশে থাকবে এই স্বস্থিটুকু তাদের ছিল। দেওয়ানীর নীল-নকশা অনুযায়ী রাজস্বের একটা বড় ভাগ ইংল্যান্ডে পাচার হতে লাগল। ফলে ভূমিকর দ্বিগুণ হয়ে গেল। বাংলার কৃষকের বুকের পাঁজরে বিস্তৃত হলো ইংরেজ বনিকদের কালো থাবা। ফলে বাংলার নিম্নবিত্তের মানুষের মনে নেমে এল অশান্তির কালো ছায়া।

নিম্নবিত্তের এই মানুষেরা বেশীরভাগই ছিল মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু শ্রেণী। নিম্নবিত্তের এই মুসলমানরাই ছিল তৎকালের মুসলমান সমাজের প্রধান অংশ। পলাশীর যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল। অনেক জায়গায় মুসলমানরা জমিদারী থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অফিস-আদালতের কর্তৃত্ব হারিয়েছে, সৈন্য বিভাগ থেকে খারিজ হয়েছে বিপুলভাবে। এমনকি কোম্পানীর সৈন্যদলেও মুসলমান সেনাপতির স্থান রইলো না। উপরন্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে নতুন শোষণকারী অর্থাৎ জমিদার সম্প্রদায় আবির্ভত হলো। ফল হলো মারাত্মক। কারন ভূমির পরিমাপ, ভূমির দখল, এমনকি তার রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ ছাড়াই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এই নীতি উচ্চবিত্তের মুসলমানদের মূল উপড়ে দিল। ইতিহাস প্রমান করে যে, উচ্চ বর্ণের হিন্দু অফিসারকে ভূস্বামী করাই ছিল এই নীতির লক্ষ্য। মুসলমানদের আরও নানা কারনে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুযোগ-সুবিধার বাইরে ছিটকে পড়লে নিম্নবিত্তদের প্রতি নীপিড়ন আরও চরমে উঠল। এর উপর কাট ঘায়ে নুনের ছিটার মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের মাথায় নেমে এলো। এব্যবস্থা জন্ম দিল স্থায়ী জমিদার গোষ্ঠির। কৃষকদের জন্য এদের কোন দরদ ছিল না, বুঝতে চাইতো না এরা এদেশেরই মানুষ। এসব জমিদারকে যারা মুনাফা দিত তারাই জমি চাষ করার সুযোগ পেত। ফলে সাধারণ চাষীর উপর এই মুনাফা দেয়ার চাপ পড়ত। শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত ফসলের সামান্যই থাকত তাদের জন্য। এই প্রানান্তকর পরিশ্রম দিয়ে মেটাতে হতো তিন চারটে স্তর। যেমন- আসল জমিদার, পত্তনিদার এবং সহ পত্তনিদার। এরা সবাই মুনাফা ভোগ করত হতভাগ্য কৃষকদের কাছ থেকে। এর বাইরেও কর বাড়ানোর জন্য জমিদারদের খেয়াল খুশির অন্ত ছিল না। যেহেতু জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু তাই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অশন্তোষ বাড়তে লাগলো।

আরও একটি যে মর্মান্তিক দুর্ভোগ এদেশের কৃষকদের পোহাতে হয়েছে তা হল নীল চাষ। এ আরেক কর□ন অবস্থা, অন্তহীন নীপিড়ন এবং নিগৃহের মধ্য দিয়ে কেটেছে তাদের দুঃখের রাত। ইংরেজরা নীল চাষের জন্য কৃষকদের যে অর্থ দিত তা দিয়ে ভরপেট খেয়ে বাঁচা সম্ভব ছিল না। প্রতিবিঘা জমিতে খুব ভাল নীল উৎপাদন করেও চাষীকে সমপরিমান জমিতে লোকসান দিতে হতো সাত টাকা। অথচ জমির খাজনা ছিল- যে পরিমান লোকসান হতো তার সাতগুণ।

কৃষিকাজ ছাড়াও নিম্নবিত্ত এইসব মানুষেরা আর একটি কাজে খুব ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিল, তা হলো তাঁত শিল্প। দেশ জুড়ে এই শিল্পের প্রসার ছিল এবং সবাই চমৎকার কাপড় বুনত। পুরো ইউরোপে ঢাকার মসলিন ছিল সুপরিচিত। এসব কাপড় তৈরীতে মুসলিম তাঁতীরা ছিল দক্ষ ও সক্রিয়। কিন্ত কোম্পানীর কারসাজিতে এসব নিম্নবিত্ত মানুষেরা স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখতে পেতনা। কোম্পানীর এজেন্টরা তাঁতীদের লোকসানজনক চুক্তি সম্পাদন করাতে বাধ্য করত। তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ ধরণের বস্ত্র উৎপাদনে বাধ্য করা হত। কাপড়ের রং, মান ও মূল্য তারাই ঠিক করত এবং এব্যাপারে তাঁতীদের মতামতের বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। সবচেয়ে দুঃখজনক যে এজেন্টরা তাঁতীদের যে মূল্য দিত তা ছিল বাজার দরের চাইতে ১৫ থেকে ৪০ ভাগ কম। কোম্পানীর শাসন অন্যদিক থেকে তাঁতীদের উপর নামিয়ে আনল ঘোর তমশা। এরা দেশীয় বস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং সিল্ক তৈরীর কারিগরদের কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে চাকরী করতে বাধ্য করে। ফলে কাপড় উৎপাদনের মান পড়ে যায় এবং দেশের বস্ত্রশিল্পকে বিলেতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। ১৮১৭ তে বিলেতে মসলিন রপ্তানী প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৩৩ সাল থেকে মসলিন শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বৃটিশ বনিকরা উন্নত মানের বস্ত্র আমদানী করার ফলে দেশী বস্ত্র মার খেতে থাকে এবং বিদেশী কাপড়ের চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে তাঁতীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে। তাদের জীবকার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এদের জমিজমাও পর্যাপ্ত ছিলনা যে তার উপর নির্ভর করে সংসার চালাতে পারে। এসব তাঁতীদের বেশীরভাগই ছিল নিম্নবিত্ত মুসলমান, বাকীরা নিম্নবর্ণের হিন্দু।

মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণীরা সকল প্রকার সুখ সুবিধে হারিয়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে পা বাড়ায়। সেখানেও তাদের উন্নতির আশা সুদর পরাহত। কিছু সংখ্যক মুসলমান যারা শহরে বাস করছিল তারা উন্নতির কোন সুযোগই পায়না। অপরপক্ষে কোলকাতার হিন্দুরা ইংরেজদের অসম্ভব রকম সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করতে থাকে। ফলে অশান্তি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকেই মোড় নিতে থাকে।

পাঠ্য উপকরণঃ ৮ : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

শ্রদ্ধেয় মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত " মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। সংগ্রহ ঃ কালীপদ সরকার, সিসিডিবি।

দেশ

মানুষের যতগুলো অনুভূতি আছে তার মাঝে সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি হচ্ছে ভালোবাসা। আর এই পৃথিবীতে যা কিছুকে ভালোবাসা সম্ভব তার মাঝে সবচেয়ে তীব্র ভালোবাসাটুকু হতে পারে শুধুমাত্র মাতৃভূমির জন্য। যারা কখনো নিজের মাতৃভূমির জন্য ভালোবাসাটুকু অনুভব করেনি তাদের মতো দুর্ভাগা আর কেও নেই। আমাদের খুব সৌভাগ্য যে, আমাদের মাতৃভূমির জন্য যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল তার ইতিহাস হচ্ছে গভীর আত্মত্যাগের ইতিহাস, অবিশ্বাস্য সাহস ও বীরত্বের ইতিহাস এবং বিশাল এক অর্জনের ইতিহাস। যখন কেও এই আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অর্জনের ইতিহাস জানবে, তখন সে যে শুধুমাত্র দেশের জন্যে একটি গভীর ভালোবাসা ও মমতা অনুভব করবে তা নয়, এই দেশ, এই মানুষের কথা ভেবে গর্বে তার বুক ফুলে উঠবে ।

পূর্ব ইতিহাস

যেকোনো কিছু বর্ণনা করতে হলে সেটি একটু আগে থেকে বলতে হয়। তাই বাংলাদেশের ইতিহাস জানার জন্যেও একটু আগে গিয়ে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করা যেতে পারে। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলটিকে প্রায় দুইশত বছর শাসন-শোষণ করেছে। তাদের থেকে স্বাধীনতার জন্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে জেল খেটেছে, দ্বীপান্তরে গিয়েছে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব-এ ঠিক করা হয়েছিল, ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলোতে মুসলমান বেশি, সেরকম দুটি অঞ্চলকে নিয়ে দুটি দেশ এবং বাকি অঞ্চলটিকে নিয়ে আরো একটি দেশ তৈরী করা হবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যে এলাকা দুটিতে মুসলমান বেশী সেই এলাকা দুটি নিয়ে দুটি ভিন্ন দেশ না হয়ে পাকিস্তান নামে একটি দেশ এবং ১৫ আগস্ট বাকি অঞ্চলটিকে ভারত নামে অন্য একটি দেশে ভাগ করে দেয়া হ'লো । পাকিস্তান নামে পৃথিবীতে তখন অত্যন্ত বিচিত্র দেশের জন্ম হলো, যে দেশের দুই অংশ দুই জায়গায়। এখন যেটি পাকিস্তান সেটির নাম পশ্চিম পাকিস্তান এবং এখন যেটি বাংলাদেশ তার নাম পূর্ব পাকিস্তান। মাঝখানে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব, এবং সেখানে রয়েছে ভিন্ন একটি দেশ ভারত।

বিভেদ, বৈষম্য, শোষন আর ষড়যন্ত্র

পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে শুধু যে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব তা নয়, মানুষগুলোর ভেতরেও ছিল বিশাল দূরত্ব। তাদের চেহারা, ভাষা, খাবার, পোষাক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবকিছু ছিল ভিন্ন, শুধু একটি বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলোর মাঝে মিল ছিল-সেটি হচ্ছে ধর্ম। এরকম বিচিত্র একটি দেশ হলে সেটি টিকিয়ে রাখার জন্য আলাদাভাবে একটু বেশী চেষ্টা করার কথা, কিন্তু পাকিস্তানের শাষকেরা সে চেষ্টা করল না দেশ ভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি, পূর্ব পাকিস্তানের ছিল চার কোটি, কাজেই সহজ হিসাবে বলা যায় শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, পুলিশ-মিলিটারি, সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তা সব কিছুতেই যদি একজন পশ্চিম পাকিস্তানের লোক থাকে, তাহলে সেখানে দুইজন পূর্ব পাকিস্তানের লোক থাকা উচিত। বাস্তবে হলো ঠিক তার উল্টো, সব কিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ ছিল শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ।

ভাষা আন্দোলন

অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে অনেক বড়ো নিপীড়ন হচ্ছে একটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যর ওপর নিপীড়ন, আর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ঠিক সেটিই শুরু করেছিল। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে আর ঠিক ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা এসে ঘোষণা করলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা তার প্রতিবাদ করে বিক্ষোভ শুরু করে দিল। আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল রফিক, সালাম বরকত,জব্বার এবং আরো অনেকে। তারপরেও সেই আন্দোলনকে থামানো যায়নি,পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পযর্ন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। যেখানে ভাষা শহীদরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেখানে এখন আমাদের প্রিয় শহীদ মিনার, আর ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি শুধু বাংলাদেশের জন্যে নয়, এখন সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ছয় দফা

দেশে সামরিক শাসন, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর এতরকম বঞ্চনা, কাজেই বাঙালিরা সেটি খুব সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলনা। বাঙালির সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্য স্বায়ত্ব শাসন দাবি করে ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করলেন। ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সবরকম অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক অসাধারন দলিল। তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর যে রকম অত্যাচার নির্যাতন চলছিল, তার মাঝে ছয় দফা দিয়ে স্বায়ত্বশাসনের মত একটি দাবি তোলা খুব সাহসের প্রয়োজন। ছয় দফা দাবি করার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগের ছোট বড় সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয়া হলো। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য থাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে দেশদ্রোহীতার একটি মামলার প্রধান আসামি করে দেয়া হল।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কিছুতেই এটা মেনে নিলনা এবং সারা দেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। জেল-জুলুম, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)-এর গুলি, কিছুই বাকি থাকলোনা, কিন্তু সেই আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা গেলনা। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিল ছাত্রেরা, তাদের ছিল এগারো দফা দাবি। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী ছিলেন জেলের বাইরে, তিনিও এগিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে সেই আন্দোলন একটি গণ-বিস্ফোরণে রূপ নিল, কার সাধ্যি তাকে থামায়? ৬৯-এর গণআন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল ফুটফুটে কিশোর মতিউর, প্রাণ দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ- যার নামে আইয়ূব গেটের নাম রাখা হয়েছিল আসাদ গেট। পাকিস্তান সরকার শেষ পযর্ন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সব নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। শুধু তাই নয় প্রবল পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নিল। তারিখটি ছিল ১৯৬৯-এর ২৫ শে র্মাচ, কেউ তখন জানতো না, ঠিক দুই বছর পর একই দিনে এই দেশের মাটিতে পৃথিবীর জঘন্যতম একটি গণহত্যা শুরু হবে।

পাকিস্তানের প্রথম সাধারন নির্বাচন

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই পাকিস্তানের প্রথম সাধারন নির্বাচন দেবার কথা ঘোষনা করে, তারিখটি শেষ পযর্ন্ত ঠিক করা হয় ১৯৭০ সালের ০৭ ডিসেম্বর। নির্বাচনের কিছুদিন আগে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল এলাকায় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটে গেল। এক প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা গেল। এতো বড় একটি ঘটনার পর পাকিস্তান সরকারের যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত ছিল, তারা মোটেও সেভাবে এগিয়ে এল না। ঘূর্ণিঝড়ের পরেও যারা কোনোভাবে বেঁচে ছিল তাদের অনেকে মারা গেল খাবার আর পানির অভাবে। ঘূর্ণিঝড়ে কষ্ট পাওয়া মানুষগুলোর প্রতি এরকম অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণা আর ঘৃনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রচন্ড ক্ষোভে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী একটি প্রকাশ্য সভায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবি করে একটি ঘোষনা দিয়ে দিলেন।

১৯৭০ সালের ০৭ ডিসেম্বর অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সারা পাকিস্তানে প্রথম সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বড়ো বড়ো জেনারেলের রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিলনা। তারা ধরে নিয়েছিল, নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, তাই দলগুলো নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাটি আর কোন্দল করতে থাকবে আর সেটিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থেকে দেশকে লুটে পুটে খাবে। কাজেই নির্বাচনের ফলাফল দেখে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, ফলাফলটি ছিল অবিশ্বাস্য। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনের ভেতরে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটের ব্যবধানে ১৬০টি আসন পেয়েছে। যখন সকল আসনে নির্বাচন শেষ হল তখন দেখা গেল, মনোনীত মহিলা আসনসহ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি ৮৮টি এবং অন্যান্য সব দল মিলে পেয়েছে বাকি ৫৮টি আসন।

সোজা হিসেবে এই প্রথম পাকিস্তান শাসন করবে পূর্ব পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ। বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার বলে দিলেন, তিনি ছয় দফার কথা বলে জনগণের ভোট পেয়েছেন এবং তিনি শাসনতন্ত্র রচনা করবেন ছয় দফার ভিত্তিতে, দেশ শাসিত হবে ছয় দফার ভিত্তিতে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল কোনভাবেই বাঙালিদের হাতে পাকিস্তানের শাসনভার তুলে দেয়া যাবে না। নিজেদের অজান্তেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান আর তার দলবল বাংলাদেশ নামে নতুন একটি রাষ্ট্র জন্ম দেবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল।

ষড়যন্ত্র

জেনারেলদের ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বড়ো সাহায্যকারী ছিল সেনাশাসক আইয়ূব খানের এক সময়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো। হঠাৎ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পারকানায় পাখি শিকার করতে আমন্ত্রন জানালো। পাখি শিকার করতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগ দিল পাকিস্তানের বাঘা বাঘা জেনারেল। বাঙালিদের হাতে কেমন করে ক্ষমতা না দেয়া যায় সেই ষড়যন্ত্রের নীল নকশা সম্ভবত সেখানেই তৈরী করা হয়েছিল।

ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চলতে থাকলেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেটি বাইরে বোঝাতে চাইলনা। তাই সে ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করল ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। সবাই তখন গভীর আগ্রহে সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এর মাঝে ১৯৭১ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের ভালোবাসার এবং মমতার শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হলো অন্য এক ধরনের উন্মদনায়। শহীদ মিনারে সেদিন মানুষের ঢল নেমেছে, তাদের বুকের ভেতর এর মাঝেই জন্ম নিতে শুরু করেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালিদের

সেই উন্মদনা দেখে পাকিস্তান সেনা শাসকদের মনের ভেতরে যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ ছিল সেটিও দূর হয়ে গেল। জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিল সংখ্যা লঘু দলে, ক্ষমতায় তার অংশ পাবার কথা নয়, কিন্তু সে ক্ষমতার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ঠিক দুই দিন আগে ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বুকের ভেতর ক্ষোভের যে বারুদ জমা হয়ে ছিল, সেখানে যেন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ স্পর্শ করল। সারাদেশে বিক্ষোভের যে বিস্ফোরণ ঘটল তার কোন তুলনা নেই ।

উত্তাল মার্চ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেছে, এ ঘোষণাটি যখন রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে,তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের সাথে কমনওয়েলথ্ একাদশের খেলা চলছে।মুর্হুতের মাঝে জনতা বিক্ষুব্ধ হযে ওঠে, ঢাকা স্টেডিয়াম হয়ে ওঠে একটি যুদ্ধক্ষেত্র স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-পাট সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়।লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে আসে, পুরো ঢাকা শহর দেখতে দেখতে একটি মিছিলের নগরীতে পরিনত হয়ে যায়। মানুষের মুখে তখন উচ্চারিত হতে থাকে স্বাধীনতার স্লোগান ‘জয় বাংল্ল, বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

বঙ্গবন্ধু ঢাকা এবং সারাদেশে ৫ দিনের জন্যে হরতাল ও অনির্দিষ্টকালের জন্যে অসহযোগ আন্দলোনের ডাক দিলেন।সেই অহিংস অসহযোগ আন্দলোনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে কোনভাবে সাহায্য না করার কথা বলেছিলেন এবং তার মুখের একটি কথায় সারা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে গেল। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য কারফিউ দেয়া হলো। ছাত্র জনতা সেই কারফিউ ভেঙ্গে পথে নেমে এল। চারিদিকে মিছিল, স্লোগান আর বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীর গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে তারপরেও কেউ থেমে রইল না, দলে দলে সবাই পথে নেমে এল।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয় ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় জাতীয় সংগীত হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা গানটি নির্বাচন করা হয়।

পাঁচদিন হরতালের পর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিতে এলেন।ততদিনে পুরো পূর্ব পাকিস্তান চলছে বঙ্গবন্ধুর কথায়।লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ভাষন শুনতে এসেছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আক্ষরিক অর্থে একটি জন সমুদ্র।বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষনে ঘোষনা করলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম ও এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ভাষন খুব বেশি দেয়া হয়নি। এই ভাষনটি সেদিন দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অকাতরে প্রাণ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার শক্তি জুগিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে একদিকে যখন সারাদেশে অসহযোগ আন্দলোন চলছে -অন্যদিকে প্রতিদিন দেশের আনচে কানাচে পাকিস্তান মিলিটারির গুলিতে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে।পাকিস্তান মিলিটারির গতি-বিধি থামানোর জন্য ছাত্র-শ্রমিক-জনতা পথে পথে ব্যারিকেড গড়ে তুলেছে।সারাদেশে ঘরে ঘরে কালো পতাকার সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে।দেশের ছাত্র জনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে ট্রেনিং নিচ্ছে।মাওলানা ভাসানী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় পরিস্কার ঘোষনা দিয়ে বলে দিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেন আলাদা করে তাদের শাসনতন্ত্র তৈরি করে কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে নেবে।

ঠিক এই সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণহত্যার প্রস্তুতি শুরু করে।সে বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠালো, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোন বিচারপতি তাকে গভর্নর হিসাবে শপথ করাতে রাজি হলেন না।ইয়াহিয়া খান নিজে মার্চের ১৫ তারিখ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার ভান করতে থাকে, এর মাঝে প্রত্যেক দিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনা হতে থাকে।যুদ্ধজাহাজে করে অস্ত্র এসে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে, কিন্তু জনগণের বাধার কারনে সেই অস্ত্র তারা নামাতে পারছিলনা।২১ মার্চ এই ষড়যন্ত্রে ভূট্টো যোগ দিল, সদলবলে ঢাকা পৌঁছে সে আলোচনার ভান করতে থাকে।১৯ মার্চ জয়দেবপুরে সেনারা বিদ্রোহ করে বসে।তাদের থামানোর জন্য ঢাকা থেকে যে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়, তাদের সাথে সাধারন জনগণের সংঘর্ষে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়।২৩ শে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস কিন্তু সেনবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট আর গভর্নমেন্ট হাউজ ছাড়া সারা বাংলাদেশে কোথাও পাকিস্তানের পতাকা খুজে পাওয়া গেল না।ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসাতেও সেদিন ও আমার সোনার বাংল্ল গানের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হলো।পরদিন ২৪শে মার্চ সারাদেশে একটি থমথমে পরিবেশ, মনে হয় এই দেশের মাটি, আকাশ, বাতাস আগেই গণহত্যার খবরটি জেনে গিয়ে গভীর আশঙ্কায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে ছিল।

গণহত্যার শুরু

গণহত্যার জন্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ তারিখটা বেছে নিয়েছিল, কারণ সে বিশ্বাস করত এটা তার জন্যে একটি শুভদিন। দুই বছর আগে এই দিনে সে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল।২৫ শে মার্চ রাতে বাংলাদেশের ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম গণহত্যার আদেশ দিয়ে সে সন্ধেবেলা পশ্চিম পাকিস্তানে যাত্রা শুরু করে দিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে

বলেছিলেন তিরিশ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা কর তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে। গণহত্যার নিখুঁত পরিকল্পনা অনেক আগে থেকে করা আছে, সেই নীল নকশার নাম অপারেশন সার্চলাইট, সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে কেমন করে আলাপ আলোচনার ভান করে কালক্ষেপন করা হবে, কীভাবে বাঙালী সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করা হবে, সোজা কথায়, কীভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

২৫ শে মার্চের বিভীষিকার কোনো শেষ নেই।পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এসে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আর জগন্নাথ হলের সব ছাত্রকে হত্যা করল।হত্যার আগে তাদের দিয়েই জগন্নাথ হলের সামনে একটি গর্ত করা হয়, যেখানে তাদের মৃত দেহকে মাটি চাপা দেয়া হয়।এই নিষ্ঠুর হত্যা কান্ডের দৃশ্যটি বুয়েটের প্রফেসর নুরুল উল্লা তার বাসা থেকে যে ভিডিও করতে পেরেছিলেন, সেটি এখন ইন্টারনেটে মুক্তিযুদ্ধের আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে।পৃথিবীর মানুষ চাইলেই নিজের চোখে সেটি দেখতে পারে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ছাত্রদের নয়-সাধারন কর্মচারী এমনকি শিক্ষকদেরকেও তারা হত্যা করে। আশেপাশে যে বস্তিগুলো ছিল সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে মেশিনগানের গুলিতে অসহায় মানুষগুলোকে হত্যা করে।এরপর তারা পুরানো হিন্দু প্রধান এলাকাগুলো আক্রমণ করে, মন্দিরগুলো গুঁড়িয়ে দেয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। যারা পালানোর চেষ্টা করেছে সবাইকে পাকিস্তান মিলিটারি গুলি করে হত্যা করেছে।২৫ শে মার্চ ঢাকা শহর ছিল নরকের মতো, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকে আগুন আর আগুন, গোলাগুলির শব্দ আর মানুষের আর্তচিৎকার।

অপারেশন সার্চলাইটের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা।পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি কমান্ডো দল এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আগেই খবর পেয়ে তিনি তাঁর দলের সব নেতাকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজে বসে রইলেন নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে।

স্বাধীন বাংলাদেশ

কমান্ডো বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাবার আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষনা করেন।সেই ঘোষনায় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে গেলেন। তাঁর ঘোষনাটি তৎকালীন ই.পি.আর-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। যখন ঘোষনাটি প্রচারিত হয় তখন মধ্যরাত পার হয়ে ২৬ শে মার্চ হয়ে গেছে, তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬ শে মার্চ।

শরণার্থী

২৫ শে মার্চের গণহত্যা শুরু করার পর বাংলাদেশে কেউই নিরাপদ ছিলনা, তবে আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থক আর হিন্দু ধর্মালম্বীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এরকম তরুণেরাও সেনাবাহিনীর লক্ষবস্তু ছিল। সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের মাঝে ছিল কমবয়সী মেয়েরা। সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বাংলাদেশের বিহারি জনগোষ্ঠীও বাঙালি নিধনে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের ভয়ংকর অত্যাচারে এই দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী পাশের দেশ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘ কিংবা নিউজ উইকের হিসেবে মোট শরনার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি।সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যাই ছিল মাত্র সাত কোটি- যার অর্থ দেশের প্রতি সাত জন মানুষের মধ্যে একজনকেই নিজের দেশ ও বাড়িঘর ছেড়ে শরনার্থী হিসেবে পাশের দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকার

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আকাঙ্ক্ষা এই দেশের মানুষের বুকের মাঝে জাগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে।স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে যে মানুষটি এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে ৩০ মার্চ সীমান্ত পাড়ি দেন। তখন তার সাথে অন্য কোনো নেতাই ছিলেন না, পরে তিনি তাঁদের সবার সাথে যোগাযোগ করে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করেন। এপ্রিলের ১০ তারিখ মুজিবনগর থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার সনদ ঘোষনা করা হয়। এই সনদটি দিয়েই বাংলাদেশ নৈতিক এবং আইনগতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।এই নূতন রাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা) বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে শপথ গ্রহন করে তাদের আনুষ্ঠনিক যাত্রা শুরু করে। তাদের প্রথম দায়িত্ব বাংলাদেশের মাটিতে রয়ে যাওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা।

পাল্টা আঘাত

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধগুলো ছিল পরিকল্পনাহীন এবং অপ্রস্তুত। ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধোরা নিজেদের সংগঠিত করে পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধাদের মতোই অবদান রেখেছিল, সেরকম প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহায্যে এই বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সেই সময়ের দেশের অনেক গান এখনো বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা আলাদা করে না বললে ইতিহাসটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তাঁদের সাহায্য সহযোগিতার জন্যই মুক্তিযুদ্ধোরা দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করতে পেরেছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারীরা মুক্তিযুদ্ধোদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন, এমনকি অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহন করে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন।

দেশদ্রোহীর দল

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো বন্ধু ছিল না, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিছু দেশদ্রোহী।বাংলাদেশের মানুষ এদের সবাইকে নির্বাচনে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই দেশদ্রোহী মানুষগুলো ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়ের উদ্দিন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম মুসলিম লীগের খান এ সবুর খান, জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আযম এবং নেজামে ইসলামীর মৌলভী ফরিদ আহমেদ।এদের মাঝে জামায়াতে ইসলামী নামের রাজনৈতিক দলটির কথা আলাদা করে বলতে হয়।পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে রাজাকার বাহিনী তৈরী করা হয়েছিল- সেটি ছিল মূলতঃ জামায়াতে ইসলামীরই সশস্ত্র একটি দল।

দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রবাসী অনেক বাঙালি মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করেছেন। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্যে টাকা তুলেছেন, পাকিস্তানের গণহত্যার কথা পৃথিবীকে জানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরী করেছেন।

পক্ষের দেশ বিপক্ষের দেশ

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার কথা পৃথিবীতে প্রচার হওয়ার পর পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেরই সমবেদনা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল, তবে দু'টি খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তানের পক্ষে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে কাজ করেছে।একাত্তরে যদিও ইসলামের নামে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলমানকেই হত্যা করা হচ্ছিল,তার পরেও পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশও পাকিস্তানের পক্ষে থেকে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। যদিও রাজনৈতিক কারনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে ছিল কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার দৃশ্য দেখে সে সময়কার মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্চার কে. ব্লাড ক্ষুব্ধ হয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টে যে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন সেটি কূটনৈতিক জগতে সবচেয়ে কঠিন ভাষায় লেখা চিঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।স্বাধীনতা সংগ্রামের একেবারে শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সপ্তম নৌবহর যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও নিউক্লিয়ার ক্ষমতাধারী যুদ্ধজাহাজ এই এলাকায় রওনা করিয়ে দিয়েছিল। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটি সত্যি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের দুই পরাশক্তি নিউক্লিয়ার অস্ত্র নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথবাহিনীর জয় একেবারে সুনিশ্চিত তখন সেই বিজয়ের মুহূর্তটিকে থামিয়ে দেবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে এ প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে আমাদের বিজয়ের পথ সুনিশ্চিত করেছিল। তবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে দেশটির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই দেশ হচ্ছে ভারত। এই দেশটি প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ আর আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয় ।এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় দেড়হাজার সৈনিক প্রাণ দিয়েছিল।

যৌথবাহিনী

জুলাই মাসের শুরুর দিকে নূতন করে যুদ্ধ শুরু হয়। অক্টোবর মাসের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দেখতে দেখতে শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্ডার আউটপোস্টগুলো নিয়মিতভাবে আক্রমণ করে দখল করে নিতে শুরু করে।গেরিলাবাহিনীর আক্রমণও অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই আক্রমণের জবাব দিত রাজাকারদের নিয়ে গ্রামের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে আর স্থানীয় মানুষদের হত্যা করে । ততদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তারা আর সহজে তাদের ঘাঁটির বাইরে যেতে চাইত না।

বাংলাদেশের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখতে দেখতে এত খারাপ হয়ে গেল যে পাকিস্তান তার সমাধান খুঁজে না পেয়ে ডিসেম্বরের তিন তারিখ ভারত আক্রমণ করে বসে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ আক্রমণ করে ভারতের বিমানবাহিনীকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেবে কিন্তু সেটি করতে পারল না। ভারত সাথে সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে তার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ভেতর তখন পাকিস্তানের পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন। যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আক্রমণের জন্য তিনগুন বেশি অর্থাৎ ১৫ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা মাত্র আট ডিভিশন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করার সাহস পেয়েছিল। কারন তাদের সাথে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনী। সেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এর

মাঝেই পুরোপুরি অচল করে রাখতে পেরেছিল। শুধু যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তা নয়, এই যুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষও ছিল যৌথবাহিনীর সাথে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর সেটি চলেছে মাত্র তের দিন। একেবারে প্রথমদিকেই বোমা মেরে এয়ারপোর্টগুলো অচল করে দেবার পর পাকিস্তান এয়ারফোর্সের সব পাইলট পালিয়ে গেল পাকিস্তানের সমুদ্রে যে কয়টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ ছিল সেগুলো ডুবিয়ে দেবার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাকি রইল তার স্থলবাহিনী- নিরীহ জনসাধারণ হত্যা করতে তারা অসাধারণ পারদর্শী, কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধে কেমন করে, সেটি দেখার জন্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যুদ্ধ শুরু হবার পর একটি একটি করে পাকিস্তানের ঘাঁটির পতন হতে থাকল। তারা কোনমতে প্রাণ নিয়ে অল্পকিছু জায়গায় মাটি কামড়ে পড়ে রইল।ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঢাকার কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে যায়। মেঘনা নদীতে কোনো ব্রিজ ছিলনা, সাধারণ মানুষ তাদের নৌকা দিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের ভারী অস্ত্র পার করিয়ে আনল।

ঢাকায় জেনারেল নিয়াজী এবং তার জেনারেলরা বাংলাদেশের যুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে যে দুটি বিষয়ের উপর ভরসা করছিল, সেগুলো ছিল অত্যন্ত বিচিত্র।প্রথমত তারা বিশ্বাস করত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে তারা ভারতকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করবে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর সরে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকবেনা। দ্বিতিয়ত, যুদ্ধে তাদের সাহায্য করার জন্য উত্তর দিক থেকে আসবে চীনা সৈন্য আর দক্ষিণ দিক থেকে আসবে আমেরিকান সৈন্য।কিন্তু দেখা গেল তাদের দুই ধারনাই ছিল পুরোপুরি ভুল। পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানিরাই চরমভাবে পর্যুদস্ত হলো আর কোন চীনা বা আমেরিকান সৈন্য তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো না।

আত্মসমর্পণ

মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান করল। গভর্নর হাউসে বোমা ফেলার কারনে তখন গভর্নর মালেক আর তার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে হোঠেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান শেরাটনে) আশ্রয় নিয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ লিফলেট ফেলেছে, সেখানে লেখা -মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর।

ঢাকার পরম পরাক্রমশালী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল।আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথাটি দেখে একজন পাকিস্তানি জেনারেল দুর্বলভাবে একবার সেখান থেকে বাংলাদেশের নামটি সরানো প্রস্তাব করেছিল কিন্তু কেউ তার কথাকে গুরুত্ব দিল না, ইতিহাসে সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।১৬ই ডিসেম্বর বিকেল বেলা রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের সামনে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেয়ার দলিলে স্বাক্ষর করল।যে বিজয়ের জন্য এই দেশের মানুষ সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করছিল সেই বিজয়টি এই দেশের স্বজন হারানো সাতকোটি মানুষের হাতে ধরা দিল। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানের সব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে শেষ করতে করতে ডিসেম্বরের ২২ তারিখ হয়ে গেল।

বিজয়ের আনন্দে দুঃখের হাহাকার

পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করার পর বিজয়ের অবিশ্বাস্য আনন্দ উপভোগ করার আগেই একটি ভয়ংকর তথ্য সকলকে স্তম্ভিত করে দিল।ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যখন সবাই বুঝে গেছে এই যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী , সত্যি সত্যি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজে স্থান করে নিচ্ছে, তখন এই দেশের বিশ্বাসঘাতকের দল আলবদর বাহিনী দেশের প্রায় তিনশত শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক বিজ্ঞানীকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁদের উদ্ধার করার জন্য দেশের মানুষ যখন পাগলের মত হন্যে হয়ে খুঁজছে তখন তাদের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ রায়ের বাজার বধ্যভূমি এবং অন্যান্য জায়গায় খুঁজে পাওয়া যেতে থাকল। দেশটি যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়ে যায় তারপরেও যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেই ব্যাপারটি এই বিশ্বাসঘাতকের দল নিশ্চিত করে যাওয়ার জন্য এই দেশের সোনার সন্তানদের ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে।

আমাদের অহংকার

আমাদের মাতৃভূমির যে মাটিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ওপরে তাকালে যে আকাশ আমরা দেখতে পাই কিংবা নিঃশ্বাসে যে বাতাস আমরা বুকের ভেতর টেনে নেই, তার সবকিছুর জন্যই আমরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ঋণী।সেই ঋণ বাঙালি জাতি কখনোই শেষ করতে পারবে না। বাঙালি কেবল তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করার একটুখানি সুযোগ পেয়েছে, তাঁদেরকে বীরত্বসূচক পদক দিয়ে সম্মানিত করে।

নোটসমূহ ঃ

অনুশীলন- ১০: "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" এর ব্যবহার কৌশল।

উদ্দেশ্য: শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি উন্নয়নের জন্য "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহের"

প্রক্রিয়া:

- শুরুতেই সহায়কগণ এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করবেন।
- সহায়কগণ অংশগ্রহণকারীদের "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" এর ব্যবহার কৌশল সম্পর্কে দলীয় আলোচনা করতে দেবেন।
- সহায়কগণ অংশগ্রহণকারীদের অঞ্চলভিত্তিক দলে বিভক্ত করবেন। প্রত্যেক অঞ্চলেরই একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং কিছু আঞ্চলিক অভিন্নতা রয়েছে। যার মধ্যে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভিন্নতা থাকতে পারে। তাই "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" এর ব্যবহারের জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে দলীয়ভাবে অঞ্চলভিত্তিক কৌশল নির্ধারণ করতে অনুরোধ করা হবে।
- দলীয় আলোচনা।
- দলীয় আলোচনার সময় সহায়ক প্রত্যেক দলে ফ্লিপ চার্ট ও কলম সরবরাহ করবেন। দলীয় আলোচনার জন্য এক ঘন্টা সময় দেয়া হবে।
- দলীয় প্রতিবেদন তৈরী এবং বড় দলে উপস্থাপন।

আলোচনার দিকসমূহ:

- সমাজে শান্তি সম্প্রীতি পূণঃ প্রতিষ্ঠার জন্য "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" এর ব্যবহার কৌশলসমূহ নির্ধারণ।
- আমাদের "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহকে" বর্তমান সমাজে জনপ্রিয়, সমৃদ্ধ এবং সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নির্ধারণ।
- "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" এর ব্যবহার কৌশলসমূহ নির্ধারণের পর সকলের অভিজ্ঞতার সহভাগিতা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

- ফ্লিপ চার্ট, মার্কার কলম, পেন্সিল, মাস্কিং টেপ, ইত্যাদি।

সময় :

২ ঘন্টা।

সহায়কদের জন্য নোটঃ

এই অনুশীলন থেকেই তৃণমূল পর্যায়ে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" এর ব্যবহার কৌশল নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হ'লো। অনুশিলনের শুরুতেই সহায়কদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'লো- পূর্বের ৯টি অনুশীলনের একটি সার-সংক্ষেপ অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করা। সহায়কগণ ধাপে ধাপে পূর্বের অনুশীলনগুলির আলোচ্যবিষয় ও প্রক্রিয়া উপস্থাপন করবেন- এটা খুবই জরুরী। এই কাজ শেষ হলে অংশগ্রহণকারীরা "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" এর ব্যবহার কৌশল নির্ধারণের গুরুত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবে। একটি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" যে একটি ফলপ্রসূ অস্ত্র তা অংশগ্রহণকারীরা অনুধাবন করতে পারবে। প্রশিক্ষণার্থী বা অংশগ্রহণকারীদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" অনুধাবন করার জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা একমাত্র পদ্ধতি নয়। এর জন্য সহায়ক গন্থসমূহ ও জার্নাল ইত্যাদি পাঠ করতে হবে এবং প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনপ্রনালী থেকে শিখতে হবে।

অনুশীলনের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক অঞ্চলেরই একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচিতি এবং অভিন্ন একক প্রথা ও রীতি-নীতি আছে। সংস্কৃতির অঞ্চলভিত্তিক এই অভিন্নতা ও ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতিকে আমাদের সর্বদাই শ্রদ্ধা করতে হবে। তাই অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন দল তাদেও অঞ্চলের নিজস্বতা ও প্রচলন অনুসারে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্যসমূহ" এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করতে পারে।

সহায়কগণ অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, সকল প্রকার সামাজিক উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা এবং দ্বন্দ্ব সংঘাত দেশের বা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে উৎপাদিত ফলাফল। সামাজিক উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা এবং দ্বন্দ্ব সংঘাতের ধরণ বা বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা থাকলেও এর মূল কারণ ঐ একই। আদিবাসী সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণ বৈষম্য, জেন্ডার বৈষম্য, জাত-পাত নিয়ে সংঘাত, বংশমর্যাদার দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি সবকিছুর মূলেই রয়েছে বর্তমান রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কুটকৌশলী চক্রান্ত। এসময় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা সহায়কদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, তাহলে আমরা সমাজের উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা এবং দ্বন্দ্ব সংঘাত কমাতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সম্প্রীতির উন্নয়নে সরাসরি বর্তমান ঘুনে ধরা রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার মোকাবেলা করছি না কেন? কেনইবা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সম্প্রীতির উন্নয়নে "কম্পোজিট হেরিটেজকে" টুল্‌স হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস চালাচ্ছি? এসময় অংশগ্রহনকারীদের বলতে হবে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সম্প্রীতির উন্নয়নে রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আমাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য বা স্বপ্ন। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন টুলস্ ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। দীর্ঘদিন শান্তির পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" একটি ফলপ্রসূ পথ বা টুল্‌স মাত্র।

দলকে প্রথমতঃ তাদের নিজেদের অঞ্চলের বা এলাকার সুনির্দিষ্ট কোন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে বলা হবে। এরপর তারা ঐ সুনির্দিষ্ট অবস্থার উপর ভিত্তি করে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এর ব্যবহার কৌশল নির্ধারণে এগিয়ে যাবে। এভাবেই তাদের দলীয় আলোচনা করতে উৎসাহিত করতে হবে, কারণ তারা তাদের নিজেদের অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট অবস্থার আলোচনায় যতটা গভীরে যেতে পারবে, তাদের পক্ষে "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এর ব্যবহার কৌশল নির্ধারণ ততটাই পরিচ্ছন্ন হবে।

সহায়কগণ কখনই এই দলীয় উপস্থাপনা একত্রিত করার চেষ্টা করবেন না। সকল দলের উপস্থাথেকে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যেক দল নিজেরাই নিজেদের "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এর কৌশল যে ব্যবহার উপযোগী হয়েছে তা দেখার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই। একই সময়ে অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে হবে যে, "কম্পোজিট হেরিটেজ বা বিমিশ্র ঐতিহ্য" এর ব্যবহার কৌশল যতটা নমনীয় হবে, তা বাস্তবায়নের সাফল্যও ততটা বেশী হবে। এখানে প্রশিক্ষণ সহায়কদের তেমন কোন দিক-নির্দেশনা বা জ্ঞানের যোগান দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই।

নোটসমূহ ঃ

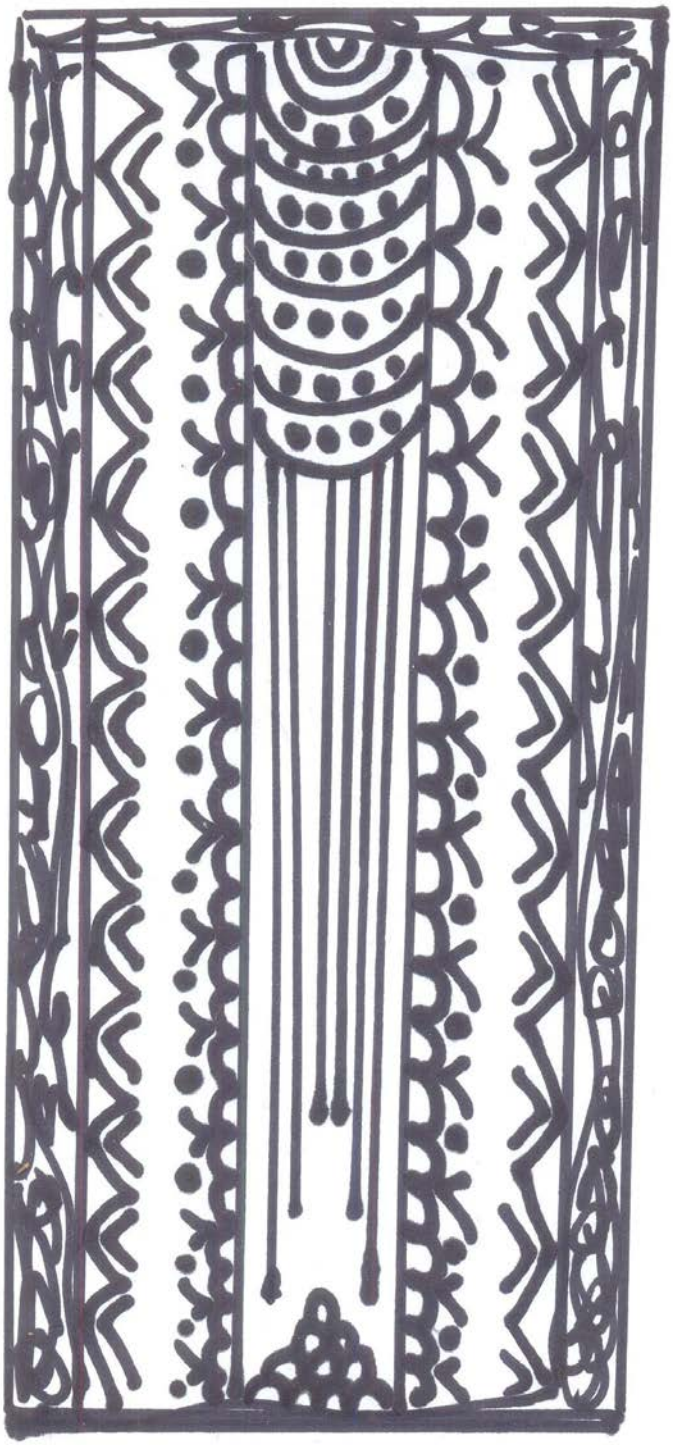

পরিশিষ্ট- ২

এক নজরে কিছু দৃশ্যপটঃ

১. উৎসব, ২. পোশাক-আশাক, ৩. টেক্সটাইল, ৪. লোক বাদ্যযন্ত্র, ৫. হস্তশিল্প, ৬ স্মৃতিসৌধ।

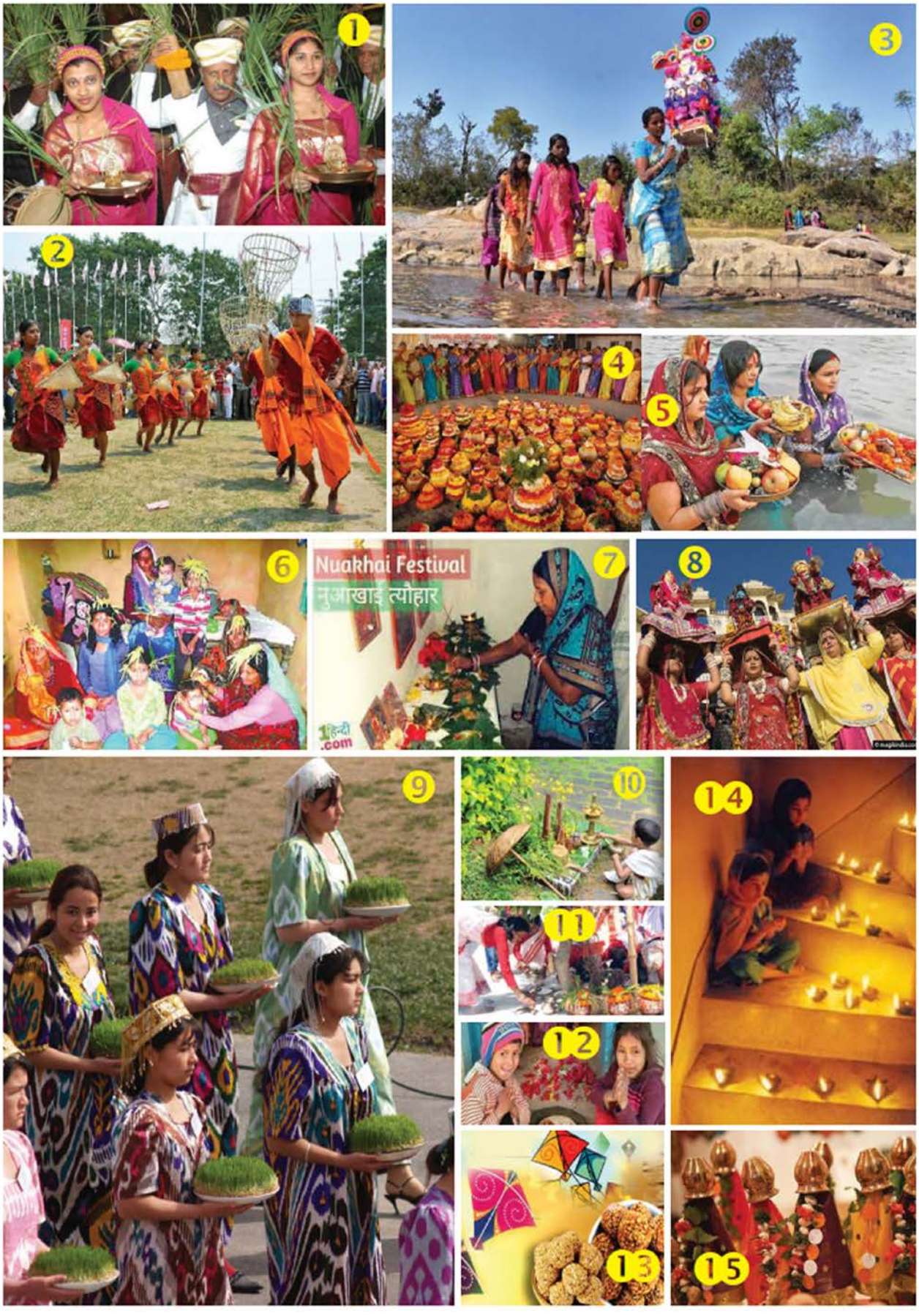
1
2
3
4
5
6
Nuakhai Festival
नुआखाई त्यौहार
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
5
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

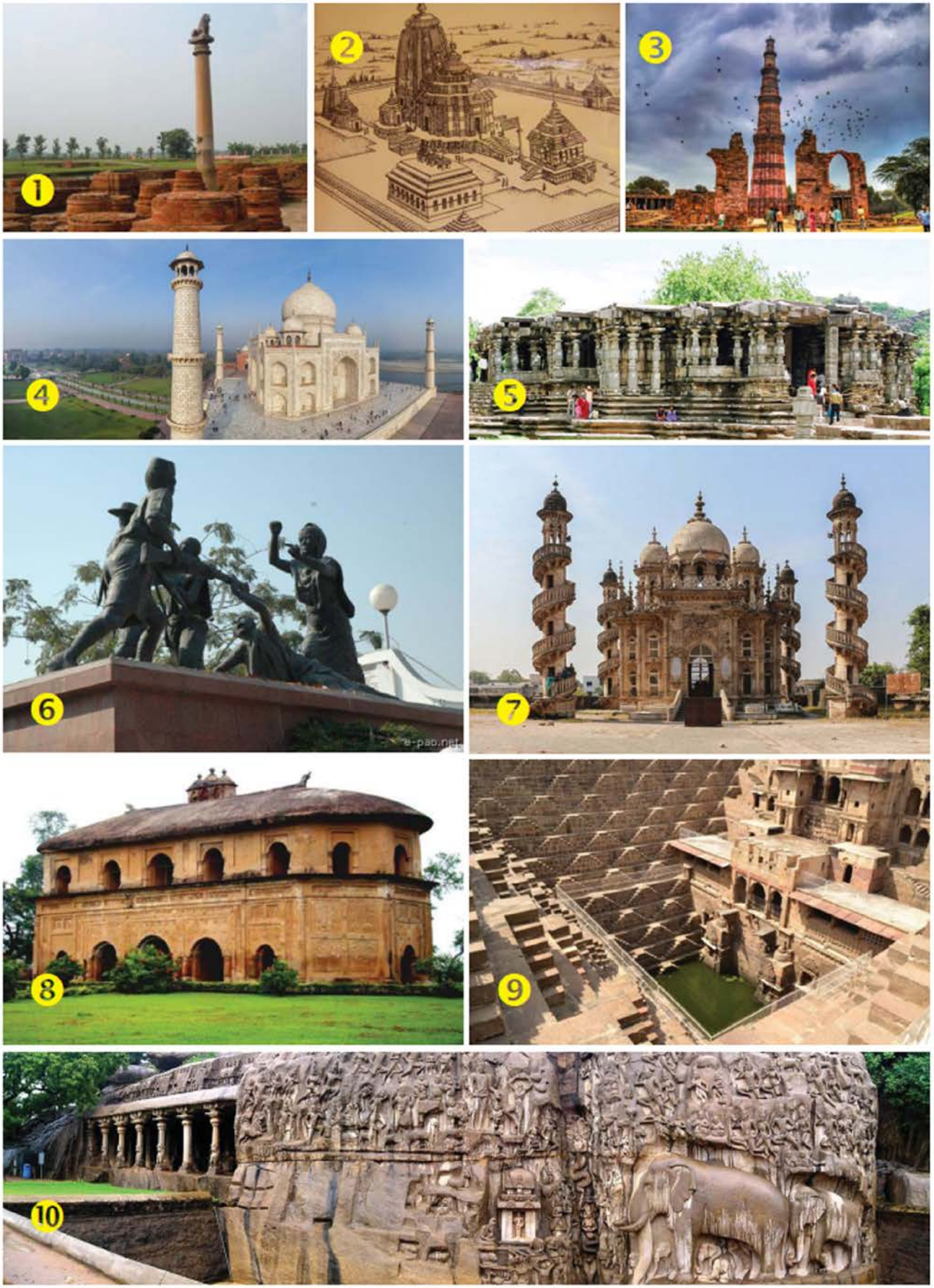
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

দৃশ্যপটের বর্ণনা ঃ

একনজরে ১. উৎসব	একনজরে ২. পোশাক-আশাক	একনজরে ৩. টেক্সটাইল
১. পটারী, কেরালা	১. কুর্গি শারি, কার্নাটক	১. একাত টেক্সটাইল
২. বিহু, আসাম	২. আভা, গুজরাট	২. সাম্বালপুরি, উড়িষ্যা
৩. তুসু, ঝারখন্ড	৩. মুসলিম মহিলাদের প্রথাগত পোশাক, কেরালা	৩. আজরেখ, সিন্ধ, পাকিস্তান
৪. বোনালু, তেলেঙ্গানা	৪. ত্রিপুরার প্রথাগত পোশাক	৪. বাগরু, রাজস্থান
৫. ছাথ পুজা, বিহার ও ঝারখন্ড	৫. পার্সি পোশাক	৫. ছানদেরী, মধ্যপ্রদেশ
৬. হারেলা, উত্তরাখান্ড	৬. স্বামী- স্ত্রীর প্রথাগত পোশাক, গুজরাট	৬. বাটিক টেক্সটাইল
৭. নোয়াখাই উৎসব, উড়িষ্যা	৭. স্বামী- স্ত্রীর প্রথাগত পোশাক, মারোয়ারী	৭. বন্ধনী, গুজরাট
৮. ঘাংগুর, রাজস্থান	৮. মেখালা, আসাম	৮. লেহেরিয়া, রাজস্থান
৯. নাভরোজ, পারস্যের নববর্ষ	৯. ফেরান, কাশ্মির	৯. টান্ট, বেঙ্গল
১০. ওনাম, কেরালা	১০. ইারী-পুরুষের প্রথাগত পোশাক, কেরালা	১০. ফুল গামছা
১১. গারহুল, ঝারখান্ড	১১. কুর্তি ও লেহেঙ্গা, পাঞ্জাব	১১. নর্থ-ইস্ট টেক্সটাইল
১২. ফুলদেই, উত্তরাখন্ড	১২. মনিপুরি পোশাক	১২. মহেশ্বরী টেক্সটাইল, গুজরাট
১৩. মকর সংক্রান্তি	১৩. বিভিন্ন ধরণের পোশাক	১৩. কালামকারী, অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানা।
১৪. সবে-বরাত	১৪. গেরারা	
১৫. গুড়ি পদ্ম, মারাঠি নববর্ষ		

একনজরে ৪. লোক বাদ্যযন্ত্র	একনজরে ৫. হস্তশিল্প	একনজরে ৬. স্মৃতিসৌধ
১. কর্তাল	১. বেনারশী শাড়ি	১. অশোকা পিলার, পাটনা, বিহার
২. একতারা	২. কাতরি	২. সুর্য মন্দির, কোনার্ক, উড়িষ্যা
৩. সান্াই	৩. কালামকারী	৩. কুতুব মিনার, দিল্লী
৪. নাগরা	৪. বাঁশের হস্তশিল্প	৪. তাজমহল, আগ্রা
৫. আলগোজা	৫. আদিবাসী হস্তশিল্প	৫. থোশান্ত পিলার টেম্পল, তেলেঙ্গানা
৬. মানদিরা	৬. পাত্তলী ঝুটি ও কোলাপুরি চপ্পল	৬. নুপি লেন, মনিপুর
৭. ধুপ	৭. কুমহার	৭. মুহাব্বত মাকবারা, জুনাগদহ, গুজরাট
৮. পেপা	৮. হাতের তৈরী চটের ব্যাগ	৮. রং ঘর, শিব সাগর, আসাম
৯. খঞ্জরী	৯. ব্লক প্রিন্টিং	৯. চান্দ বাউরী, রাজস্থান
১০. ডমরু	১০. চরকা	১০. ভগিরথ পেনান্স, মহাবলিপুরম, চেন্নাই।
১১. বীন	১১. দরি হ্যান্ডলুম	
১২. ঘাতাম	১২. বাঁশের শিল্প	
১৩. মাদল	১৩. খুরজা পটারী	
১৪. তামবুরা	১৪. কাঁদা মাটির কাজ	
১৫. রাবন হাতা	১৫. পুতুল নাচ	
	১৬. আলিগরের তালা	

নোটসমূহঃ

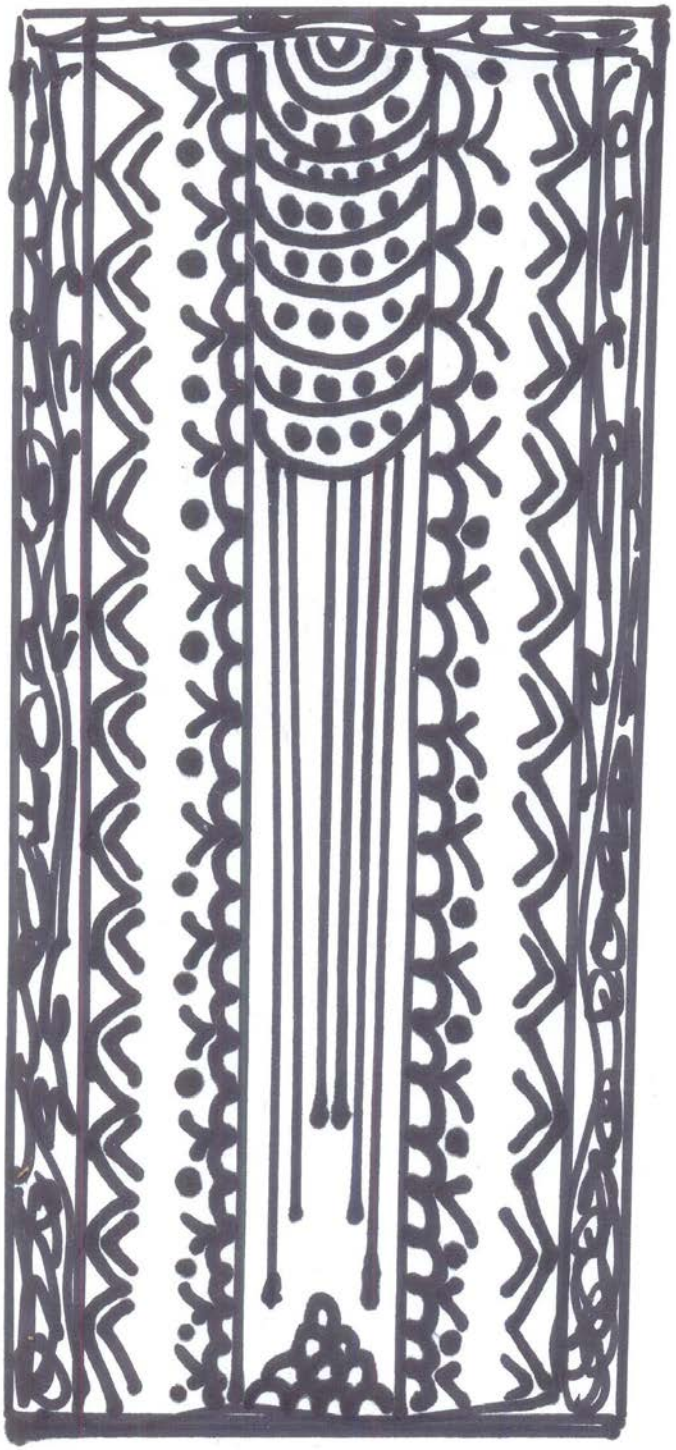

পরিশিষ্ট- ৩
সংযোজিত বিষয়।

পাঠ্য উপকরণ ১ : দ্রাবীড়ীয় সংমিশ্রিত উত্তরাধিকার।

এই পরিভাষার উপলব্ধি

অক্সফোর্ড এ্যাডভান্সড লার্নিং ডিকসনারী অনুযায়ী হেরিটেজ এর অর্থ ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং গুণাগুণ, যা একটা দেশ বা সমাজ অনেক বছরব্যাপী ধরে আছে। যার ফলে সেগুলো তার চরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচিত হয়। আবার কম্পোজিট অর্থ হ'লো বিভিন্ন অংশ বা দ্রব্যের মিশ্রনে গঠিত পদার্থ।

দ্রাবীড়ীয় লোকসমাজ ঃ

১) উৎপত্তি ও ইতিহাস-

দ্রাবিড় জাতির উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টিকোন আছে। তামিলদের মতে দ্রাবিড় জাতি দক্ষিণ ভারতের জলমগ্ন এক দ্বীপ 'কুমারী কান্দম' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। কুমারী কান্দম লিমুয়িয়ার সঙ্গে যুক্ত। ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে জানা যায় যে, দ্রাবিড় জাতি ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় এক অতি উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

দ্রাবিড় নামটি ভারতের ভাষাগত দলের লোকদের জন্য রাখা হয়েছিল। তাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তারাই প্রাচীন ভারতের উৎপত্তিগত দিক দিয়ে প্রথম ঔপনিবেশিক জাতি। এই দল প্রধানত: ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্ণের লোকদের নিয়ে গঠিত।

২) দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা-

দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা যা সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত, বর্তমানে যে স্থান পাকিস্তানের অংশ। এই সভ্যতা যা ১০০০ বছর পর্যন্ত চলেছে, যা হরপ্পার সভ্যতা নামে পরিচিত। সেটা হাজার বছর আগের উপনিবেশ। বিস্তৃতভাবে ভূখননের ফলে এটা নির্দেশ করা হয়েছে যে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ বছরের পূর্বে স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ হয়েছে যে, এই স্থানটি সিন্ধু উপত্যকার নীচের অংশ।

প্রধান শহরগুলি যেমন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা, যেগুলি ১৯২০ সালে পাকিস্তানে আবিস্কৃত হয়েছে। ভারতের আহমেদাবাদ অঞ্চলে লোথালে রাস্তাগুলি যথাযথ পরিকল্পনা অনুযায়ী ছিল। গ্রীসের শহরে বিশেষ করে এথেন্স শহরে দূর্গের মত স্থাপনা ছিল, যেগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির স্থান নির্দেশ করত। মহেঞ্জোদারোর যে বিরাট পুকুর ছিল, সেটি হয়তো ধর্মাচরণ পদ্ধতি অনুযায়ী স্নানের জন্য ব্যবহৃত হত।

সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনে শত শত শহর ছিল, যার মধ্যে কিছু শহরে ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ লোক বাস করত। সেই শহরগুলিতে উন্নত সভ্যতা বিরাজ করত। প্রতিটি গৃহে স্নানঘর ছিল এবং প্রত্যেক শহরে পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতি ছিল। গৃহগুলি পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরী ছিল। যদিও মাঝে মাঝে সূর্যে পোড়া ইটও ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু কিছু গৃহ বিরাট ম্যানসন আকারে তৈরী হয়েছিল, যাতে অনেক কামরা ছিল। অন্যগুলি ছোট ছোট বাড়ী, যেখানে গরীব লোকেরা এবং হস্তশিল্প কর্মীরা থাকত। কিছু গৃহ দূর্গের আকারে ছিল, যাতে মনে হয় সেখানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। যারা শাসন করত তাদের শহরগুলি ছিল বিরাট আকারের। লোথালে একটা পোতাশ্রয় ছিল, যেখানে ৫০ টি সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। এই জাজে করে লোকেরা দূর দেশে এমন কি মিশর দেশেও বানিজ্য করতে যেত।

৩) দ্রাবিড়ীয় বিখ্যাত দল

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের ব্রাহুইসরা যারা বেশীরভাগ ছিল মুসলমান। গন্দক যারা মধ্য ও উত্তর ভারতের আদিবাসী লোক ছিল। কাল্লদিগারা, মালয়ালাম, তামিল যারা শ্রীলংকা এবং তামিলনাড়ুতে এবং তেলেগুরা-এরাই ছিল দ্রাবিড়ীয় দল ছিল।

৪) দ্রাবিদড়ীয় ভাষা

দ্রাবিড়ীয়দের প্রায় ২৬ রকমের ভাষা ছিল, যেগুলি সাধারণত দক্ষিণ ভারতের ২০০ মিলিয়ন লোক ব্যবহার করতো, যার ফলে দ্রাবিড় ভাষা পৃথিবীর মধ্যে ৪র্থ বৃহত্তম ভাষা বলে ব্যবহৃত। সেগুলির মধ্যে কানাডা, মালায়ালাম, তামিল এবং তেলেগু অন্যতম। ভারতের ২৪% লোক এখনও দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করে।

এখনও দ্রাবিড়ীয় ভাষা পাকিস্তানের কোন কোন স্থানে, নেপাল, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা এবং ইরানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, কানাডা, ইউ.এস.এ এবং ইউকে এর বিভিন্ন স্থানে দ্রাবিড়ীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়।

দ্রাবিড়ীয়দের একটা জটিল ধরণের লিখন পদ্ধতি আছে। মাটির ছাপের ওপর উৎকীর্ণলিপি দেখলে এটা প্রকাশ করে যে, তখনকার লেখশিল্প এটা অনুশীলন করত। দ্রাবিড়ীয় ছাপার অক্ষরের গুপ্ত সংকেতগুলি এখনও উদ্ধার করা যায় নি। কারণ এর জন্য কোনও সংকেত পদ্ধতি পাওয়া যায় নি, তাই ছাপার অক্ষরের গুপ্ত সংকেতগুলির সম্পূর্ণ অর্থ এবং তাৎপর্য এখনও বোঝা যায় নি। কিন্তু কিছু ছাপার অক্ষরগুলি দেখে বোঝা যায় যে, তারা গুনতে ও মাপতে পারত। দ্রাবিড়ীয় ভাষার একটা সংরক্ষিত ইতিহাস আছে, যা ২,০০০ বছরেরও পুরানো।

৫) দ্রাবিড়ীয় সাহিত্য

দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়ীয় যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, তার এক প্রাচীন ইতিহাস সম্বলিত সাহিত্য আছে। এতে যে চারটি প্রধান ভাষা ব্যবহার করা হয়, সেগুলি হল, তামিল, তেলেগু, কানাডা, এবং মালয়েশিয়ায়।

প্রাচীন উচ্চাঙ্গ ধরনের তামিল সাহিত্য দুই ধরনের কবিদের দ্বারা লিখিত হয়েছিল। একজন লিখেছিল রোমাঞ্চকর কবিতা। অন্য দল রাজাদের বীরত্বে এবং মহিমা বর্ণনা করে এবং জল ও মদের বিষয়ে লিখেছিল। সঙ্গম উচ্চাঙ্গ সংগীত লেখা হয়েছিল খ্রীঃপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে এবং তা লিখেছিলেন ৪৭৩ জন লেখক, যার মধ্যে ৩০ জন মহিলা লেখিকা ছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন আভৈয়ার।

দু'টো মহাকাব্য- যার নাম ছিল শিল্প পাধিকরম এবং মনিমেগালাই, যেগুলো ২০০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে তিরুভাল্লিভাব থিরুক্কুরাল লিখেছিলেন, যার মধ্যে দিয়ে মহান জীবনযাত্রা সম্মন্ধে লেখা হয়েছিল।

ঈশ্বরভক্তি সম্বন্ধীয় ধর্মীয় সাহিত্য তামিল ভাষায় ৬০০ খ্রষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। একদল তামিল কবি যাদের নায়ানারস বলা হত, তারা শিব দেবতার ভক্ত ছিল। আর এক দল যাদের আলওয়ার বলা হ'ত তারা ছিল বিষ্ণু দেবতার ভক্ত। এই দুইদলের কবিতার মধ্যে একটা গভীর ব্যক্তিগত গুণ ছিল, যার মধ্যে মহিলা কবিরাও ছিলেন।

অন্য দ্রাবিড়ীয় ভাষা একইরকম মূলসুর অনুসরন করেছিল। তারা তামিল ও সংস্কৃত ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তামিল সাহিত্য প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করেছে। অন্যদিকে কানাডা সাহিত্য জৈন ধর্ম দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় উত্তর ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যের অনেক আগে উৎপত্তি হয়েছে।

৬) দ্রাবিড়ীয় ধর্ম

মাটির যে মূর্তিগুলি হরপ্পাতে আবিস্কৃত হয়েছিল তা প্রমাণ করে যে, দ্রাবিড়ীয়রা প্রধানত এক দেবীমাতাকে পূজা করত। যা পরে কালিমাতাকে চিহ্নিত করেছে। দ্রাবিড়ীয়দের মধ্যে স্ত্রী মূর্তি পূজা খুব প্রচলিত ছিল।

টেরাকোটা স্থাপত্যের মধ্যে স্ত্রীমূর্তীই খোদিত ছিল, যা হয়তো সেই দেবীই হবে। হয়তোবা তারা উর্বরতা দেবী হবে, যার পূজারীরা স্বাস্থ্যবান সন্তান এবং ভাল ফসলের আশা করত।

আরও দক্ষিণে মরিয়াম্মা, ইয়েলাম্মা, কামা, মোরাসাম্মা, মাতঙ্গী, সোলম্মা এবং মুসাম্মায় এখনও স্ত্রীরূপকে পূজা করার একটা জনপ্রিয় প্রথা।

দ্রাবিড়ীয় ধর্ম প্রাকৃতিক জিনিষের মধ্যে স্বর্গীয় রূপ খুঁজে পেত এবং প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে অধিভৌতিক উপস্থিতি অনুভব করত। গাদ, নিশ্চল প্রস্তর, প্রকৃতি এগুলি সবই ছিল দ্রাবিড়ীয় পূজার অংশ। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন, পৃথিবী, আগুন, বাতাস, জল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব কিছুই তারা পূজা করত। দ্রাবিড়ীয় ধর্মের অখণ্ড অংশ ছিল পূর্বপুরুষের পূজা। টোকেমিজম বা বৃক্ষ, জন্তু ইত্যাদি যে মূর্তি অনগ্রসর জাতিরা কুসংস্কারবশে পূজা করে, তা কোন নির্দিষ্ট দল বা পরিবারের জন্য পূজা করার জন্য বিশেষ চিহ্ন ছিল।

জীজন্তুর পুজাও প্রচলিত ছিল, কুঁজসহ বৃষ মূর্তিকে তারা পূজা করত। মাটির সীল বা ছাপে জীবজন্তুর মূর্তি যেমন হাতি, কুমীর এবং অন্য জন্তুর মূর্তিও থাকত, যার অর্থ দ্রাবিড়ীয় ধর্মে জীবজন্তুর সম্মান করা। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

৭) দ্রাবিড়ীয় মেলা এবং উৎসব

দক্ষিণ ভারতীয় সব রাজ্য (তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপদেশ, তেলেঙ্গনা, কর্নাটক এবং যুক্তরাজ্য যাকে পুডুচেরী বলা হয়) তারা জাতীয় উৎসবগুলি পালন করে। কিন্তু যখন আমরা প্রথাগত উৎসবের কথা বলি তখন এটা ভিন্ন। তামিলনাড়ু এবং পুডুচেরী চারদিনের জন্য পোঙল উৎসব পালন করে। এটা একটা কৃতজ্ঞতার পর্ব, যা তারা মধ্য জানুয়ারীতে পালন করে। এই রাজ্যের লোকেরা কৃষিভূমিকে এবং পশুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আবার একই সঙ্গে ভাল শস্যের জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করে। কেরালার লোকেরা 'ওনাম' পর্ব তাদের সর্বশক্তিমান রাজা মহাবলীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পালন করে। তারা তাদের বহিঃপ্রাঙ্গণ ফুল দিয়ে সাজায়। বিশেষ ও পরম আনন্দজনক খাদ্য তৈরী করে এবং একে অন্যকে উপহার আদান প্রদান করে। মকর সংক্রান্তি ও পোঙল উৎসবের মধ্যে মিল আছে, যা অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গনা রাজ্যে পালিত হয়। কর্নাটকের মহীশূরে 'দশেরা' উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অদ্বিতীয় যা 'চামুণ্ডেশ্বরী' দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এগুলো ছাড়াও তারা অন্য উৎসবও পালন করে যেমন তামিলনাড়ু নববর্ষ 'উগাণ্ডি', রমজান' ক্রিসমাস, কারাগা, আদি পেরুক্কু বিসু ইত্যাদি।

৮) দ্রাবিড়ীয় শিল্প বানিজ্য

দ্রাবিড়ীয়রা হস্তশিল্পে বেশ পারদর্শী ছিল। যার মধ্যে চীনামাটির পাত্র, স্থাপত্য, ধাতুর কাজ এবং কাঁচের জিনিষ উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু সভ্যতা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মেসোপটেমিয়া সভ্যতার মধ্যে প্রচুর মিল আছে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে উত্তর পশ্চিম ভারত এবং পারস্য সাগরের মধ্যে সমুদ্র বানিজ্যের সম্পর্ক ছিল।

বানিজ্য দ্বারা দ্রাবিড়ীয় লোকেরা প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল, যেমন- কাঠের তক্তা, কাঁচা তুলা, রং, ধাতু এবং কাঁচ এগুলো আদান প্রদান করত।

৯) দ্রাবিড়ীয় খেলাধূলা ও মার্শাল আর্ট

কাবাডি, খো- খো এবং গৃহপালিত পশুপাখীর খেলা দ্রাবিড়ীয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। তামিনাড়ুর জালিকাট্ট খেলার একটা লম্বা ইতিহাস আছে। ১৯৩০ সালে যে স্থাপত্য ও ধ্বংসাবশেষ মহেঞ্জোদারোর খনন কার্যের ফলে আবিস্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে এই খেলার প্রমান পাওয়া যায়। এটা খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০-১০০ অব্দের সঙ্গম সাহিত্যেও উল্লেখিত হয়েছে। অন্য রাজ্যের খেলাধূলার মধ্যে কেরালার নাদান পশু বলি (বৃষ উৎসর্গ), কর্ণাটকের কামবালা (ষাড়ের দৌড়) ও অন্ধ্রপ্রদেশের গুজ্জামা গণ্ডরল্ল (যে খেলা কাঠের রান্নার জিনিসপত্র দিয়ে ছেলে মেয়েরা খেলে)। মার্শাল আর্ট তামিলনাড়ু এবং কেরালা রাজ্যে অধিথাডা (ভারতীয় লাথিবক্সিং), সিলামবাম (যে খেলা বাঁশের লাঠি দিয়ে খেলা হয়) এবং কালারিপেয়াট্টু (ছোরা খেলা) ইত্যাদি বিখ্যাত। লোকেরা এই মার্শাল আর্ট অনুশীলন কওে, যেন মন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারে।

১০) দ্রাবিড়ীয় খাদ্য

অনেক বছর ধরে দ্রাবিড়ীয় খাদ্যাভাস পরিবর্তিত এবং ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে, আরবীয়, আর্য্য এবং পর্তুগীজদের খাবারের মিশ্রন দিয়ে। তবুও তারা তাদের নিজেদের খাদ্যাভাস সংরক্ষণ করতে পেরেছে এবং এটা তার নিজস্ব স্বকীয়তা, যা তারা রক্ষা করে চলেছে। ঐতিহ্যগতভাবে তাদের খাদ্য ভাতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এটা এলাকাভেদে পরিবর্তিত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় বেশীর ভাগ লোক মাছই বেশী খায়। তামিলনাড়ুর লোকেরা নানারকম খাদ্য তৈরী করে, ভাত এবং অন্যান্য খাদ্যশষ্য মিশ্রনে যেমন- দোসা, ইদলী, উত্তাপাম, বড়া এবং অন্যান্য পদ, যেমন- সাম্বার নারকেলের চাটনী, রসম, পোরিয়াল ইত্যাদি। রান্নায় লঙ্কা ও তেঁতুল ব্যবহার করা অন্ধ্রপদেশের রান্নায় একটা বৈশিষ্ট্য। তারা পেশাআট্ট, গংগুরা, পুলিহোরা, কোডি ইগুরা, কোডি পুলুশ এই সব পদ রান্না করে। কেরালায় তাদের রান্নায় নারকেল খুব বেশী পরিমান ব্যবহার করে এবং বিশেষ পদ যেগুলো রান্না করে, তা হ'ল- অভিয়াল ওলান, মাছ পরিয়াল, নারিকেল ঝিঙা ঝোল ইত্যাদি। কর্ণাটকের লোকেরা চিনি, তাল এবং রাগী (খাদ্য শস্য) ইত্যাদি দিয়ে নানারকম পদ রান্না করে। সারা পৃথিবীর লোকেরাই, যারা খেতে পছন্দ করে তারা তা রান্না করতে পারে।

(১১) দ্রাবিড়ীয় সামাজিক পদ্ধতি

এটা ঐহিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে দ্রাবিড়ীয়রা মাতৃতান্ত্রিক প্রথা অনুসরণ করে, যা নারীদের শক্তি ও কর্তৃত্ব দান করে। নারীরা সামাজিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব করে। সম্পত্তির অধিকার তাই সুস্পষ্টভাবে মায়ের থেকে মেয়ে পেয়ে থাকে।

প্রাচীন কালে দ্রাবিড়ীয় কৃষ্টির পতন

দ্রাবিড়ীয় কৃষ্টির পতনের সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ব দেয়া আছে।

১) আর্য্যদের দৃষ্টিকোনঃ দ্রাবিড়ীয় কৃষ্টির পতনের কারণ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হচ্ছে আর্য্যদের অনঢ় সামরিক ব্যবস্থা। আর্য্যদের ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাস সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা হল তাদের ধর্মগ্রন্থ - চারটি বেদ। এই বেদ অন্যান্য সংস্কৃত রূপকথার সাহিত্য প্রকাশ করে যে, আর্য্যরা জাতি হিসাবে সংগঠিত ছিল। ঘোড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকরূপে বৈদিক ধর্ম এবং সামরিক শক্তিরূপে ব্যবহৃত হ'ত। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, আর্য্যরা স্টেপস অঞ্চল থেকে যেখানে অশ্বপালন হ'ত সেখান থেকে এসেছিল। আর্য্যরা ভারতের যে অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেছিল তাকে তারা সপ্ত সিন্ধু বলত বা সপ্ত নদীর দেশ (বর্তমানে পাঞ্জাব) বলত। পাঞ্জাবের সমভূমিতে আর্য্যরা পশুপালন ও কৃষিকাজ করতে শুরু করেছিল। তারা জঙ্গল পরিস্কার করে গম ও যব চাষ করতে শুরু করেছিল। এছাড়াও তারা কাঠমিস্ত্রীর কাজ করত।

আর্য্যরা স্থানীয় কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করত। তারা তাদের জয় করতে শুরু করল এবং উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিকে জয় করে সেখানকার স্থানীয় লোকদের দক্ষিণের জঙ্গলের দিকে এবং দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় সমাজকে এইভাবে ভাগ করা হয়েছিল উত্তর ভারতীয় লোকেরা আর্য্য এবং দক্ষিণ ভারতীয় লোকেরা দ্রাবিড়ীয়। ফর্সা আর্য্যদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারাই বর্ণপ্রথা নিয়ে এসেছে। বর্ণ কথার অর্থ রং। বর্ণপ্রথাকে আরও বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম। তার অর্থ উজ্জ্বল বর্ণের আর্য্যরা কৃষ্ণবর্ণ দ্রাবিড়ীয়দের জয় করেছে।

যাই হোক অনেকেই সম্পূর্ণ সন্দেহ প্রকাশ করে যে, ভারতে কোনও দিন আর্য্যদের আক্রমণ হয়নি। এই সন্দেহবাদ আর্য্যদের ভারত বিজয় খ্রীষ্টিপূর্ব ১৫০০ অব্দে হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, হিন্দুবাদের অনেক ঘটনা অনেক আগেই ঘটেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়- মহাভারতের যুদ্ধ যা আর্য্যদের সামনে হয়েছিল, তা ৭,০০০ বছর আগে।

(২) বন্যা- ঐতিহাসিকেরা প্রস্তাব রাখেন আরও কয়েকটি বিকল্প। একটা তত্ত্ব বলে যে, এই পতন ঘটে সিন্ধু উপত্যকায় একটা বন্যা হয়েছিল, তার ফলে।

৩) ফসলের ক্ষতি- আর একটা সম্ভাবনা হচ্ছে যে, জলবায়ুর পরিবর্তনে বৃষ্টিপাত কমে গিয়েছিল এবং তার পর পরই দেশে ফসলের ক্ষতি হয় এবং বহুলোক উত্তরের দেশ ত্যাগ করে দক্ষিণে চলে যায়।

৪) দুইদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা- বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, যার ফলে কোন দলের উত্থান এবং অন্যদলের বিলুপ্তিও দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার পতনের আর একটি কারণ।

নূতন প্রবৃত্তির হঠাৎ প্রবেশ-

প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় কৃষ্টি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়- একটি সভ্য, শান্তিপূর্ণ এবং মাতৃতান্ত্রিক সাম্রাজ্য, যা বিলুপ্ত হয়েছিল, তাঁর বিভিন্ন কারণ আছে।

যাই হোক সেইসব প্রতিভাবান ব্যক্তিকে ধন্যবাদ, তাদের অবদানের জন্য। যাদের দ্বারা দ্রাবিড়ীয় গর্বের আগুন আবার জ্বলে উঠেছিল। এরা হলেন তামিলনাড়ুর পেরিয়ার, মহারাষ্ট্রের বাবাসাহেব আমেবদকর, কেরালার শ্রী নারায়নগুরু এবং আয়ানকালি, অন্ধ্রপ্রদেশের বৈ ভীমানা এবং রঙ্গস্বামী এবং সিং আর রেড্ডি এবং কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন। পেরিয়ার রামাস্বামী আদি দ্রাবিড়ীয় কথাটি চালু করেছিলেন তাদের জন্য, যারা আসল দেশী বা দ্রাবিড় দেশের আদিবাসী ছিল। আদি কর্ণাটক আদি অন্ধ্র শব্দগুলি পর্যায়ক্রমে কর্ণাটকের এবং অন্ধপ্রদেশের দলিত সম্প্রদায় নামে পরিচিত করাতে ব্যবহৃত হত। আদি দ্রাবিড় দলিতদের নির্দেশ করে, যাদের পঞ্চমা বলে, বা পঞ্চম দল যারা বর্ণশ্রম ধর্ম অনুসারে চারধরনের বর্ণের মধ্যে গন্য রাখে না। অন্যদিকে দলিত সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, তারা এত দূর্বল নয় যে তারা এই বর্ণবাদের মধ্যে বদ্ধ থাকবে। তারা বর্ণবাদের বাধ্যবাধকতার নাগালের বাইরে এবং তারা বর্ণবাদ দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

যদিও প্রতিটি অঞ্চলে তাদের নিজস্ব সংমিশ্রন ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে এটা ভাগ করে নিতে পারি, এইভাবে দ্রাবিড়ীয় মিশ্র উত্তরাধিকার ও এর ব্যতিক্রম নয়। যখন দ্রাবিড়ীয় অসামান্য মিশ্র উত্তরাধিকার ভারতের এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্য অংশের সঙ্গে অখণ্ড সম্পর্ক রেখে চলেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর 'ইউওয়ান কা সপনা' 'যৌবনের স্বপ্ন' পুস্তকে তামিলনাড়ুর লোকেরা যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে (আই.এল.এ) যোগ দিয়েছিল তাদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

পাঠ্য উপকরণ ২ : ফাটল ধরা অঞ্চলে বিমিশ্র ঐতিহ্য
(Composite Traditions in Fracture Regions)

কীভাবে বহুস্তরবিশিষ্ট পরিচিতির (জাতীয়, আঞ্চলিক, ধর্মীয়, ভূ-খন্ডগত, একই জাতিগোষ্ঠী/সাংস্কৃতিক বা আরও অন্যান্য) অদ্ভূত মিশ্রণকে বুঝতে হবে? এটা কি পূর্বাহ্নেই বলা সম্ভব যে, এগুলোর মধ্যে কোনটি পরিচিতি নির্মাণের সাধারণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর ভূমিকা পালন করে? সারা পৃথিবীতে জাতীয় পরিচিতি হলো একটি আধুনিক বিষয় এবং সময়ের বিচারে এটা ১৯শ শতাব্দীপূর্ব কোন বিষয় নয়। পক্ষান্তরে, ধর্মীয় (কিংবা জাতিগত/সাংস্কৃতিক) পরিচিতি যদিও অপেক্ষাকৃতভাবে প্রাচীন, আধুনিককালে এ সব পরিচিতির প্রকৃতি ও চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যে গভীর রূপান্তর ঘটেছে। বিশেষ করে, ভৌগোলিক বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়িয়েও ধর্মীয় সংহতির যে মজবুতকরণ এবং তাকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার যে চাতুর্যপূর্ণ আচরণ তা তর্কাতীতভাবেই একটি আধুনিক বিষয়।

যে সমস্ত অঞ্চল এক সময়ে একটি সুসম্বদ্ধ অখন্ড সাংস্কৃতিক অঞ্চল ছিল কিন্তু এখন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সেই সমস্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ সমস্যা চরম আকার ধারন করেছে। পাঞ্জাব ও বাংলার কথা সহজেই আমাদের মনে পড়ে। উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এ দু'টো অঞ্চলের যে সাংস্কৃতিক বিমিশ্রতা ছিল, যার শিকড় অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে, আঞ্চলিক অখন্ডতার গভীরে প্রোথিত ছিল- এ সম্পর্কে খুব কমজনই বিবাদে লিপ্ত হবেন। ১৯৩১ সনের আদমশুমারি অনুসারে বাংলার মোট জনসংখ্যার ৫৪% মুসলমান ও ৪৩% হিন্দু ছিল। পাঞ্জাবে শিখ ধর্ম এ অঞ্চলকে ধর্মীয় বহুত্ব দিয়েছে। এখানে মোট জনসংখ্যার ৫৫% মুসলমান, ৩১% হিন্দু ও ১১% শিখ। এ পরিসংখ্যান দেখে মনে হবে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ধর্মীয় লাইনে বিভক্ত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এখানে ধর্ম কখনই অভেদ বা অপৃথকীকৃত ও একক সত্তাবিশিষ্ট ছিলনা। বিশেষ করে, হিন্দু ধর্ম লক্ষ্যনীয়ভাবে বহুত্ববাদী ছিল, কারণ এ ধর্মের অনুগামীরূপে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ওরয়েছে। তাই এটা নিরাপদে বলা যায় যে, ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত যৌগ সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে একটি অঞ্চলের বিকাশে ধর্মীয় বহুত্ব বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ১৯শ শতাব্দীর পর থেকে বিভাজন প্রবণতা মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে।

সকল অঞ্চলের ক্ষেত্রে পরিচিতির বহুত্ব বিষয়ক প্রশ্নটি এক নয়। কোন কোন অঞ্চল অন্যন্য অঞ্চল অপেক্ষা এর দ্বারা অনকে বেশি নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাংলার ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি তীব্র। আসুন আমর আরও সুনির্দিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করি। বাংলার পশ্চিম প্রান্তে বসবাসকারী একজন মুসলমান তাঁর প্রাথমিক পরিচিতি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন ঃ তিনি কি ধর্মীয় মুসলমান সম্প্রদায়ভূক্ত (উম্মা বা সর্বজনীন মুসলিম ব্রাদারহুড); আঞ্চলিক বাঙালি সম্প্রদায়; জাতীয় ভারতীয় সম্প্রদায়? অর্থাৎ তাঁর জাতীয়, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক পরিচিতির মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বরঞ্চ তাঁকে বিভিন্ন দলভূক্ত করতে পারে যার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিয়ে পরস্পর বিরোধী দাবি উঠতে পারে। তাঁর আরও অন্যান্য পরিচিতিও (লিঙ্গ, স্থান, পেশা ইত্যাদিরউপর ভিত্তি করে) থাকতে পারে। কিন্তু বাংলার প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক,ধর্মীয় ও জাতীয় পরিচিতিই ছিল ঐতিহাসিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এ পর্যায়ে এটা নির্দেশ করাটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আধুনিক যুগের আগমনপূর্ব সময়ে একাধিক (multiple) পরিচিতির প্রশ্নটি কোন সমস্যার সৃস্টি না করেই মানবজাতির ইতিহাসের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে ছিল। মানুষ (এখানে 'মানুষ' একটি লিঙ্গীয় পরিভাষা না হয়ে 'জাতি বর্গীয়' পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হয়েছে) বিভিন্ন দলভূক্ত হয়ে বসবাস করে আসছে এবং তাঁর বিবেক অথবা আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার মুখে না পড়ে এ সব প্রত্যেকটি দলের (গোত্র, বর্ণ, ধর্ম, অঞ্চল ইত্যাদির ভিত্তিতে) পরিচয়ে পরিচিত হয়েছে। মানুষের বহুবিধ পরিচিতির অস্তিত্ব মানবজাতির ইতিহাসের একটি সাধারণ বা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হয়ে ছিল। এটা কখনই সমস্যা বা উভয় সংকটরূপে পরিগণিত ছিলনা। আধুনিকতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এর অধিকাংশেরই পরিবর্তন হয় যা বিভিন্ন কারণে পরিচিতির বহুত্বসহ পরিচিতির শ্রেণীক্রমের উপর জোর দিয়েছে। আধুনিক মানুষকে এমন একটা অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় যেখানে তাঁকে তাঁর বহুবিধ পরিচিতির মধ্য থেকে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য পরিচিতি হিসেবে একটা পরিচিতিকে বেছে নিতে হয়। মূল পরিচিতি হিসেবে তাঁকে একটা পরিচিতি বেছে নিতে হবে যা সব কিছুকেই ধারন করে। প্রায়শই এ পরিচিতি হলো জাতীয় পরিচিতি যা অন্যান্য পরিচিতির উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে কিংবা এমনও হতে পারে ধর্মীয় ছদ্মাবরণে জাতীয় পরিচিতি কিংবা জাতীয় পরিচিতির ছদ্মাবরণে ধর্মীয় পরিচিতি। বিষয় যাই হোক না কেন, পরিচিতির এ বহুত্ব মানুষের সামাজিক মর্যাদা বা সামাজিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য। যখন এটাকে আধুনিক অবস্থানে নিয়ে আসা হয় তখন পরিচিতির শ্রেণীক্রমকরণকে মেনে নিতে হবে।

পরিচিতির এ শ্রেণীক্রমের উপর জোর দেওয়ার বিষয়টি বাংলার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা তৈরি করেছিল (পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও কিছুটা)। দীর্ঘ সময় ধরে সারা বাংলায় ভৌগোলিক ও সাংস্কতিক নিবিড়তা ছিল কিন্তু ২০শ শতাব্দীতে এসে বাংলা তিনটি বাটোয়ারার সম্মুখীন হয়। প্রথম বাটোয়ারা হয়েছিল ১৯০৫ সালে যা ১০১২ সালে রদ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বাটোয়ারা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে যা চূড়ান্ত বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। বাংলার একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে এবং পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে পুনর্গঠিত হলো। পাকিস্তানের হেডকোয়ার্টারও ছিল পাঞ্জাবে। অন্য অংশটি পশ্চিম বাংলা নামে ও অন্যতম একটি রাজ্য হিসেবে ভারতে থেকে গেল। বাংলা ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। এর পূর্বাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও পশ্চিমাংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এটা আশা করা গিয়েছিল যে, নব্যসৃষ্ট পাকিস্তানে ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামিক আদর্শ, এ দেশে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন অঞ্চল গুলোকে একত্রে ধরে রাখার প্রয়োজনীয় শক্ত বাঁধনের যোগান দেবে। কিন্তু ১৯৭১ সালে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির জোরালো দাবি প্রতিষ্ঠা পায় এবং পূর্বাংশটি বাংলদেশ নামে একটি সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক উপাদানসমূহ বাংশাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। কিন্তু দুই বাংলাকে কিসে আলাদা করে রাখল? এ দু'টি অঞ্চলেরই একই জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর যাঁর কবিতা দু'টি স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সুতরাং, দুই বাংলাকে কিসে স্বতন্ত্র করে রেখেছে? ধর্ম? কিংবা এটা কি জাতিরাষ্ট্রের অমোঘ বিধান যে একবার গঠিত হলেই সহজে ভাঙা যাবেনা?

বাংলার কৌতুহলোদ্দীপক দিকটা হলো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও এ অঞ্চল কখনও পুরোপুরিভাবে ইসলামী ভাবযুক্ত অঞ্চল হয়ে উঠেনি। বাংলায় যে ইসলাম বিজয়ী হয়েছিল, প্রসার লাভ করেছিল তা উচ্চমার্গীয়, তত্ত্বপ্রধান ও ধ্রুপদী ইসলাম ছিলনা। এ ইসলাম ছিল সাধারণ, সুফি, ধর্মীয় আচারনিষ্ঠ ও উদার প্রকৃতির ইসলাম। এটি সমন্বয়বাদী ও যৌগ সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত করেছিল যা ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক ভূবনকে প্রভাবিত করে রেখেছিল। বহু লোক বাংলায় ইসলামের এ দিকটা লক্ষ্য করে তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। উচ্চমার্গীয় ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ইসলাম, যা একচেটিয়া হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, ছিল কলুষিত। উদাহরণস্বরূপ, ১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় মোঘল সেনাধ্যক্ষ (admiral) ইহ্তিমান খান বাংলায় দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে 'অনৈসলামিক' হিসেবে অবজ্ঞা করতেন। ইসলামের এ তথাকথিত বিচ্যুতির উপর ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বিভিন্ন মন্তব্য-সমালোচনাও করা হয়েছিল। ১৯শ শতাব্দীর অন্তিম সময়ে বাংলার জনৈক বৃটিশ নিবাসী ড: জেমস ওয়াইজ বঙ্গীয় মুসলমান কর্তৃক 'কলুষিত হিন্দু ধর্মাচার'-এ বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। খ্যাতিমান মুসলমান বুদ্ধিজীবি সৈয়দ আমীর আলী বঙ্গীয় মুসলমানদের যাঁরা প্রধানত হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলন এবং তখনও হিন্দুদের অনেক রীতিপ্রথা মানতেন তাঁদেরকে অবজ্ঞা করতেন। অনতিকাল পরে ভারতে লোকধর্ম শাস্ত্রজ্ঞ উইলিয়াম ক্লার্ক-এর মতে ''যাঁরা ইসলামকে ত্রুটিপূর্ণভাবে আত্তীকরণ করেছিলেন তাঁরাই ছিলেন বাংলার মুসলমান।" ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মালিক ফিরোজ খান নূন বাংলার মুসলমানদেরকে ''আধা-মুসলমান" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলন।

সাম্প্রতিক ভাষ্যকার ও রাজনীতিবিদ ছাড়াও অনেক ইতহাসবিদ এ বিষয়ের উপর মন্তব্য করেছিলেন। মোহাম্মদ মুজিব এদেরকে ''আংশিক ধর্মান্তরিত"এবং পিটার হার্ডি এদরকে ''আদমশুমারির মুসলমান" হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ''--- মধ্যযুগের ভারতে ইসলামের চর্চা ও তার বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার জন্য প্রকৃত চ্যালেঞ্জটা ছিল গ্রামাঞ্চলে যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাঁরা, ইসলামের করণীয় সম্পর্কে নব্য মুসলমানদের অজ্ঞতাও ধর্মান্তরিতদের দৈনন্দিন জীবনে হিন্দু ধর্মের নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ।" জনৈক বাঙালি ইতিহাসবিদের মতে বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন এক ধরনের গণ ইসলাম-এরদ্বারা প্রভাবিত ছিল যার সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামির কোন সংযোগ ছিলনা। অপর একজন উচ্চ ইসলামি ভাবাপন্ন বাঙালি ইতিহাসবিদ এ ধরনের প্রবণতায় অনুতপ্ত হয়ে লিখেছিলেন- ''ইসলামের মূল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলমানেদের চাইতেও সংখ্যায় অধিক অমুসলমানদের সাহচর্য এবং হিন্দুধর্ম থেকে আধা ধর্মান্তরিতদের সঙ্গে বসবাসের ফলে মুসলমানরা তাদের মূল বিশ্বাস থেকে বহুল পরিমাণে সরে গিয়ে ভারতীয় হয়ে গেছে।"

এ সব মন্তব্যকে সঠিক প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। মধ্য যুগ থেকে শুরু করে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত যে প্রবল প্রাধান্য বিস্তারীইসলাম চর্চিত হয়ে আসছিল তার মধ্যে সমন্বয়বাদী উপাদান ছিল। এ সমন্বয়বাদ হলো অনেক অমুসলিম/হিন্দু প্রথার দ্বারা সমৃদ্ধ বাঙালি ইসলামে আরবের উচ্চমার্গীয় ইসলামি মূল্যবোধের অগভীর অনুপ্রবেশের ফল। আরবী ও পার্সী ভাষায় রচিত উচ্চ মার্গীয় ইসলামি সাহিত্য সহজে সাধারণ মুসলমানদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। সুতরাং, আরবী ও পার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ উচ্চ মার্গীয় ইসলামি ঐতিহ্য নিম্ন বর্গীয় বাঙালি মুসলমানদের কাছে সহজলভ্য ছিলনা কিন্তু অনেক অমুসলিম স্থানীয় ঐতিহ্যে তাদের সহজগম্যতা ছিল। ফলে এটা অনিবার্য যে, দরিদ্র মুসলমানেরা ধ্রুপদী ইসলামি ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে স্থানীয় ঐতিহ্যের দ্বারা বেশি পরিচালিত হবে। জনৈক সৈয়দ সুলতান লিখেছেন ঃ ''শিক্ষিতদের জন্য আরবী ও পার্সী কিতাবের কোন অভাব ছিলনা। স্থানীয় অজ্ঞলোকেরা তাদের ধর্মের অনুশাসন অনুধাবন করতে না পেরে স্থানীয় কল্পকাহিনী ও গল্পের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল। কবিন্দ্র পরমেশ্বর কর্তৃক বাংলায় অনুদিত হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতি প্রতিটি হিন্দু ও মুসলমানরে ঘরে ঘরেগভীর আগ্রহ তৈরি হয়েছিল ... খোদা ও রসূলের কথা কেউ ভাবে নাই।" বাংলার মুসলমানদের কাছে হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণ সমান জনপ্রিয় ছিল। ''এমন কি যবনেরা (মুসলমান) শ্রদ্ধাভরে রামের কাহিনী শুনতো এবং সীতাকে হারিয়ে রাম যে কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে পড়েছিল তাতে তারা চোখের জল ফেলতো" - অপর একজন মন্তব্যকারীর এমন মন্তব্য ছিল।

আজলাফ (নিম্ন বর্গীয় স্থানীয় ধর্মান্তরিতরা) ও আশরাফদের (সম্ভ্রান্ত বা বিশুদ্ধ বংশীয়) মধ্যে যে বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন তাতে ভাষিক বিভাজনও যুক্ত হয়েছে। স্থানীয় মুসলিমদের কাছে উচ্চ মার্গীয় ইসলামের অনধিগম্যতা সম্পর্কে জনৈক শরীফ বলেন ঃ''বাংলা ভাষা রপ্ত করতে উচ্চ বর্গীয় মুসলমানদের অস্বীকৃতি বা অসমর্থতা তাদের সঙ্গে নিম্ন বর্গীয় মুসলমানদের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমরা বাংলা শিখিনা ... ... আমাদের মধ্যে নিম্নবর্গীয়রা পার্সী শিখতে পারেনা, এমতাবস্থায় একসঙ্গে কাজ করার বা সহমর্মিতার কোন উপায়ও থাকেনা।" ভাষা কেবল পবিত্র গ্রন্থ পাঠের সুযোগ তৈরি করেনি, এটা চিত্রকল্প, প্রতীক, প্রবাদ ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের একটা মাধ্যমও। এ সব কিছুই যখন সাধারণ বাঙালি মুসলমানদের কাছে অনধিগম্য ছিল তখন তারা তাদের কাছে যা লভ্য ছিল - বাঙালির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন লোকগাথা বা চারণগীতি, লোককাহিনী এবং বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় পৌরাণিক ঐতিহ্য - সেগুলোকেই তারা আঁকড়ে ধরে নিয়েছে।

পাঠ্য উপকরণ ৩ : একটি উপমহাদেশীয় ইতিহাস রচনার পথে
(Towards A Sub-Coninental History)

ভারত ও পাকিস্তানের (এবং বর্তমানে বাংলাদেশ) সাধারণ ইতিহাস নিয়ে লেখার বিষয়টি সীমান্তের উভয় পাড়ের অনেক ইতিহাসবিদ ও অন্যান্য বিদ্বজ্জনদের 'স্বপ্ন প্রকল্প' হয়ে আছে। স্পষ্টতই এটাকে উভয় দেশের মধ্যকার বৈরিতা প্রশমনের একটা উপায় হিসেবে দেখা হয়। দু'দেশের জনগণ ও সরকারকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে সংঘাত কবলিত ও ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়া বর্তমানকাল উভয় দেশের কাছে সর্বজনীন এমন একটি অতীতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে।

আপাতদৃষ্টিতে প্রকল্পটি যথেষ্ট সহজ ও অর্জনযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। তিন সহসাব্দেরও অধিক সময়ের মধ্যে বিগত প্রায় ৫৭টি বছর কেবল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কেটেছে। অর্থাৎ, যদি ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসকে জনগণ ও তাদের শাসকদের চলমান ও অবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম ও ঘটনাপঞ্জির ইতিহাস হিসেবে দেখা হয়, তাহলে বিচ্ছিন্নতার নয় বরং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত একটা লম্বা সময় ধরে ঐক্য ও অবিচ্ছিন্নতার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার ইতিহাসের সময়কালটা খুব স্বল্প সময়ের - পাঁচ দশকের কিছু বেশি। অতএব, ভারত ও পাকিস্তানের (এবং বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণের একটি সর্বজনীন, বিমিশ্র এবং প্রকৃতপক্ষে একই রকম ইতিহাস রচনা করা ইতহিাসবিদদের জন্য কোন কঠিন কাজ হওয়ার কথা নয়।

আপাত সহজসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও এ প্রকল্পটি খুব কমই হাতে নেওয়া হয়েছে, হলেও সেগুলো কখনও শেষ করা যায়নি। এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগ সামাজিকভাবে কাম্য ও সম্ভব প্রতীয়মান হলেও বাস্তবায়ন কেন কঠিন ছিল? এ প্রশ্নের আংশিক উত্তর হলো এদেশের সকল ইতিহাস না হলেও অধিকাংশ ইতিহাসই সাধারণত ছিল জাতীয় ইতিহাস। এর অর্থ এই নয় যে, জাতিরাষ্ট্রের ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রের অন্য কোন 'একক'-এর ইতিহাস রচিত হয়নি। আমরা গ্রাম, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়, মহাদেশ ও বিশ্বেরও ইতিহাস পেয়েছি। (অগ্রসারির জনতত্ত্ববিদ কিংসলী ডেভিস ভারত ও পাকিস্তানের জনসংখ্যার উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন)।

তর্কের খাতিরেই বলা যে, ইতিহাসসমূহ জাতীয় ধারণার গন্ডিতে কল্পিত হয়েছে। যদিও জাতি ও জাতিরাষ্ট্রগুলো বিশ্বের মানচিত্রে নতুন অন্তর্ভূক্তি হিসেবে বিবেচিত, তৎসত্ত্বেও জাতি ও জাতিরাষ্ট্র যখন ছিলনা (যেমন, ইংল্যান্ডের ইতিহাস) তখনও জাতীয়ভাবে ইতিহাস কল্পিত হতো। এটা অংশত এ কারণে যে, প্রকল্প হিসেবে ইতিহাস রচনা (অভ্যাস ও রুচির দ্বারা না হয়ে সচেতন অভিপ্রায়ের দ্বারা) জাতিরাষ্ট্রের আকর্ষণে গতি পেয়েছে। জাতি হতে প্রত্যাশী কিংবা প্রকৃত জাতি কর্তৃক বৈধতা অন্বেষণের কৌশল হিসেবে ইতিহাস ব্যবহৃত হয়েছে। এটা শুধু জাতির জীবনকাল অর্থাৎ যে সময় থেকে জাতির সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের জন্য সত্য তা নয়, পৃথিবীতে জাতির অভ্যুদয়ের পূর্বের সময়ের বিশাল ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। এটা এজন্যে বলা যে, যখন এমন কি একটি জাতি *সম্পর্কে* ইতিহাস রচিত হয়নি, তখনও সম্ভবত জাতির *জন্যই* ইতিহাস লেখা হচ্ছিল। এ ধরনের একটা পরিবেশ ও তাড়না কাজ করতে থাকায় দৃশ্যত তিনটি ভিন্ন জাতিরাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য একটি সর্বজনীন ইতিহাস রচনা করা কঠিন।

ভারত ও পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটি আরও জটিল হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সৃষ্টি নির্বিঘ্ন ছিলনা, এমনকি সংঘাতমুক্তও নয়। এক মনোরম ভোরে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটেনি। জাতিরাষ্ট্র হিসেবে এর আগমন মসৃণ ছিলনা। এর বিরোধী যারা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়েছে। বিপরীভাবে দেখলে মনে হবে, এরা হেরে গেছে এবং অসহায় অবস্থাকে মেনে নিয়েছে। একজনের বিজয় তো অপরজনের পরাজয়। ১৯৬৮ সালে লন্ডনে তিন দেশের আমন্ত্রিত ইতিহাসবিদদের অংশ গ্রহণে দেশ বিভাগের উপর অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে (পরবর্তীতে C.H. Philips, Marry Doreen Wainwright-এর সম্পাদনায় Pakistan and India: Policies and Pespectives, 1935-47 নামে বই আকারে প্রকাশিত; লন্ডন, ১৯৭০) এটার নির্মম প্রকাশ ঘটেছে। যে সব ঘটনা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত গড়িয়েছিল তার উপর আলোচনার জন্য ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়ে যে সব রাজনীতিবিদ সক্রিয় ছিলেন তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এ সেমিনারেই ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাসবিদরা তাদের মধ্যে মতপার্থক্য যে কতখানি তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এমন কি আলোচনার মূল আওতা (basic terms of reference) নিয়েও তাঁরা একমত হতে পারেননি। যেখানে ভারত থেকে আগত ইতিহাসবিদরা (B.R. Nanda, S.R. Mehrotra among others) (I.H. Qureshi, Raja of Mahmudahad, M.A.H. Ispahani among others) ''দুর্ভাগ্যজনক দেশভাগ", ''দেশভাগের মর্মান্তিক ঘটনা" এবং এ সব কী ভাবে এড়ানো যেতো সে বিষয়ে কথাবলেছেন, সেখানে পাকিস্তানি ইতিহাসবিদ ও পর্যবেক্ষকরা এ ঘটনাকে ''অদৃষ্ট কর্তৃক নির্ধারিত" ও ইতিহাসের কিছু

প্রভাববিস্তারী শক্তির অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই দেখেছেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ (প্রতিপক্ষরা একে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ হিসেবেও দেখেন) একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেমুখী ছিলনা, হতেও পারেনি।

পুনর্মিলনে অসাধ্য এ সব পার্থক্য দু'দেশের ইতিহাস রচনার বিভিন্ন দিকে প্রভাব ফেলেছে। তাদের বীরপুরুষ/নায়করা ভিন্ন। তাদের বিজয় ও বিয়োগান্তক ঘটনার মুহূর্ত্তগুলোও একে অপরের উপর প্রতিস্থাপিত হয়েছে (অর্থাৎ একজনের বিজয় অপরজনের জন্য বিয়োগান্তক)। এটাবিশেষ করে স্কুলের শিশুদের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে লক্ষনীয়। আধুনিক ভারতের পাঠ্যপুস্তকে সৈয়দ আহ্মেদ খানের সম্প্রীতি নিয়ে বলা কথাকে গুরত্ব দিয়ে দেখানো হয়, কিন্তু তাঁর প্রচারিত মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা নয়। পাকিস্তানী পাঠ্যপুস্তকে তাঁকে রাজনীতিতে মুসলিম পরিচিতিকে সুসংহতকরণের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হতো এবং সম্প্রীতির প্রচারে তাঁর পূর্ব প্রচেষ্টাকে পাশ কাটানো হতো। অনুরূপভাবে, ইকবালকেও দু'দেশের পাঠ্যপুস্তক বিভক্ত করেছে। ভারতীয় পাঠ্যপুস্তকে তিনি তার বিখ্যাত কবিতা তারানা-ই-হিন্দ (সারে জাহান সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা)-এর কবি হিসেবে অভিনন্দিত হতেন। পাকিস্তানী পাঠ্যপুস্তকে মহান এ কবির জীবনের এ পর্যায় সম্পর্কে নীরব থেকে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় যেখানে তিনি ইসলামি স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনাকে তুলে ধরেছেন সেই অংশটাকেই গ্রহণ করা হয়েছে।এ ভাবে অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে দু'দেশ তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিভিন্ন দিককে বেছে বেছে গুরুত্ব দিয়েছে।

সময়পর্ব নিরূপণও আরেকটি সমস্যা তৈরি করেছে। কোত্থেকে/কোন সময় থেকে একটি সমাজ/জনগণ/ভূ-খন্ডের ইতিহাস শুরু হওয়া উচিত? শাসক, জনগণ, ও দেশের সভ্যতা নিরবচ্ছিন্ন হওয়ায় ভারতকে নিয়ে তেমন গুরতর সমস্যা নেই। ভারতীয় ইতিহাসকে সহজেই প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক - এ তিন পর্যায়ে শেখানো যায়। কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাস কোত্থেকে শুরু হবে? এর সময়পর্বের সাথে ভারতের ইতিহাসের সময়পর্ব কি মিলতে পারে বা এক হতে পারে? পাকিস্তানের ইতিহাস কি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো (এগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান পাকিস্তানে হওয়ায়) থেকে শুরু হওয়া উচিত নাকি ৭ম শতাব্দীতে ইসলামের আগমনের সাথে (পাকিস্তান ও পাকিস্তান জাতিরাষ্ট্রের আন্দোলনের মৌলিক পরিচিতি ইসলামিক হওয়ায়) কিংবা ১৯শ শতাব্দীতে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণাটি ক্রমশ দার্শনিকভাবে মূর্ত্ত হতে শুরু করে তখন থেকে? অথবা এ ইতিহাস কি ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হওয়া উচিত যখন এ জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল? একটি জাতিরাষ্ট্রের ইতিহাস কি এর জীবনের পরিসরের (অর্থাৎ জাতিরাষ্ট্রের বয়স) সঙ্গে মিলবে? ইতিহাসের বহুবিধ স্তরের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায়না বিধায় এর শুরুর কালটা কী হবে সে প্রশ্নটি সত্যিই কঠিন।

সমস্ত রকমের বিপত্তি সত্ত্বেও দু'দেশের (এবং বাংলাদেশও, যে দেশটি একই ভূ-খন্ড ও একই জনগোষ্ঠী থেকে জন্ম লাভ করেছে) জন্য একটি সর্বজনীন ইতিহাস রচনা একই সাথে চ্যালেঞ্জিং ও আকর্ষণীয়। ইতিহাস রচনার কাজটি এ ভাবে চেষ্টা করা যায় ঃ

- ফোকাসটাকে জাতিরাষ্ট্র থেকে জনগণের উপর সরিয়ে নিয়ে;
- সংঘাতের জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সেগুলোকে যতদূর সম্ভব কম গুরুত্ব দেওয়া;
- কিছু মানুষকে (সৈয়দ আহ্মেদ খান, ইকবাল, জিন্নাহ্, নেহ্রু, প্যাটেল) তাদের প্রেক্ষাপটে রেখে সময়ের পরিবর্তনে তাদের জীবনের যে ধারাবাহিকতা তার গুরুত্ব দেওয়া;
- রাজনৈতিক ইতিহাসের চাইতে সামষ্টিক ইতিহাস নিয়ে লেখা;
- একটি সর্বজনীন পরিভাষাবের করা এবং এলাকা-নির্দিষ্ট ও বিরোধাত্মক পরিভাষা যেমন, দেশ-ভাগ, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি পরিহার করা;

বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট (ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলন) জটিলতা সম্পর্কে ছাত্রদেরকে এমন সংবেদনশীল করে তোলা যেন তারা পক্ষপাতদুষ্ট না হন।

নোটসমূহ ঃ

দ্যা ইন্‌স্টিটিউট ফর সোস্যাল ডেমোক্রেসী
(The Institute for Social Democrecy)

দ্যা ইন্‌স্টিটিউট ফর সোস্যাল ডেমোক্রেসী (আইএসডি) ২০০৪ সালে ইন্ডিয়ার দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান সর্বদাই সার্বজনীনতা ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সংগ্রাম করে, যা যে কোন ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করে। আইএসডি প্রধানত উত্তর ভারতের হিন্দী ভাষাভাষি অঞ্চলে তার কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীতে সাউথ এশিয়ার বিভিন্ন দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং সেসব দেশসমূহে তার কার্যক্রম বিস্তৃত করে। এই প্রতিষ্ঠান সর্বদাই সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, জেন্ডার বৈষম্য, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া, পরমানু নিরস্ত্রীকরণ, ইত্যাদি ইস্যু সম্পর্কে নিজেদের কর্মী, সমাজ পরিবর্তনে সক্রিয় ব্যক্তিবর্গ এবং তৃণমূল সংগঠনের কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষিত করে। উল্লিখিত ইস্যুসমূহে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানাবিধি শান্তি অভিযান গঠন, পরিচালনা এবং এতে সহায়তা প্রদান করে। আইএসডি তার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল কর্মীদের সাথে অপ্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গঠন করে, যারা আইএসডি'র অফিসের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা কওে চলে।

আইএসডি সর্বদাই সার্বজনীনতাবাদ দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন ও চর্চা করে, যা জাতি, বর্তমান বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, আদিবাসী, ইত্যাদি নির্বিশেষে মানুষকে সমান স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশাসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। সমাজের ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষদের আইএসডি শুধুমাত্র সম্মান প্রদর্শনই করে না বরং এই প্রতিষ্ঠান তাদের অধিকার রক্ষায়ও কাজ করে।

আইএসডি সাউথ এশিয়া উপমহাদেশের মানুষের অনুশীলিত সাধারণ মূল্যবোধসমূহ, প্রতীক ও উৎসবসমূহ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ধারায় "বিমিশ্র ঐতিহ্যের" এই মতাদর্শ তৈরী করেছে, যা বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাতে কোন বিভেদ না হয় তার জন্য কাজ করে। এটা সত্য যে, পরিবারের প্রত্যেক সদস্য তুলনামূলকভাবে স্বকীয় ও একক সত্বা হিসেবে স্বীকৃত এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মতাদর্শ একে অপরের সাথে সামঞ্জস্বপূর্ণ নয় বা নাও হতে পারে। "বিমিশ্র ঐতিহ্য" শুধুমাত্র সমাজের একটি দল, নির্দিষ্ট ধর্ম, বর্ণ, কোন নির্দিষ্ট নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠী বা নারী-পুরুষের সাথে অঙ্গীভূত নয়। এটি সকল স্তরের সাধারণ মানুষের সাথে অঙ্গীভূত এবং সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় নিবেদিত- যা সবার জন্য উন্মুক্ত, গণতান্ত্রিক এবং সর্বব্যাপী। "বিমিশ্র ঐতিহ্য" একটি গতিশীল ও গণতান্ত্রিক ধারা বা মতাদর্শ, যা সমাজকোষকে/ সমাজ পদ্ধতিকে কোনরকম বাধাগ্রস্থ না করে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহ অনুশীলনে উৎসাহ, সম্প্রসারণ ও প্রলুব্ধ করে।

আইএসডি'র তিন ধরেণের কর্মপদ্ধতি রয়েছে, যথা ঃ-

- গণতন্ত্র এবং সার্বজনীনতাবাদ সম্পর্কে নিবেদিত এরূপ সামাজিক দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে একত্রিত করা। নানা ধরণের সভা ও কর্মশালার মাধ্যমে "বিমিশ্র ঐতিহ্যের" ধারণা তাদের মধ্যে প্রথিত করা এবং এই ধারণার অনুশীলন ও সংরক্ষণে তাদেরকে নিবেদিত করা।
- আইএসডি'র আর একটি কর্মকৌশল হ'লো- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত সম্পদসমূহ, যেমন- সাহিত্য, গল্পগুচ্ছ, পৌরানিক কাহীনি, লোকগীতি, গান-বাজনা, নাটক, ইত্যাদির প্রসার ও গণনন্দিত বা জনপ্রিয় করে তোলা যাতে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িতকা রোধ হয়। এছাড়া সার্বজনীনতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহকে সবার সামনে প্রদর্শিত করা।
- গ্রামীণ ও তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের বিষয় মাথায় রেখে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সমন্বয়ে খুব সহজ, সরল ও বোধগম্য শিক্ষা উপকরণ তৈরী করা, যাতে জনগণ "বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে একিভূত ও প্রশিক্ষিত হ'তে উদ্বুদ্ধ হয়।

সুতরাং আইএসডি'র কর্মসূচিসমূহ শুধুমাত্র প্রকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি জনগণের জীবনযাত্রা এবং সংস্থার নেতৃস্থানীয়দের "বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহকে অঙ্গীভূত করে। আইএসডি সর্বদাই তার কর্মীদেরকে "বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পর্কে নতুন নতুন শিক্ষায় অনুপ্রাণীত করে এবং কর্মীদেরকে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে। তাই সকল কর্মীগণ "বিমিশ্র ঐতিহ্য" সম্পকৃত সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ পায়, নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করতে পারে এবং ইস্যুসমূহ সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান ও ধারণার সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

যারা আইএসডি'র সাথে কাজ করে, তারা অবশ্যই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বহুত্ববাদ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নতুন শিক্ষা গ্রহন করতে পারে।

হাডেন বার্নড
ইইডি, জার্মানী।

সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম এই আধুনিক সময়ে সমন্বয়বাদ ও বহু জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে আবেগ এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।

বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের উপমহাদেশের এই সংগ্রাম বৃহত্তর অর্থে একটি যুদ্ধের চাইতেও অনেক বড়কিছু। একমূখী আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার কারনে ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যসমূহ যখন বিপদাপন্ন ও হুমকীর সম্মূখীন হয়ে পড়েছিল তখন আমাদের জাতীয় সংগ্রাম/ আন্দোলন এদেশের সামাজিক ঐতিহ্যসমূহ রক্ষা এবং সংরক্ষণে সোচ্চার হয়েছিল। এছাড়াও আমাদের সার্বজনীনতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের সূতিকাগার তৈরীতে এই ঐতিহ্যসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

এই ধরণের প্রথাগত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধসমূহ আমরা আমাদের জাতিগত সমন্বয়বাদ এবং বহুত্ববাদিতা থেকে পেয়েছি। আমাদের জাতীয় ঐক্য এবং সার্বজনীনতাবাদের আধুনিকায়নে এই ঐতিহ্যসমূহের কোন কিছুরই বিসর্জন দিতে হয়নি। এছাড়াও প্রথাগত ঐতিহ্যের যে বিপুল সম্ভার রয়েছে তার কোনটিকে বাদ না দিয়েই আমরা আমাদের রাজনৈতিক আধুনিকিকরণের পথে উন্নীত হ'তে সমর্থ হয়েছি। আমাদের সমাজেরও আধুনিকায়নের প্রথম সোপানে উন্নীত হ'তে প্রথাগত ঐতিহ্য বিসর্জন বা এক্ষেত্রে অধিক মূল্য দিতে হয়নি। আমরা যদি ভারতবর্ষে সমন্বয়বাদ ও বহু জাতীয়তাবাদকে সংরক্ষণ করে থাকি, তবে তার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টার নিরিখে মুক্তির আন্দোলনকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আমাদের এই ঐতিহ্যগত সম্পদ কোনক্রমেই ধ্বংস হওয়ার সুযোগ দিতে পারি না।

ইন্‌স্টিটিউট ফর সোস্যাল ডেমোক্রেসী (আইএসডি)
ফ্ল্যাট নম্বর- ১১০, নামবেরদার হাউজ,
৬২-এ, লক্ষ্মী মার্কেট, মুনিরকা, নয়া দিল্লী- ১১০০৬৭, ইন্ডিয়া।
ফোন: ০৯১-১১-২৬৭৭৯০৪, ফ্যাক্স : ০৯১-১১-২৬৭৭৯০৪
ইমেইল- notowar.isd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.isd.net.in